কলকাতার আড্ডা

সমরেন্দ্র দাস
সম্পাদিত



গাঙচিল

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০২
প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
হরফবিন্যাস
রচয়িতা ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১
মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদচিত্র
কৃষ্ণেন্দু চাকী

তিন্নি, তুর্কি আর টোরি
তিন আড্ডাবাজ ভাইঝিকে

সূচনাকথা

এক সময়ে বাঙালির জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল আড্ডা, বাঙালিমাত্রই আড্ডাবাজ এমন একটি অপবাদও জুটেছিল তাদের ঘিরে। আসলে আড্ডাবাজ কথাটির পেছনে এমন একটি ভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, কাজের মানুষ কখনও আড্ডার মোহে পড়েন না। ধারণাটি বোধহয় ঠিক নয়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাজে কথা' কিংবা 'পনেরো আনা' পড়েছেন তারা মানবেন যে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই যদি কাজের মুহূর্ত হয়ে উঠত তা হলে পৃথিবীময় শুধুই শস্য ফলত, ফুল ফুটত না কোথাও। মানুষের জীবনে শুধুই কাজের ঠাসবুনুনি থাকলে সে হত এক যান্ত্রিক সভ্যতা। সেই সঙ্গে আমরা হয়ে উঠতাম রামগরুড়ের ছানা। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, পরিবর্তনের হাওয়ায় এখন বাঙালির জীবনে কর্মব্যস্ততার পরশ লেগেছে। অবসরের মাত্রা কমেছে কিছুটা তাদের জীবনে। হয়তো এখনকার বাঙালি ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিক অথবা অণু-পরিবারসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা, রোয়াকের আড্ডা তাদের জীবন থেকে প্রায় নির্বাসিত। চায়ের কাপে তুফান তুলতে তারা আর ততটা ব্যস্ত নয়। এ ভাবে বাঙালি হয়তো কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে।

এক সময়ে ভারতের রাজধানী, বাঙালির গর্বের শহর ছিল কলকাতা। এই শহর ঘিরেই তাদের সংস্কৃতি আর সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। অনেকেই মানবেন যে, কলকাতা হল সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ভালবাসা আর তীব্র আবেগের শহর। আর সেই জন্যই এই কলকাতা— এক আশ্চর্য উন্মীলন ও উজ্জীবনের শহর। সেই কলকাতার প্রাণভোমরা ছিল নানান আড্ডাকে ঘিরে। তাই কলকাতাকে জানতে হলে, বুঝতে হলে কলকাতার এ সব আড্ডার কথাও জানা বোধহয় জরুরি। না হলে কলকাতা চর্চা পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জব চার্ণকও প্রত্যেক দিন অনেকটা উজিয়ে এসে আড্ডা জমাতেন এক বটগাছের নীচে বসে। বিভিন্ন ধরনের আড্ডার মধ্যেই রয়েছে কলকাতার নানা ওঠাপড়া, সমাজতান্ত্রিক নিদর্শন, বহু কিছু প্রতিষ্ঠার কাহিনি— যা এক কথায় কলকাতার অন্য ইতিহাস।

১৯৯০ সালে 'কলকাতার আড্ডা' নামে একটি বই সম্পাদনা করেছিলাম। তথাকথিত কলকাতার ৩০০ বছর উপলক্ষে। সে সংস্করণ বহু দিন আগেই নিঃশেষিত। এ বার সেই সংস্করণ থেকে পনেরোটি লেখা বাদ দিয়েছি। আগের বারে ছিল উনত্রিশটি লেখা। এ বার সাতাশজনের লেখা নিয়ে এ বই। যার মধ্যে চোদ্দোটি নতুন রচনা। নতুন লেখা লিখে দিয়েছেন অনেকে। কিছু হারিয়ে যাওয়া লেখা সংগ্রহ করেছি। পুরনো লেখাগুলি অবিকৃত রেখেই ছাপা হয়েছে।

বইয়ের নির্দেশিকাটি তৈরি করে দিয়েছেন ভ্রাতৃপ্রতিম অয়ন ভট্টাচার্য। প্রচ্ছদের ব্লার্বে আমার ছবিটিও তারই তোলা। গাঙচিল-এর অধীরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একান্তই ভালবাসার। গ্রন্থ প্রকাশে তাদের উৎসাহ, পরামর্শ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

১২৮এ, বকুলবাগান রোড
কলকাতা ৭০০০২৫

সূচি

আড্ডা

বুদ্ধদেব বসু

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু করে বলি সভা, তাহলে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি করে বলি পার্টি, তাহলে ও প্রাণে মরে। মিটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি; পার্টির কাপড় ফুরফুরে কিন্তু ইস্ত্রি বড় কড়া; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাসি সালঁর অস্তিত্ব এখনও আছে কি না জানি না, বর্ণনা পড়ে মনে হয় এত সমারোহ ভাল না। আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটি পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষাতেই আছে কি? ভাষাবিদ না হয়েও বলতে পারি: নেই; কারণ আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনও দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা দেয়, রসিকতা করে, তর্ক চালায়, ফুর্তি করে রাত কাটিয়েও দেয়, কিন্তু আড্ডা দেয় না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা করে বলে— আহা বেচারা, ক্লব কাকে বলে ওরা জানে না। আড্ডা যাদের আছে, ক্লব দিয়ে তারা করবে কী? আমাদের ক্লবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত-পা নাড়ার মতো, ওতে অবয়বিক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। যারা আড্ডাদেনেওলা জাত, তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে, চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লবের পত্তন করে, এর চেয়ে হাস্যকর এবং শোচনীয় আর-কিছু আছে কিনা জানি না।

আড্ডা জিনিসটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশের সজল কোমল মাটিতেই তার পূর্ণবিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনই আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্রসন্ধ্যা, শ্রাবণের রিমঝিম দুপুর, শরতের জ্যোছনা-ঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল— সবই আড্ডার নীরব ঘন্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শোনে, কেউ শোনে না। যে-দেশে শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই অতি তীব্র, সেখানে আড্ডার ক্ষীণতা অনিবার্য। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় গাছপালার ঘন শ্যামলিমার মতোই আড্ডার উচ্ছ্বাস।

ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে আমি আত্মহারা। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পালাই, কিন্তু আড্ডা। ও না-হলে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে আড্ডার হাতেই আমি মানুষ। বই পড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম — সেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্যরচনায় প্রধান নির্ভররূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি আড্ডায় আমার সর্বলাভ হল। তাই শুধু উপাসক হয়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হয়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।

যে-কাপড় আমি ভালবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফরসা কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফরসা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হয়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শকোমল, নমনীয়। গায়ের কোথাও কড়কড় করে না, হাত-পা ছড়াতে হলে বাধা দেয় না, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি; কিংবা দাওয়ায় বসে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকিয়ে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই; তার স্বাচ্ছন্দ্য কোনওখানেই ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছে করলেই আড্ডা দেওয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড় কোমল, বড় খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ করে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার— মানে পড়া-বিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ গড়ে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দু-দিন সাহিত্যসভা ডাকব, তাতে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন এবং নানারকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই; প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমল যে নিজেরাই অবাক হয়ে গেলাম, কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখা গেল যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয় তাকে, আর যা-ই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার প্রথম নিয়ম এই যে তার কোনও নিয়মই নেই; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে বিষয়ে সচেতন হলেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরব, এবং কাজ পালিয়ে যখন তখন এসে পড়লেও কেউ কোনও প্রশ্ন করবে না।

তাই বলে এমন নয় যে এলোমেলো ভাবেই আড্ডা গড়ে ওঠে। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনও-একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি চাই। অনেকগুলি শর্ত পূরণ হলে তবে আড্ডা ঠিক আড্ডা হয়ে ওঠে। একে-একে সেগুলি পেশ করি।

আড্ডায় সকলেরই মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানা রকম প্রভেদ অনিবার্য, কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি আপিসের কাপড়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনও দিন পাবে না। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতই বড় যে তাঁর মহিমা কখনও ভুলে থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসব, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝরনাধারা তুষার হয়ে জমে যাবে। আবার অন্যদের তুলনায় অনেকখানি নিচুতে যার মনের স্তর, তাকেও বাইরে রাখা দরকার, তাতে তারও শান্তি। আড্ডার লোকসংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে; ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ কি বারো, নিম্নতম তিন। দশ-বারোজনের বেশি হলে অ্যালবার্ট হল হয়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হতে পারে; আর যদি হয় ঠিক দু-জন তার সঙ্গে কূজনই মেলে—পদ্যেও, জীবনেও। যে-ক'জন থাকবেন তাঁদের স্বভাবের উপরতলায় বৈচিত্র্য তো থাকবেই, কিন্তু নীচের তলায় মিল না-থাকলে পদে-পদে ছন্দপতন ঘটবে। অনুরাগ এবং পারস্পরিক জ্ঞাতিত্ববোধ স্বতই যাদের কাছে টানে আড্ডা তাদেরই জন্য এবং তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত; চেষ্টা করে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণপাখি কখন উড়ে পালাবে কেউ জানতেও পারবে না।

কিন্তু এমনও নয় যে ওই ক'-জন এক-সুরে-বাঁধা মানুষ একত্র হলেই আড্ডা জমে উঠবে। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা একই কথা। অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভাল, মাঝে-মাঝে জায়গা-বদল করাটা মনের ফলকে শান দেওয়ার শামিল; ঋতুর বৈচিত্র্য এবং চাঁদের ভাঙা-গড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলা মাঠে বদলি হয়ে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিরই আপন হাতের সৃষ্টি। কিন্তু কোনও কারণেই, কোনও প্রলোভনেই ভুল জায়গায় যেন যাওয়া না হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতেই লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, আড়ম্বর থাকবে না। আসবাব হবে নিচু, নরম, অত্যন্ত বেশি ঝকঝকে নয়; যদি মরজি-মতো অযথা-স্থানে সরিয়ে

নেওয়ার আন্দাজ হালকা হয় তাহলে তো খুবই ভাল। চেয়ার-টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশও থাকবে— যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ খুব ক্লান্ত থাকে, তাহলে শুয়ে পড়ার জন্য কারও অনুমতি নিতে হবে না। পানীয় থাকবে কাচের গেলাশে ঠান্ডা জল, আর পাতলা সাদা পেয়ালায় সোনালি সুগন্ধি চা; আর খাদ্য যদি কিছু থাকে তা হবে স্বাদু, স্বল্প এবং শুকনো, যেন শুয়ে-শুয়েও খাওয়া যায়, আর খাবার পরে হাত-মুখ ধোবার জন্য উঠতে হয় না। বাসনগুলি জমকালো হবে না, পরিচ্ছন্ন হবে; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্যপানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহলেই আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ, মন্থর, স্বচ্ছন্দ স্রোতে, তার জন্য কোনও চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; মনের মধ্যে যে-সব ঢেউ সব সময় উঠছে পড়ছে, কেজো দিনের আবর্তের তলায় যা চাপা পড়ে থাকে, কথাগুলি তারই যেন ছলছলানি। এখানে সংকোচ নেই, বিষয়বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভাল কথা বলবার দায় নেই এখানে। ভাল কথা না আসে, এমনি কথাই বলব; এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, থাকব চুপ করে— চুপ করে থাকতে ভয় কিসের। জোর করে মেকি কথার অবতারণার চাইতে ঢের ভাল চুপ করে থাকা। নানা কথার টানাপোড়েনে যে-কাপড়টি বোনা হয়, চুপ করে থাকা তো তারই সোনালি পাড়। পাড় জিনিসটা কাপড়কে রূপ দেয়, চুপ করে থাকাটা কথাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। এই জন্যই চুপ করে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ত্রুটি বলে মনে করেন, আড্ডা জিনিসটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণির মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন, কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদেরও সসম্মানে বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে-সূক্ষ্ম সর্প বার-বার আমাদের ভ্রষ্ট করে, তারই নাম উদ্দেশ্য। যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনও উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমে কখনও ঢুকতে দিতে নেই। এটা ধরে নিতে হবে যে আড্ডা কোনও উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, তা থেকে কোনও কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কিছুমাত্র উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ, নিষ্কাম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

শুধু পুরুষদের নিয়ে, কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে, আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্র হলে কথার গাড়ি শেষ পর্যন্ত কাজের লাইন ধরেই চলবে; আবার কখনও লাইন থেকে চ্যুত হলে গড়াতে-গড়াতে একেবারে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্র হলে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নিচু পরদায়

থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হতে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ, তাঁদের লাবণ্য, ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বন্ধন; পুরুষ আনে তার ঘর-ছাড়া মনের উদ্দামতা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের ও পুরুষের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক ছোট-বড় কাজ হয়ে থাকে; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায় আড্ডাতে। কখনও কৌতুকে উজ্জ্বল, কখনও খামকা ভাল-লাগায় ভরপুর, কখনও স্বপ্নে মদির। বুদ্ধিতে লাগে হৃদয়ের স্পর্শ, হৃদয়ে পড়ে বুদ্ধির আলো। আড্ডা যা দিতে পারে, আর-কিছুই তা পারে না। আর-কিছুই আড্ডার মতো নয়। বিশ্বসভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনও জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। যারা ছিল বিশ্বজয়ী তারা আজ স্বরচিত পুঞ্জ-পুঞ্জ উপকরণের তলায় চাপা পড়ে মরছে— প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত থেকে তো বিশ্বজয়ীরও নিস্তার নেই। এই প্রায়শ্চিত্তের মহাযজ্ঞ যখন শেষ হবে, তখন নবজন্মের দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়ব আমরা, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়ব নিশান উড়িয়ে, বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র নিয়ে, আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে, আড্ডা দিয়ে পৃথিবী জয় করব আমরা, জয় করব কিন্তু ধরে রাখব না— কেননা আমরা জানি যে ধরে রাখতে গেলেই হারাতে হয়, ছেড়ে দিলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে কাড়ো; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো।

আড্ডা, আরও আড্ডা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ব্যাসের মহাভারতের একেবারে আরম্ভে আছে—

"কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে মহর্ষিরা দৈনন্দিন কর্ম সমাধান করতঃ সকলে সমবেত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে সুখে" আড্ডা দিচ্ছিলেন...

এমন সময় সেই আড্ডায় ঋষি লোমহর্ষণের ছেলে সৌতি ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন এবং যা হয়ে থাকে, সৌতি আড্ডায় জমে গেলেন।

কোথা থেকে আসছেন, সেখানে কী দেখেছেন, কী শুনেছেন, এই সব জমিয়ে বলতে বলতে দেখা গেল, সৌতি যখন আড্ডা থেকে আবার বেরুলেন তখন অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত সবটাই গাওয়া হয়ে গিয়েছে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

(১) আড্ডার একটা সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে,

(২) মুনিঋষিরাও আড্ডা দিতেন,

(৩) এবং আড্ডা শুধু আলস্যের জায়গা নয়, সেখান থেকে মহাভারতও সৃষ্ট হতে পারে।

পুরাণের নজির তুলতে হল, কারণ, আজকের শিক্ষিত বাঙালি আড্ডা দিতে ভয় পায় এবং কালক্রমে আড্ডার সঙ্গে একটা বদনামও জুড়ে গিয়েছে। আজকের কলকাতার একটা বনেদি আড্ডার যিনি আড্ডাধারী-বিশেষ ছিলেন, সেই রাজশেখর বসু তাঁর অভিধানে আড্ডার মানে লিখতে গিয়ে লিখলেন, "কু-লোকের মিলন-স্থান!"

আমার বিশ্বাস, এই অভিধান যদি পরশুরাম লিখতেন, তিনি আড্ডার এই মানেটিকে কখনওই এমনভাবে প্রকাশ করতেন না।

তার ওপর আজকের শিক্ষিত বাঙালি ছেলেরা মার্কস লিখিত উপনিষদ "কোট" করে বলেন, আড্ডা হল ফিউড্যাল যুগের অলস বড়লোকদের সময় ধ্বংস করবার

একটা বিকৃত প্রতিষ্ঠান, আজকের কর্মমুখর ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের প্রোগ্রেসিভ সমাজে তার স্থান নেই।

সেই জন্যে আজকের শিক্ষিত সমাজ আড্ডাকে হুঁকো-কলকে সমেত ঘর থেকে বার করে রাস্তার ধারে 'রকে' ফেলে দিয়েছে।

...ঠিক এমনইভাবে এক সময় মার্গ-সংগীত আর নাচকে তাঁরা ঘুঙুর-তবলা সমেত ঘর থেকে বার করে বাঈজিপাড়ার রাতের অন্ধকারে ফেলে দিয়েছিলেন... বাঈজিরা সযত্নে সেই সম্পদকে তাঁদের কণ্ঠে ও দেহে ধরে রেখেছিলেন বলে আজ আবার রাস্তায় খবরের কাগজ পেতে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা সেই মার্গ-সংগীতের আর নাচের ধ্বনি-তরঙ্গ শুনছেন।...

কিন্তু "রক" থেকে আড্ডাকে উদ্ধার করে আবার ঘরে তোলা বোধহয় সম্ভব হবে না।

আড্ডার যেটুকু প্রাণরস এখনও অবশিষ্ট আছে, 'রকের' সিমেন্টে তা শুকিয়ে মরে যাবে... হয়তো ইতিমধ্যেই তা শুকিয়ে মরে গিয়েছে... আমি এসেছি তার ধূমায়মান চিতাশয্যার পাশে আমার বহু দিনের বহু ঋণের শেষ কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

অথচ সারা জগৎ জুড়ে বাঙালির একটা প্রচণ্ড খ্যাতি— আমরা পৃথিবীর সেরা আড্ডাবাজ জাত। আড্ডার মতন সর্ব প্রয়োজন অতীত এমন প্রতিষ্ঠান আর কোনও জাত গড়ে তুলতে পারেনি। আড্ডা দেওয়া একটা আদিম ও অনাদি জীবধর্ম, বাঙালির মতন এ সত্যকে কেউ আর জীবনে স্বীকার করতে পারেনি।

বিশ্ববিখ্যাত শিল্প-কলারসিক শাহেদ সুরাবর্দি যখন জার্মানিতে ছিলেন, তখন একদিন তাঁর কয়েকজন রুশ ও জার্মান বান্ধবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের বাঙালির বৈশিষ্ট্য কী?

শাহেদ দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, মাদাম, যা আর কারও নেই, বাঙালির বৈশিষ্ট্য হল তাই, আড্ডা!

দিলীপকুমারের লেখায় এই কাহিনিটি পড়ে শাহেদ সাহেবের অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

আজকের শিক্ষিত বাঙালি এই সহজ সত্যটি স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করবেন, তার কারণ, আড্ডা দিতে আমরা আজ ভুলে গিয়েছি। বাঙালির জাতীয় চরিত্রের যে অধঃপতন ঘটছে, এ থেকে তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

বাঙালি তার জাতীয় চরিত্রের ছাঁচ বদলাচ্ছে। ছাঁচ-বদলানো আশঙ্কার কথা।

আজকের যান্ত্রিক সভ্যতা প্রত্যেক মানুষকে গড়পড়তা এক ছাঁচে গড়ে তুলতে চাইছে। জাতীয় বৈচিত্র্য হারিয়ে এই গড়পড়তা এক ছাঁচের বিশ্বনাগরিক হওয়া সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রেত নয়।

বুদ্ধিমান জাত তাই সহজে ছাঁচ বদলায় না। যেমন ইংরেজ। সব ত্রুটি সত্ত্বেও তাই তারা জগতের সেরা জাত।

বাঙালি নির্বুদ্ধির মতো দ্রুত তার জাতীয় চরিত্রের ছাঁচ বদলে চলেছে।

বাঙালির চণ্ডীমণ্ডপ খালি। সে জায়গায় দোকানঘর করা হয়েছে, ভাড়া পাওয়া যায়। বাঙালি তাঁবু খাটিয়ে সর্বজনীন পুজো করছে। রেডিওতে টেপ-রেকর্ডে চণ্ডীপাঠ শুনছে।

বাঙালির আড্ডার বৈঠক আজ খালি।

কিন্তু বাংলার জল-হাওয়ার সঙ্গে আড্ডার এমন আত্মিক যোগ যে, এক জায়গা থেকে স্থানচ্যুত হয়ে সে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে— কর্পোরেশনে, অফিসে, রাষ্ট্রসভায়, রকে, চায়ের দোকানে, খেলার তাঁবুতে, রাজনৈতিক দলের প্রত্যেক জেলা-সমিতিতে, স্কুলে, কলেজে— সর্বত্র সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা ছদ্মবেশে আড্ডাই বিরাজ করছে!

কলকাতা শহরের আড্ডার ইতিহাস কোনও দিন লেখা হবে কি না তা জানি না—

যদি হত, তাহলে এই বাঙালি জাতের মনের আসল চেহারার অনেক খবর পাওয়া যেত, এই বিচিত্র জাতের মনস্তত্ত্বের অনেক দামি খবর পাওয়া যেত, বাঙালিকে বোঝা অনেক সহজ হত।

জনসনের বিখ্যাত আড্ডার ইতিহাসের সঙ্গে সে-যুগের ইংল্যান্ডের কালচার ও বিদগ্ধতার কাহিনি জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশেও এই রকম কয়েকটি আড্ডা ছিল যাদের আবহাওয়া থেকে বাংলা কালচারের মৌসুমী হাওয়ার খবরাখবর মিলত।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতা শহরে এই রকম অনেকগুলি জমাট আড্ডা ছিল এবং এই সব আড্ডায় সেই সময়কার বাংলাদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়মিত আড্ডাবাজ ছিলেন। বাইরে সারাদিন এইসব গুরুগম্ভীর বিশিষ্ট লোকেরা যে যাঁর কাজের মুখোশ পরে যে চেহারায় ঘুরে বেড়াতেন, যখন আড্ডায় ঢুকতেন তখন মুখোশ বাড়িতে রেখে আসতেন; আড্ডায় তাঁদের দিকে চাইলে তাঁদের সত্যিকারের মুখ দেখা যেত; তখন সে-মুখ দিয়ে যা বেরুত তার আলাদা স্বাদ, আলাদা দাম। আড্ডায় না দেখলে, মানুষের সবটা দেখা যায় না। বাইরে যে

রায়বাহাদুর, আড্ডায় সে উপাধিহীন; বাইরে যাকে দেখলে ভয় করে, আড্ডায় তাকে দেখলে হাসি পায়; বাইরে যে কর্তা বা কর্মচারী, আড্ডায় সে শুধু সহজ মানুষ।

আড্ডা খুঁজে বার করা খুব কঠিন; কারণ, বাইরে তার কোনও নিশানা নেই। ক্লাবের একটা নাম আছে, ঠিকানা আছে, টেলিফোন আছে; আড্ডার কোনও নাম-ঠিকানা নেই। তার কারণ, আড্ডা কেউ তৈরি করে না, আড্ডা আপনা থেকে গড়ে ওঠে। ক্লাব কাউকে গড়তে হয়, তার একটা উদ্দেশ্য দরকার হয়; আড্ডা প্রাণের তাগিদে আপনি গড়ে ওঠে, তার কোনও উদ্দেশ্য নেই, সে সকল উদ্দেশ্যের অতীত, প্রাণারাম।

বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় এটা মানসী মাসিক পত্রিকার অফিস, দরজার ওপর পুরনো একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ভেতর থেকে ছাপাখানার শব্দ আসছে, প্রেসের কালিমাখা একটা ছেলে এক ঝুড়ি পরিত্যক্ত ছেঁড়া ময়লা প্রুফের কাগজ সামনে রাস্তার ধারে ফেলে গেল... কিন্তু এই পুরনো রং-চটা বাড়ির ভেতরেই বসেছে জোর আড্ডা, সেই সময়কার বাংলার একটা সেরা আড্ডা, আড্ডাধারী স্বয়ং নাটোরের মহারাজা জগদানন্দ রায়... এবং যদি কোনও রকমে আড্ডাঘরে যেতে পারেন আর দুটি বিরাটদেহ গম্ভীর মূর্তি দেখতে পাবেনই, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এই আড্ডার দুই মৌতাত-জোগানদার। প্রত্যেক আড্ডার যেমন একজন কেন্দ্রপুরুষ থাকে, যাকে বলে আড্ডাধারী, তেমনই প্রত্যেক আড্ডার দু'একজন প্রধান মৌতাত-জোগানদার থাকে, এই জোগানদার না এলে আড্ডা জমে না।

ঐতিহাসিক গবেষকের রীতিমত পাথুরে গাম্ভীর্যের আড়ালে কি দুরন্ত প্রাণ-উচ্ছলতা আর সরসতা রাখালদাসের ছিল, তা এই আড্ডায় তাঁকে না দেখলে বোঝা যেত না। মহারাজ-কবির সঙ্গে তাঁর কবির লড়াই হত, এ কবির লড়াই-এ বোঝা যেত বাংলার মেঠো ভাষার কী ভীষণ ধার। সাধারণত বাইরে লোকসমাজে প্রভাতকুমার একান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন এবং কোনও আলোচনায় তাঁকে সহজে আকৃষ্ট করা যেত না, কিন্তু এই আড্ডায় তাঁর মনের বাঁধন খুলে যেত। রবীন্দ্রনাথের যেমন একটা নিজস্ব বাচনভঙ্গি ছিল, তাঁর কথা বলার যেমন একটা আলাদা ছন্দ ও সুর ছিল, প্রভাতকুমারের কথাবার্তাতেও তেমনই একটা স্বতন্ত্র মধুর ভঙ্গি ছিল, খুব আস্তে মিষ্টি করে তিনি কথা বলতেন, এবং কখনও তার ছন্দ ভাঙত না। অথচ সেটা কৃত্রিম বলে মনে হত না। কথা বলাও যে একটা আর্ট, তা তাঁর কথা শুনলে বোঝা যেত। এই আড্ডার একটা দ্বিতীয় অধিবেশন বসত, নাটোর-প্রাসাদে... সে অধিবেশন থেকে আড্ডাধারীরা যখন ফিরতেন তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শহর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যেত।

এই রকম সেই সময়কার গুটিকতক বিশেষ আড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার ঘটে। আজ সে-সব আড্ডার চিহ্নমাত্র নেই... আড্ডাধারীরাও সব চলে গিয়েছেন... বাংলা দেশ থেকে সে মনও হয়তো মরে গিয়েছে।

কলেজ স্কোয়ারের ঠিক পেছন দিকে, মস্ত বড় একটা বইয়ের দোকান, বুক-কোম্পানি।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি এই ধরনের দু'চারটি নতুন বইয়ের দোকানের পত্তন হয়। কলকাতা শহরের সেই সময়কার কালচারের বিস্তারে এই বইয়ের দোকানগুলো বিশেষ সাহায্য করে। ইওরোপ আর আমেরিকার তাজা তাজা কাব্য-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই এরা আনতে শুরু করে। এদের এই উদ্যমের জন্যেই সে সময়কার তরুণেরা, সাহিত্যিকেরা বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। কলকাতা শহরের পড়ুয়াদের মধ্যে পড়বার একটা নেশা জেগে ওঠে এই সময়। আজ বুক-কোম্পানির কী অবস্থা জানি না, কিন্তু সেদিন এই বই-বেচার দোকান হয়ে ওঠে বই-পাগলাদের বৈঠকখানা।

সামনেই পালিশ-করা ঝকঝকে কাঠের বিরাট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক, কাঁধে ময়লা একটা ছোট তোয়ালে, ট্যাঁক থেকে নস্যির ডিবে বার করে ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছেন, আর খরিদ্দারদের সঙ্গে কথা বলছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আছে দোকানের দরজার বাইরে রাস্তার ওপর... হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, এই হাঁদা প্রফেসার।

সামনের খরিদ্দার চমকে ওঠেন, কারণ তিনিও প্রফেসার।

অবাক হয়ে সেই বিচিত্র দোকানদারের দিকে চেয়ে তিনি বলেন, কী বলছেন গিরীনবাবু?

নাকে আর এক টিপ নস্যি গুঁজে গিরীনদা তেমনই চেঁচিয়ে বলেন, আপনাকে বলিনি স্যার, আপনি কেন অমন করে চাইছেন।... এই যে ইনি... প্রফেসার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাস্তা দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছিলেন।

ততক্ষণ ধূর্জটিপ্রসাদ কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তোয়ালে দিয়ে গায়ের ওপর ছড়িয়ে-পড়া নস্যির গুঁড়ো মুছতে মুছতে গিরীনদা বলেন, যাও একবার ভেতরে যাও... নাদু খুঁজছিল।

সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডেকে তেমনই চিৎকার করে আদেশ দেন, প্রফেসার এসেছে রে। চা দে।

কাউন্টারের দরজা খুলে হাসিমুখে প্রফেসার ঢোকেন... বইয়ের আলমারির অলি-গলি পেরিয়ে 'ভেতরে'র দিকে অগ্রসর হন।

এই 'ভেতরে' রোজ বসে একটা ছোটখাটো আড্ডা... কলকাতা শহরের বাছাই-করা বই-পাগলাদের আড্ডা।

পেছন দিকে বইয়ের গুদাম ঘর। চারদিকে নতুন সব বই আর সদ্য জাহাজ থেকে নামানো বিরাট সব বইয়ের কাঠের বাক্স। মেঝেতে ছড়ানো বই-বাঁধা মোটা মোটা সব কাগজ... বসবার আসন... ঘরেতে নতুন বইয়ের বিচিত্র গন্ধ।

নাদুবাবু একটা সদ্য-আসা কাঠের বাক্সের ডালা খুলছেন... দুজন আড্ডাধারী সতৃষ্ণ নয়নে সেই কাঠের বাক্সের দিকে চেয়ে, সুরা-রসিক যেমন চেয়ে থাকে শ্যাম্পেনের বোতল খোলার দিকে।

দুজন আড্ডাধারীর মধ্যে একজনের বয়স খুব অল্প... বোধহয় কলেজের ছাত্র... আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে পুরনো একজোড়া স্লিপার... উসকোখুসকো এক মাথা চুল... দ্বিতীয় জন মধ্যবয়সি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত অভিজাত, বকের পালকের মতন সাদা নিখুঁত বাঙালি পোশাক, হাতের দু' আঙুলে সোনায়-বাঁধা একটা সরু সিগারেটের পাইপ, সিগারেট নেই, অভ্যাসবশত পাইপটা ধরে আছেন, আঙুলের দিকে চাইলে দেখা যায়, আঙুল দুটো কাঁপছে... প্রমথ চৌধুরী।

তরুণের দিকে চেয়ে বলেন, বুয়েছ (বুঝেছ), এই যে নতুন কবিতা এখন ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে লেখা হচ্ছে... ওর এই এলোমেলো ছন্দ-হীনতার আড়ালে আছে একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি... মহাযুদ্ধ এসে ওদের দেশের তরুণদের মনে পুরনো জগতের সব বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গিয়েছে... অস্থির মন খুঁজছে নতুন আশ্রয়... বইটা যদি এ মেলে এসে থাকে তোমাকে দেখাচ্ছি... এই যে ধূর্জটি, এসো এসো।

প্রবেশ করলেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য চায়ের কেটলি আর কাপ নিয়ে এল।

বইয়ের দোকানের আড়ালে বিচিত্র এক আড্ডা... এবং অন্য সব আড্ডার মতনই এই আড্ডা বেঁচে ছিল আড্ডাধারীর জন্যে।

কলকাতা শহরে যাঁরা নিয়মিত পড়াশোনা করতেন, এখানে এলেই তাঁদের দেখতে পাওয়া যেত... এবং সারাদিন তাঁরা যেখানেই ঘুরুন না কেন, একবার দিনান্তে এখানে তাঁদের আসতেই হত, নেশার খোরাকের জন্যে। বইতে যাঁর নেশা ধরেনি, এ আড্ডায় তাঁর জায়গা ছিল না। প্রত্যেক আড্ডাধারীর মতন নাদুবাবু প্রত্যেক আড্ডাবাজের মনের চাহিদার খবর রাখতেন, কে কোন জাতীয় বই খুঁজছেন, রাত জেগে বিলিতি ক্যাটালগ ঘেঁটে ঘেঁটে সেই সব বইয়ের পাত্তা বার করতেন, নতুন কোনও বইয়ের খবর পেলে আড্ডায় জানাতেন, প্রার্থিত বইটি নেশাখোরের হাতে খন তুলে দিতেন

আনন্দে তাঁর মুখ ভরে উঠত, যেন বহুবাঞ্ছিত প্রিয়-সম্মেলন ঘটিয়ে দিলেন। নাদুবাবুর অকালমৃত্যুতে এই বইয়ের দোকানের আড্ডা ভেঙে যায়। শূন্য আড্ডার বেদনা আড্ডাবাজ ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

এই বুক-কোম্পানির ভেতর আর একটি আড্ডা ছিল, দোকানের পেছনে গিরীনদার ছোট্ট ঘরে... এই আড্ডার কেন্দ্রপুরুষ ছিলেন মালিক স্বয়ং গিরীনদা এবং এই আড্ডায় একটি মুখকে প্রায়ই দেখা যেত, সে-মুখ হল আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদারের। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সংগ্রামের দিন, বড় দুর্দিন। সে দুর্দিনের কাহিনি লেখা থাকত সুরেশচন্দ্রের চোখে, মুখে, পোশাকে, ভাঙা গলায়। এই আড্ডার এক কাপ চা সুরেশচন্দ্রের অনেক দিনের অনেক ক্লান্তি দূর করেছে।

সেই সময়কার বইয়ের দোকানের মধ্যে আর একটি বইয়ের দোকানে জোর আড্ডা বসত, সে হল, এম সি সরকারের বইয়ের দোকান। এই আড্ডার আড্ডাধারী ছিলেন দোকানের মালিক সুধীরচন্দ্র সরকার এবং আড্ডাবাজেরা ছিলেন অধিকাংশই সাহিত্যিক ও শিল্পী। তাঁরা অনেকেই 'ভারতী'র মূল আড্ডার লোক। 'ভারতী'র আড্ডা থেকে মুখ বদলাতে তাঁরা এখানে আসতেন। এই আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিল আড্ডাধারী সুধীরচন্দ্রের অনাড়ম্বর অথচ সুগভীর বন্ধুপ্রীতি ও সহজ অমায়িকতা। সুখের বিষয়, সুধীরচন্দ্রকে কেন্দ্র করে এখনও একটা ছোটখাটো আড্ডা আছে, সে আড্ডায় 'প্রবাসী' সম্পাদক কেদার চট্টোপাধ্যায়কে নিয়মিত দেখা যেত।

বাংলাদেশে আঙুলে গোনা যায় এমন গুটিকতক লোক আছেন যাঁরা একসঙ্গে পণ্ডিত ও রসিক। তাঁদের বিশেষত্ব হল, তাঁরা একান্তভাবেই আড়ালের লোক। বাইরে মানুষের ভিড়ে তাঁদের কোথাও দেখা যায় না। সুধীরচন্দ্রের আড্ডা এই রকম একটি অপূর্ব পণ্ডিত ও রসিক লোককে আকর্ষণ করে, তাঁর নাম হিতেন বোস, বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক নীতিন বোসের দাদা। এ জাতীয় লোক ক্রমশ দুর্লভ হয়ে আসছে দেশে। এক জাতীয় ফুল আছে রাত্রির অন্ধকার নইলে যাদের সৌরভ বেরোয় না; তেমনই এক জাতীয় রসিক আছেন আড্ডার স্বতন্ত্র আবহাওয়া ছাড়া যাঁদের প্রতিভা খোলে না। তাঁরা কুলীন আড্ডাবাজ। তাঁরা লেখেন না, বক্তৃতা দেন না, মাস্টারি বা অধ্যাপনা করেন না, তাঁরা পারেন জমাট আড্ডা দিতে। হিতেন বোস হলেন সেই কুলীন আড্ডাবাজ।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে শহরে আর একটি জমাট আড্ডা ছিল, সে আড্ডার দৈনন্দিন কথাবার্তার যদি কেউ কড়চা রাখতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় এক অপরূপ গ্রন্থের সৃষ্টি হত, যে-গ্রন্থের ভেতর সমসাময়িক বাংলার মনকে জ্যান্ত দেখা যেত... সে আড্ডা বসত থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের আড়ালে, সে থিয়েটার হল

শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির এবং সে আড্ডার কেন্দ্রপুরুষ ছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার।

বাংলাদেশের কালচারের ইতিহাসে এই আড্ডার ইতিহাস অলিখিতই থাকবে, কিন্তু এরকম একটা আড্ডার সন্ধান পেলে বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত নবরত্নের সভা ফেলে ছুটে আসতেন। তাঁর প্রতিভার জাগরণ-লগ্নে শিশিরকুমার যেভাবে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণির কৃতী লোকদের আকর্ষণ করেছিলেন, ব্যক্তিত্বের ইতিহাসে সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁর আড্ডায় অ-কৃতী কেউ ছিলেন না। এই আড্ডায় আসন পাওয়া সেদিন ছিল বেসরকারি জাতীয় সম্মান। এই আড্ডার আকর্ষণে দেখেছি, খ্যাতির দুর্লভ শিখর থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পানিত্রাসের নির্জনবাস ফেলে ছুটে আসতে নাট্যমন্দিরে; দেখেছি পাথুরে-মুখ ঝুনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের, বিচারকদের, পুলিশের বড় কর্তাদের, বড় বড় ডাক্তারদের। এই আড্ডার গহনে দু'দণ্ডের জন্যে অবগাহন করে বাঁচতে! রঙ্গমঞ্চে যাঁরা শিশিরকুমারকে দেখেছেন, তাঁরা দেখেছেন অভিনেতা শিশিরকুমারকে; কিন্তু এই আড্ডায় যাঁরা দেখেছেন শিশিরকুমারকে, তাঁরা দেখেছেন বাংলার এক বিস্ময়কর প্রতিভাকে। এই আড্ডার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, আড্ডাধারীদের কাছে তিনি সুধাদা নামেই পরিচিত, বাংলাদেশে এই রকম আর একটি মানুষ আর দেখিনি। শিশিরকুমারের আবৃত্তিতে বাংলাদেশ মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু এই আড্ডার লোকেরা জানে, শিশিরকুমার নিজেও জানতেন, সুধাদার আবৃত্তি তারও ওপরে... সুধাদার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ না শুনলে, রবীন্দ্রনাথকে বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আড্ডার আড়ালে একটা দুর্লভ চরিত্র আর বিস্ময়কর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব পরিচয়হীন রয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুধাদার চরিত্রকে সাহিত্যে রূপ দিতে, কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। আড়ালের মানুষ আড়ালেই রয়ে গেল।

সুন্দরী নারীর মতন প্রত্যেক আড্ডার একটা আলাদা স্বাদ থাকে, আলাদা গন্ধ থাকে, আলাদা আকর্ষণ ও আবেদন থাকে এবং যাঁর যেরকম মনের চাহিদা, তিনি সেই রকম আড্ডা খুঁজে নেন। এই আড্ডা খুঁজে-নেওয়া এবং পাওয়া রীতিমত একা মিস্টিক (mystic) ব্যাপার; অনেকটা অন্তরের সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার মতন। খুঁজলে পাওয়া যায় না, যখন পাওয়া যায় তখন মনে হয় যেন এক অদৃশ্য মহাশক্তি জুগিয়ে দিল এবং প্রথম দর্শনে প্রেমের মতন একদিন সেই আড্ডায় গিয়ে বসলেই মন ভেতর থেকে বলে ওঠে, এই তো আমার আড্ডা। সারা জগতের মধ্যে আমার জন্যে বিধি-নির্দিষ্ট এই একমাত্র জায়গা, যেখানে সহজ মানুষ হিসেবে আমার কোনও লজ্জা-সংকোচ বা দ্বিধার কারণ নেই, যেখানে ভুল করলে কেউ বেত নিয়ে তেড়ে

আসবে না। রসিক চিনেরা যা বলে, যদি আমার কোনও গোপন দাদ থাকে, সেখানে নিঃসংকোচে চুলকোতে পারি, আঁটসাঁট ভব্যতার পোশাক খুলে যেখানে দেহ-মন নিঃসংকোচে হালকা হতে পারে, যদি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে গান গাইবার বাসনা, সুর-তাল-হীন রাসভকণ্ঠে যেখানে আনন্দে গেয়ে উঠতে পারি নিধুবাবুর টপ্পা বা রবিঠাকুরের গানের একটা লাইন এবং সে-লাইনটার মধ্যে নিজস্ব সুর ছাড়া যদি নিজস্ব দু'একটা শব্দও ঢুকে যায় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের ভয়ে বা বিশ্বভারতীর কর্তৃমণ্ডলের ভয়ে আঁতকে উঠতে হবে না। প্রত্যেক কাজের মানুষের এই রকম একটা জায়গা দরকার, নইলে কাজের ভারে জীবন শুকিয়ে যায়। এই হল আড্ডার পরম সার্থকতা।

কলকাতা শহরে আরও গুটিকতক বিশিষ্ট আড্ডা লেখকের জানা ছিল। একটা আড্ডা ছিল, যার ছোট্ট ঘর থেকে আজকের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্বনামখ্যাত লেখক বেরিয়ে এসেছেন, সে হল 'কল্লোলে'র আড্ডা। ঠিক সেই সময় শহরের আর এক পাড়ায় গড়ে ওঠে আর একদল সাহিত্যিকদের আড্ডা, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা।

এই দুই আড্ডার রেষারেষি একদিন এমন সুতীব্র হয়ে ওঠে যে এই দুই দলকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সাহিত্যের প্রথম Summit meeting-এর ব্যবস্থা করেন। এই দুই আড্ডার নিভৃত অন্তরালে আছে রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যিকদের সংগ্রামী জীবনের বহু হাসি-কান্নার অলিখিত ইতিহাস। কল্লোলের আড্ডা বহু দিন হল ভেঙে গিয়েছে, তার কিছু কাহিনি অচিন্ত্যকুমার তাঁর অপূর্ব লেখায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। শনিবারের চিঠির সে আড্ডাও ভেঙে গিয়েছে, যদিও তার দরজা এখনও বন্ধ হয়নি। যে সজনীকান্ত দাসকে কেন্দ্র করে সেই আড্ডা গড়ে উঠেছিল, অরণ্যচারী সে সিংহ আজ বিবরবাসী, শান্ত, হয়ত ক্লান্ত।

আড্ডাকে জোর করে বাঁচিয়ে রাখা যায় না, রাখা উচিত নয়। প্রাণের তাগিদে আড্ডা আপনা থেকে গড়ে ওঠে, প্রাণের তাগিদ শুকিয়ে এলে আড্ডাও আপনা থেকে শুকিয়ে যায়। আড্ডা হল ওষধি-বৃক্ষ, একবার ফল দিয়েই শুকিয়ে মরে যায়। তার আয়ুর এই অনিশ্চয়তাই হল তার মাধুর্যের প্রধান উপকরণ।

অধিকাংশ আড্ডাই একজন আড্ডাধারীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এবং যে-সে আড্ডাধারী হতে পারে না। একটা আড্ডাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, কথা ছাড়া বহু জিনিসের দরকার হয়। একজন মানুষকে নিঃশব্দে অনেকখানি দিতে হয়, তবে একটা আড্ডা বেঁচে থাকে।

শুধু চাষ করলেই শস্য পাওয়া যায় না। প্রত্যেক শস্যের এক-জাতীয় শত্রু আছে, তাদের হাত থেকে শস্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। আড্ডারও তেমনই এক জাতীয় শত্রু আছে, তাদের নানা রকমের আকৃতি ও প্রকৃতি। তারা হল আড্ডার উইপোকা। একবার আড্ডায় ঢুকলে আড্ডা ঝাঁজরা করে তবে বেরোবে।

তাই শুনতে যত সহজ, আড্ডা দেওয়া কিন্তু তত সহজ নয়। নিজের বাইরে অপর মানুষকে যে অন্তর থেকে সহজভাবে শ্রদ্ধা করতে না শিখেছে, সে কখনও আড্ডা দিতে পারে না। আড্ডায় মানুষকে দেখলে, তার কথাবার্তা শুনলে স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় তার শিক্ষা কালচারে পরিণত হয়েছে কি না।

এ ছাড়া, আড্ডার সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক শত্রু হল, নারী।

বর এবং কনে, দুটো মানুষ না থাকলে যেমন বিয়ে হয় না, তেমনই আড্ডা বললেই দুটো বিশেষ মানুষের দরকার, আর সবাই বরযাত্রী।

আড্ডার এই দুটি বিশেষ মানুষের মধ্যে একজন হলেন— স্বয়ং আড্ডাধারী। আড্ডার সৌরজগতে তিনি হলেন সূর্য, তাঁকে কেন্দ্র করেই আড্ডার চক্র ঘোরে।

চঞ্চল জগতে এই আড্ডাধারী হলেন স্থির-বিন্দু। তাঁর অফিস নেই, আত্মীয় নেই, বিয়ের নেমন্তন্ন নেই, সভায় বক্তৃতা দেওয়া নেই, সিনেমা দেখার বাতিক নেই, শালির পাকাদেখা নেই, শালার ছেলের অন্নপ্রাশন নেই, দার্জিলিং নেই, পুরী নেই, তাঁর একমাত্র কাজ হল অচল বিগ্রহের মতন আড্ডা আলো করে বসে থাকা। কলকাতার রাস্তা জলে ডুবে যাক, সূর্যের তাপে রাস্তা গলে যাক, জাপানিরা এসে ওপর থেকে বোমা ফেলুক, প্রত্যেক আড্ডাবাজ জানে আড্ডায় গেলে অন্তত একজনকে দেখতে পাওয়া যাবে, সেই একটি লোক হল আড্ডাধারী।

আড্ডার দ্বিতীয় বিশেষ লোকটি হলেন, নাপিতের ক্ষুর শান দেবার জন্যে যে পাথর থাকে, সেই শান-পাথর।

এক-এক আড্ডায় তাঁর এক-এক রকম উপাধি, কিন্তু তাঁর প্রয়োজনীয়তা একই রকমের। হাসির ক্ষুর ভোঁতা হলেই তাঁর ওপর শাণ দিয়ে নেওয়া হয়। কোনও আড্ডায় তিনি মামা, কোনও আড্ডায় খুড়ো। আড্ডাধারীর মতন তিনিও আড্ডার অপরিহার্য অঙ্গ।

এ ছাড়া প্রত্যেক আড্ডায় একজন কি দুজন এমন লোক থাকেন কথামৃতের ভাষায় যাঁদের বলা যায়, রসদ-জোগানদার— আড্ডার মধ্যমণি। যে আঠায় আড্ডা জোড়া বেঁধে থাকে, তাঁর মুখের কথায় থাকে সেই আঠা। ফুটবল খেলায় তিনি

হলেন সামাদ, সবাই চেষ্টা করে তাঁকে বল দিতে, কারণ বল তাঁর কাছে গেলেই খেলা জমে। আড্ডায় সবাই চেষ্টা করে তাঁকে কথা বলাতে, সব কথাই তাঁর দিকে ছুড়ে ফেলা হয় এবং তাঁর নিজস্ব কায়দা থাকে কথা লুফে নেবার এবং তিনি জানেন কোন সময়ে কোন কথা কাকে 'পাস' করতে হবে!

ছাপানো কাগজে হয়তো এইসব কথাবার্তার সবখানি ছাপা না হতে পারে কিন্তু আড্ডার এই সেনসর-হীন স্বাধীন জগতে বাংলা ভাষার নিজস্ব যে স্বাভাবিক জলুস ফুটে ওঠে, ছাপানো ভাষা তার কাছে মনে হয় কৃত্রিম, প্রাণহীন, ন্যাবা রুগির চোখের মতন ফ্যাকাশে।

বিগত যুগের কলকাতার বিভিন্ন আড্ডায় এই জাতীয় যে ক'জন রসদ-জোগানদারকে দেখেছি, তার মধ্যে পাঁচ জনের তুলনা নেই, দাদাঠাকুর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (বুড়োদা), নলিনীকান্ত সরকার (এখন পণ্ডিচেরী আশ্রমবাসী), কাজী নজরুল ইসলাম (এখন নিস্তব্ধ) এবং বিশ্বপতি চৌধুরী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। তিথি-নক্ষত্রের যোগাযোগে যখন এঁরা তিনজন কি চারজন একই আড্ডায় এসে পড়তেন, আমার বিশ্বাস, স্বর্গের একঘেয়েমি থেকে বাঁচবার জন্যে তখন নন্দনকানন ছেড়ে দেবতারা অলক্ষে এসে দাঁড়াতেন এঁদের কথাবার্তা শোনবার জন্যে। এবং আড্ডা ভাঙার পর যখন আবার তাঁরা স্বর্গে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন, আমার স্থির বিশ্বাস, হাসি-কান্না-ভরা মাটির পৃথিবীর জন্যে নিশ্চয়ই তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

নলিনীকান্ত দাদাঠাকুরের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও রসিকতা সম্বন্ধে একখানি সুন্দর বই লিখেছেন কিন্তু সিংহকে অরণ্যে না দেখলে যেমন সিংহের পুরো রূপ দেখা যায় না, তেমনই আড্ডায় প্রত্যক্ষভাবে যিনি দাদাঠাকুরকে কথা বলতে না শুনেছেন, তিনি জীবনের একটা মধুরতম আনন্দের স্বাদ থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন।

বাইরের সামাজিক জীবনে মানুষের মুখে অধিকাংশ সময়ই মুখোশ পরা থাকে, রাজনৈতিকের মুখোশ, অধ্যাপকের মুখোশ, সমাজ-নেতার মুখোশ, ব্যবসায়ীর মুখোশ— কিন্তু আড্ডার অন্তরঙ্গতায় সে-মুখোশ আপনা থেকে খসে পড়ে, একেবারে গামছা-পরা খালি-গা ভেতরের মানুষটি তখন ফুটে ওঠে... আড্ডায় দেখলে বোঝা যায়, কে কোন জাতের মানুষ। বিদ্রোহী নজরুলকে, গায়ক নজরুলকে, কবি নজরুলকে যাঁরা বাইরে থেকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁর এক চেহারা দেখেছেন... সেই নজরুল যখন আড্ডায় বসে কড়িকাঠ ফাটানো হাসি হাসতেন, সে আর এক নজরুল।

আমার অনেক সময় মনে হয়, আজকের অনেক বাঙালি সাহিত্যিক বাংলা ভাষা জানেন না... তাঁরা একরকম বই-লেখার মতন পুথিগত বাংলা ভাষা জানেন, এই সব সাহিত্যিক আড্ডায় নজরুলকে যাঁরা কথা বলতে শুনেছেন, তাঁরা জানেন পোশাকি

রূপের বাইরে বাংলা ভাষার একটা মাটিমাখা রূপ আছে, প্রতিদিনের জীবনে মানুষের মুখে মুখে এই ভাষা ঘুরে বেড়ায়, জেলায় জেলায় এর স্বতন্ত্র জলুস আছে, স্বতন্ত্র রূপ আছে... প্রতিদিনের জীবনের হাসি-কান্না-ঠাট্টার অন্তরঙ্গতার ভেতর এই ভাষার ইডিয়ম ভাঙে গড়ে...

জেলায় জেলায় বিভিন্ন এই মুখের কথার ভাষা হল বাংলা ভাষার খনি... এই ভাষার প্রচণ্ড ভবিষ্যৎ আছে এবং যাঁরা ভাষা নিয়ে কারবার করেন তাঁদের এই খনির সন্ধান নেওয়া দরকার। এই খনি থেকেই বাংলার বাউল গানের ভাষা এসেছে, শ্যামাসংগীতের ভাষা এসেছে... কথাসাহিত্যে এই ভাষার প্রচণ্ড সার্থকতা সম্বন্ধে বাংলার আদি কথা-সাহিত্যিক আলালের ঘরে আর হুতোম প্যাঁচার নকশায় প্রত্যক্ষভাবে তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত জানিয়ে গিয়েছেন। সত্যিকারের খেলোয়াড়ের হাতে পড়লে এই ভাষা শাণিত তলোয়ারের মতন কাজ করে। আগের যুগের কোনও কোনও বাঙালি সাংবাদিক এই ভাষাকে গণ-চিত্ত-প্রভাবের প্রধান বাহন করেন... স্বদেশী যুগে 'সন্ধ্যা' এই ভাষায় অতি সাধারণ লোকের মনেও আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। চাটগাঁ থেকে চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত এই ভাষা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রূপ-ভঙ্গিমায় ভাদ্রের ভরা নদীর মতন বয়ে চলেছে... নজরুল এই বিচিত্ররূপা বাংলা ভাষাকে অনায়াসে আয়ত্ত করেছিলেন, যে-কোনও জেলার ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন এবং অনর্গল বলতে পারতেন।

তখন 'নায়কে'র স্বনামখ্যাত সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে 'পেঁচো' জীবিত। তিনিও বাংলার এই কথ্যভাষার একজন ওস্তাদ ছিলেন। নজরুল তখন 'ধূমকেতু' বার করেছেন। পাঁচকড়ির সঙ্গে লাগল নজরুলের ঝগড়া। পাঁচকড়ি 'নায়কে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে নজরুলকে গালাগালি দিতে লাগলেন, নজরুল 'ধূমকেতু'তে তার জবাব দিতেন। এ কলমের লড়াইয়ে নজরুল গোড়া থেকেই মেঠো বাংলা ভাষার তলোয়ার চালাতে থাকেন, পাঁচকড়ি বাধ্য হয়ে সাধু ভাষার ছড়ি ছেড়ে দিয়ে মেঠো ভাষার কুড়ুল ধরলেন। ইস্পাতে ইস্পাতে সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ঝরে পড়তে লাগল। পাঁচকড়ি তখন পাকা প্রবীণ লেখক, নজরুল নবাগত তরুণ। কিন্তু তরুণ নজরুলের ভাষার তোড়ে পাঁচকড়ির কুড়ুল হাত থেকে পড়ে যায়। পাঁচকড়ি স্বীকার করেছিলেন, এই 'মুসলমান' ছেলেটি বাংলা ভাষা জানে।

সে-যুগের সাহিত্যিক আড্ডার আর একজন বিশেষ রসদ-জোগানদার ছিলেন মহাস্থবির জাতকের অমর স্রষ্টা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী...বুড়োদা নামে তিনি আড্ডার জগতে সুপরিচিত। জীবনের প্রান্তলগ্নে এসে আজ তিনি রোগশয্যার নির্জনতায় একা বসে হয়তো আড্ডার স্বপ্ন দেখছেন, একদিন তাঁর মুখের কথায়, তাঁর আনন্দ-উজ্জ্বল অপরূপ

ব্যক্তিত্বে, বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর সরস আলাপে এই দুঃখ বেদনা-সমস্যাক্লিষ্ট জীবনের ফাঁকে ফাঁকে খণ্ড খণ্ড বহু আনন্দের স্বর্গলোক রচিত হয়েছিল... দুঃখের বিষয়, এই সব অপরূপ আনন্দের মুহূর্তের কোনও স্মৃতিচিহ্ন কোথাও থাকবে না।

মানুষ যত সব শিল্পকাজ করে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিল্প যেটা, সেটা অবজ্ঞাত হয়েই থাকে... সে-শিল্পের নাম হল, বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাই হল সবচেয়ে বড় আর্ট। বেঁচে সবাই থাকে, কিন্তু বেঁচে থাকার আর্ট শতকরা একজনও জানে না।

যাঁরা এই আর্টে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁরা একটা জিনিস পেয়েছেন, সেটা হল অস্তিত্বের আনন্দ। আড্ডায় বুড়োদাকে দেখলে জানা যায় এই অস্তিত্বের আনন্দ কী জিনিস। প্রদীপের আলো যেমন এক নিমেষে অন্ধকার ঘরকে আলোয় ভরিয়ে তোলে, তেমনই আড্ডায় এলেই এই লোকটির আনন্দে সবাই আনন্দে ভরে উঠত। বাঙালির একটা দুর্নাম, সে বড্ড বেশি কথা বলে। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে এক-জাতের কথা-বলিয়ে লোক ছিলেন, যাঁরা কথা বলাকে আর্ট করে তুলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন রসিক, তাঁরা ছিলেন আলাপচারী শিল্পী, তাঁদের আলাপের মধ্যে ছিল সম্মোহন। বুড়োদা ছিলেন আলাপচারী শিল্পীদের রাজা। অনেকেই হয়তো জানেন না, যে-জাদু আছে শরৎচন্দ্রের লেখায়, সেই জাদু ছিল তাঁর কথা বলায়, এবং মুভিং ম্যাজিস্ট্রেটের মতন তিনি ছিলেন মুভিং আড্ডা... যেখানে গিয়ে বসতেন, সেইখানেই আড্ডা জমে উঠত। এক সময়ে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির আড্ডায় এবং নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের আড্ডায় শরৎচন্দ্র আড্ডা দেবার তাগিদে বাজেশিবপুর থেকে ছুটে আসতেন; গাড়ি না পেলে ট্রামে আসতেন।

পটুয়াটোলা লেনের গলিতে রাস্তার ওপর একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে তিনটে ধাপ সিঁড়ি ওপরে উঠলে, একফালি একটা ছোট্ট রক, রকের সামনে একটা ছোট্ট ঘর... ঘর থেকে রকে আসতে গেলে একটা দরজা আছে, এই দরজা দিয়েই সাধারণত এই ঘরে ঢুকতে হয়... কিন্তু পেছন দিকে অপর একটা দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে বাড়ির লোকেরা যাতায়াত করেন। দরকার হলে, পেছনের সেই দরজা দিয়েও এই ঘরে ঢোকা যায়

এই ঘরে কল্লোলের জন্ম হয় এবং কল্লোলের সেইটেই আড্ডাঘর।

প্রথমেই ঘরে ঢোকবার দুটো দরজার বিবরণ দিতে হল, তার এক উদ্দেশ্য আছে...

কল্লোলের ঘরে একটা ছোট্ট টেবিল, টেবিলের সামনে একটা চেয়ার, সেটা হল সম্পাদক ও আড্ডাধারীর চেয়ার। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে একটা ছোট তক্তাপোশ, আর একটা ছোট্ট ডেক-চেয়ার। এই ডেক্-চেয়ারটির কি গুণ ছিল, সব আড্ডাধারীই

এই চেয়ারটিতে বসতে চাইত... তাই বাইরে থেকে যিনিই আড্ডায় আসতেন, রাস্তা থেকে দেখে নিতেন এই ইজিচেয়ারে কেউ বসে আছেন কি না! যদি দেখতেন যে, চেয়ার দখল করে, ধরুন পবিত্র গাঙ্গুলী আগে থাকতে বসে আছে, অচিন্ত্যকুমার সামনের দরজা দিয়ে না ঢুকে গম্ভীরভাবে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পবিত্রকে বলত, এই শৈলজা বাইরে তোকে একবার ডাকছে...

পবিত্র তাড়াতাড়ি বাইরে শৈলজার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ত... উঠতেই হত, কারণ "বাইরে তোকে একবার ডাকছে" কল্লোলের আড্ডায় এ কথাটার একটা গোপন তাৎপর্য ছিল।

বাইরে বেরিয়ে শৈলজাকে না দেখেই পবিত্র বুঝতে পারত, ইজিচেয়ার দখল করে অচিন্ত্য বসে আছে... সেই সময় হঠাৎ যদি পবিত্রর নাক ফুলে উঠত, তাহলে সেইখান থেকেই রেগে সে চলে যেত, ঘরে আর ঢুকত না। নাক ফুললে পবিত্র আর রাগ সামলাতে পারত না!

কিন্তু মিনিট দশেক পরেই ফিরে আসত... আড্ডায় ফিরে আসতেই হবে... ইতিমধ্যে কারুর কাছ থেকে খানিকটা শুখো খইনি জোগাড় করে গালে ফেলে আবার সেই ঘরে ঢুকত... ইজিচেয়ারে অচিন্ত্যের দিকে চেয়ে বলত, এই যে, কখন এলি রে!

যেন এই প্রথম দেখা হল! চেয়ার হারানোর দুঃখ সগৌরবে চাপা দিতে হত!

মিনিট দুই পরে হঠাৎ বাড়ির ভেতর দিক থেকে এই ঘরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হত।

পবিত্র উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে... তারপর অচিন্ত্যের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে, বউদি ডাকছে।

বউদির ডাকে কল্লোলের আড্ডাধারীদের কাছে irresistible! এই ভবঘুরে ভিখিরিদের কাছে তিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা।

অচিন্ত্য ইজিচেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাড়ির ভেতর ঢোকে!

পবিত্র সগৌরবে আবার ইজিচেয়ারে এসে বসে!

সেই দশ মিনিটের ফাঁকে পবিত্র বউদির সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছিল, অচিন্ত্যকে চেয়ারচ্যুত করার কৌশল!

সারাদিন এইভাবে সেই ছোট্ট ডেক-চেয়ারটিকে নিয়ে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ!

সেদিন সেই জীবনের স্বপ্ন-জাগর-লগ্নে সামান্য সেই ইজিচেয়ার দখল করে বসার মধ্যে যে আনন্দ ছিল, আজ আর সে আনন্দের চিহ্ন কোথাও নেই!

কল্লোলের সেই আড্ডায় অদৃশ্য চুম্বকের আকর্ষণে সেদিন যাঁরা এসে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই চোখে ছিল স্বপ্ন, মনে ছিল যৌবনের খেলা-রস,

প্রাণে ছিল দুর্বার দুরাকাঙক্ষা। এই আড্ডাঘর দেখেছে বাংলার শেষ রোমান্টিক রিভাইভাল, এই আড্ডাঘরই দেখেছে রোমান্টিসিজমের সমাধি...

সে সমাধির দ্বার বন্ধই থাক।

আড্ডাকে বাঁচিয়ে রাখা রীতিমত একটা সাধনার বস্তু।

প্রত্যেক আড্ডার একটা বিশেষ চরিত্র আছে, বিশেষ স্বাদ আছে, বিশেষ আবহাওয়া আছে। আড্ডাধারীর কাজ হল আড্ডার সেই বিশেষ আবহাওয়াটিকে বাঁচিয়ে রাখা। সেটা খুব শক্ত কাজ। পাঁচজন লোক যেখানেই জড় হয়, বিশেষ করে পাঁচজন বাঙালি যেখানে জড় হয়, সেখানে পাঁচমুখে পাঁচরকম কথা হবেই। আড্ডাধারীর সেই জন্যে সব সময় সজাগ হয়ে থাকতে হয়, যাতে এই পাঁচকথা এক মোড়ে এসে আবার মেশে।

যাঁরা আড্ডায় আসেন, তাঁরাই রসিক নন। সকলের মাত্রাজ্ঞান সমান নয়। কারুর হয়তো কলিক পেন আছে, আড্ডায় এসে চেয়ারে বসতে না বসতেই তিনি শুরু করলেন সেই কলিক পেনের গল্প... তাঁকে গ্রহণ করতে হলে তাঁর সেই কলিক পেনের গল্পকেও গ্রহণ করতে হবে... প্রতিদিন আড্ডাধারীকে সহৃদয় অন্তরে শুনতে হবে সেই কলিক পেনের কাহিনি .. আড্ডাধারীকে হতে হবে আদর্শ-শ্রোতা।

কোনও কোনও বাঙালির একটা জন্মগত ধারণা আছে, পৃথিবীর আর সব লোকের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে শুধু তাঁর কথা শোনবার জন্যেই। আড্ডায় তাই তিনি অন্য কাউকে কথা বলতে দেন না, এমনকী পাশের লোক কথা বললে তিনি জোর করে তাঁর মুখে হাত-চাপা দিয়ে নিজে বলতে আরম্ভ করেন। সুকৌশলী সেনাপতির মতন আড্ডাধারীকে তখন মধ্যস্থ হয়ে কথার মোড় ফেরাতে হয়।

সব চেয়ে বিপদ হয়, স্পেশালিস্টদের নিয়ে। বড় বড় ডাক্তাররা যেমন এক এক বিষয়ে স্পেশালিস্ট, তেমনই সাধারণ মানুষদের মধ্যেও স্পেশালিস্ট আছেন। আড্ডায় যদি আমের কথা উঠল, আর রক্ষে নেই, আড্ডায় যদি কোনও আম-স্পেশালিস্ট থাকেন তিনি তখন চিৎকার করে উঠবেন, আম দেখেছেন? আম কী করে খেতে হয় জানেন? কলকাতার লোকেরা আম চেনে?

সাধারণত মুর্শিদাবাদের লোকেরা আম-স্পেশালিস্ট হন... তাঁদের সামনে আমের কথা উঠলে আর রক্ষে নেই। তখনই শুরু হবে আমায়ণ। আড্ডাধারীকে বিব্রত হয়ে দেখতে হয়, আমের খোসায় আড্ডা পিছলে না পড়ে যায়।

এমনই আছেন মাছধরা স্পেশালিস্ট। মাছধরার কথা উঠলেই তাঁরা পকেট থেকে পচা 'চার' বার করবেনই... এবং শুধু তাঁর মাছধরার কাহিনি নয়, তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের

মাছধরার কাহিনিও শুনতে হবে। কারণ ছেলেবেলায় এই জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকেই তিনি মাছধরা শিখেছিলেন... জ্যাঠামশাইয়ের ছিপটা উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছেন... এই ছিপে সামান্য কেঁচোর চার দিয়ে জ্যাঠামশাই একবার পনেরো সের একটা কাতলা... ইত্যাদি... ইত্যাদি...

তেমনই আছে অসুখ-স্পেশালিস্ট। আড্ডায় কেউ যদি কোনও অসুখের কথা তুলল, অসুখ-স্পেশালিস্ট তাকে ধমকে থামিয়ে দেবেন, কারণ তার দশগুণ বেশি অসুখ তাঁর হয়েছিল... তাঁর গৌরব, পৃথিবীর যাবতীয় বড় অসুখের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। এবং হেন বড় ডাক্তার নেই, যাঁর প্রেসক্রিপশন তাঁর মুখস্থ নেই।

এঁরাই হলেন আড্ডার উইপোকা... ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা হয়তো খুব ভাল মানুষ... হয়তো সত্যিকারের একজন গুণী লোক... কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, উইপোকার মতন নীরবে এঁরাই আড্ডাকে ভেতর থেকে ঝাঁজরা করে দেন।

আমার বিশ্বাস, শনিবারের চিঠির আড্ডার ভাঙনের সূত্রপাত হয় এমন একজন আড্ডাধারীর জন্যেই। আড্ডায় তিনি থাকলে আর কাউকে কোনও কথা বলতে হত না, কারণ সব কথাই তিনি বলবেন এবং তাঁর মতই একমাত্র ঠিক মত, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু বললে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আরও জোরে, আরও বেশি কথা বলতেন।

কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতা-আবৃত্তি আমাদের শুনতে হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছন্দ-তাল-রসিক কবি।

প্রকৃত আড্ডাধারীর একমাত্র বিশেষণ হল সে রসিক, সে ভদ্র... সে শিখেছে কী করে নিজেকে আড়াল রেখেও নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর ও অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

আড্ডার জগতে কোনও বাঁধন নেই, কোনও নিয়ম নেই, কোনও এটিকেটের বালাই নেই...

শুধু একটি নিষেধ আছে, যে চেয়ারে বসে আছ, নিজেকে তার চেয়ে বড় দেখাতে চেষ্টা কোরো না।

চাঁদে গেলে শুনেছি মানুষ হালকা হয়ে যায়..

আড্ডা হল সেই চাঁদের দেশ...

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত আধ ঘণ্টাও যদি নিজেকে হালকা করতে পারা যায়, জীবনের তেতো স্বাদ অনেকখানি কেটে যায়...

আড্ডার একটা মস্ত বড় স্বাভাবিক ত্রুটি হল, আড্ডা পুরুষের একান্ত জগৎ...

ত্রুটি হলেও, সেইটেই আবার আড্ডার রক্ষাকবচ...

আড্ডার দশ হাতের মধ্যে স্ত্রীলোক থাকলে, আড্ডা ভেঙে যায়...

রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে চিরকুমার সভা লেখেন...

প্রত্যেক বিবাহিতা স্ত্রী আড্ডাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখেন...

আড্ডাধারী-স্বামীর জন্য তাঁকেই নিশীথ-নিস্তব্ধতায় একা জেগে বসে থাকতে হয়...

আড্ডা ভাঙার পর প্রত্যেক স্বামী যখন বাড়ির দিকে ফেরেন, তখন মনে মনে একটি প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত হয়েই তাঁকে ফিরতে হয়— আড্ডা ভাঙল?

শয্যাপ্রান্তে দুটি তন্দ্রাক্রান্ত ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে প্রতিদিন একই শয্যায় ফিরে আসার অবসাদ অনেকখানি কেটে যায়...

আড্ডা: ঘরে অথবা পথে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শিরোনামা থেকে এ-ধারণা কারও যেন না হয় যে, আড্ডা শুধু ঘরে বসেই চলে। মোটেই তা নয়। আড্ডা যেখানে মন চায় সেখানেই দেওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে গেলে আড্ডা শব্দটা রোয়াক বা চাতালের সঙ্গে জড়িয়েই প্রথম চালু হয়েছিল, আর কলকাতাকে একটা বিশেষ প্রসিদ্ধিও দিয়েছে রোয়াক কী চাতালের আড্ডার শহর হিসেবে।

যে রোয়াক বা চাতালের আড্ডা কলকাতার বিশেষ একটি আকর্ষণ ছিল তাতে যোগ দেওয়ার তেমন সুযোগ আমার মতো নাগরিকদেরও খুব বেশি বোধহয় হয়নি। কারণ আমাদের ছেলেবেলাতেই মানুষ বাড়ার চাপে জায়গার টান পড়ে চাতাল রোয়াক গোছের ছাঁটকাট হতে হতে লোপ পেতে বসেছে। তাই রোয়াকের আড্ডার সুনাম দুর্নাম আমার কানে যতটা শুনেছি প্রত্যক্ষভাবে তার বোলো আনার এক আনা ভাগও কোথাও নেবার সুযোগ পাইনি।

কলকাতা না হোক রোয়াক চাতালে আড্ডা জমাবার কিছুটা স্বাদ আমি অবশ্য পেয়েছি বারাণসী ধামে। সেখানে রোয়াক বা চাতাল অবশ্য জোটেনি, তবে তার অভাব পূরণ করেছে গঙ্গার বিখ্যাত সব ঘাটের ধারের বুরুজগুলি। সে উনিশ শো চব্বিশ-পঁচিশের কথা। তখনও দু-চারটে বুরুজ সন্ধ্যার পর সত্যিই ফাঁকা পাওয়া যেত, আর সেখানে দুঃসহ দুর্গন্ধের তাড়ায় ছুটে পালিয়ে আসার কথা ভাবতে হত না।

কড়া শীতের দুটো মাস ছাড়া সারা বছরই সন্ধ্যার পর সেই সব বুরুজের আড্ডা কলকাতার চাতাল রোয়াকের আড্ডার সঙ্গে সমান তালেই পাল্লা দিতে পারত বলে মনে হয়।

শুধু গঙ্গার ঘাটের বুরুজেই নয়, কাশীর অদ্ভুত সব জায়গাতেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা জমাবার স্মৃতি আমার আছে। অদ্ভুত জায়গা বলতে কখনও যেমন রাস্তার

ধারের ফুচকাওয়ালা চারিয়ারে থান-ইট পাথর বা কাঠ কাঠবার যা কিছু জোটে তার ওপর বসে গুলতানি তেমনই কখনও আবার কোনও এক ঘাটের ধারে বিশেষ করে কেদার-ঘাটের মাথায় একটুখানি ফাঁকা জমিতে রাস্তার পরামাণিকের কাছে ক্ষৌরি হতে বসা নিজেদের একজনকে ঘিরে আড্ডা জমানো। সে আড্ডার মধ্যে জলের স্রোতের তরলতার একটু লক্ষণ আছে। যারা সেখানে বসেছে তাদের কারুরই মৌরসী আসন নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কিছুক্ষণের জন্যে আড্ডায় আটকে বসে পড়ে আবার ভেসে চলে যাচ্ছে এমন আড্ডাধারীর সেখানে অভাব নেই। আর পথে যেতে যেতে কিছুক্ষণের জন্যে আড্ডায় জমে গিয়ে যারা আবার ভেসে যাচ্ছে তারা নিয়মিত হাজিরা-দার যেমন নয়, তেমনই নয় নেশায় নেশায় সামাজিক মান মর্যাদা কি বৈষয়িক অবস্থায় এক জাতের মানুষ। ও-পথে যেতে যেতে নামকরা অধ্যাপক যেমন একটু থেমে দাঁড়িয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জোড়া দেওয়া দুটো ভাঙা ইট কি একটা শুকনো গাছের ডালকে আসন করে বসে পড়েছেন শেষ পর্যন্ত, তেমনই আটকা পড়েছে তখনকার বাঙালিটোলার সবচেয়ে নামকরা এক অ্যামেচার উঠতি অভিনেতা, এর মধ্যেই কোথাও কোথাও ভক্তদের মহলে ছোট দুর্গাদাস বলে তাকে ডাকা শুরু হয়ে গেছে।

যেখানে বসুক সেখানেই জমে ওঠবার এ জাতের আড্ডার জন্যে কেন্দ্রের চুম্বক হিসাবে একজন মধ্যমণি অবশ্য দরকার।

সেই মধ্যমণি হিসেবে যাঁকে আমাদের পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল একা তাঁর কথা বলতে গেলে দু'কথায় ফুরোবে না। এখানে সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে একটু আভাসই শুধু দিয়ে যাচ্ছি।

যে ধরনের মানুষ আমাদের সেই সৃষ্টিদাতা আড্ডার টানে প্রায়ই জড়ো হতেন তাঁদের দু-চারজনের নাম করলেই আড্ডাটির ও তার চুম্বকস্বরূপ মধ্যমণির কিছু পরিচয় বোধহয় পাওয়া যাবে। একদিকে সাহিত্যের মানচিত্রে রাঢ় দেশকে তার সমস্ত বিচিত্র মানুষ আর প্রকৃতিকে প্রথম তুলে ধরার গৌরব যাঁরা প্রাপ্য সেই শৈলজানন্দের মতো লেখক আর চিরদিন দুঃখদুর্দশা অভাব অনটনের মধ্যে প্রবাসে থেকেও সাহিত্যপত্র সম্পাদনা এক মহত্তম আদর্শনিষ্ঠ সুরেশ চক্রবর্তী যেমন, তেমনই আবার তখনকার সাহিত্য বলতে এক ডাকে চেনবার মতো সমালোচনা ও রম্যরচনার নতুন ধারায় পথিকৃৎদের মধ্যে আনন্দসুন্দর ঠাকুর, ছদ্মনামের একটি সুগভীর বৈদগ্ধের সঙ্গে স্নিগ্ধ চরিত্র-মাধুর্যে উজ্জ্বল একটি মানুষ। সাহিত্যের রাজ্যে না হোক নিজেদের ক্ষেত্রে গনমান্য আরও এমন অনেক জনেরই নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। তবে তা না করে আমি নিজে কীভাবে তাঁকে আবিষ্কার করি আর সমস্ত ভারতবর্ষের

হৃদয়-জয়-করা এক সাহিত্যিকের, তাঁর সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ার একটু বিবরণ দেওয়াই বোধহয় যথেষ্ট।

আমার আবিষ্কারটা হয়েছিল নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে। তখন ঝাঁঝা শহর থেকে সাত আট মাইল দূরের এক পাহাড়ি প্রান্তরের মধ্যে থাকি। সেখানে বারাণসীর এক বন্ধুর কাছ থেকে পোস্টকার্ডের চিঠিতে জরুরি তাগাদা পেলাম অবিলম্বে একবার কাশী ঘুরে যাওয়ার জন্যে। তাগাদার কারণ এই যে সেখানে গেলে 'আনন্দসুন্দর ঠাকুর' ছদ্মনামে যাঁর লেখা তখনকার তরুণ প্রবীণ সকলকে মুগ্ধ ও কৌতূহলী করেছে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। তিনি তখন ক'দিনের জন্যে কাশী বেড়াতে গেছেন।

গেলাম আনন্দসুন্দর ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করতে। সে পরিচয় হল এবং তাতে মুগ্ধও হলাম কিন্তু সেই সূত্রে মুগ্ধ ও বিস্ময়-বিহ্বল করার মতো আর একজনকে যে আবিষ্কার করব তা ভাবতেই পারিনি।

আনন্দসুন্দর ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম আলাপের জন্যে জায়গা ঠিক হয়েছিল একটি বিশেষ বুরুজে। সন্ধ্যার পর সেখানে জমায়েত হয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কীভাবে যে মশগুল হয়ে কেটে গেল ভাল করে যেন বুঝতেই পারলাম না। যে যার বাড়ি ফিরলাম যখন, তখন রাত প্রায় এগারোটা। কাশীর গলিপথে তখনও বিজলিবাতির তেমন দখল ছিল বলে মনে হয় না। সেই আধ-অন্ধকারে প্রায় আমার অভীধ ঘরটির বাড়ি পর্যন্ত যিনি আমার সঙ্গী হলেন তিনিই আমার নতুন আবিষ্কার— এক আশ্চর্য মানুষ। সবল সুঠাম চেহারা যেন পাঠানের আর মুখের চেহারায় গলার স্বরে কথা বলার বৈশিষ্ট্যে যেমন সরস তেমনই গভীর বৈদগ্ধ ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তিতে ঝলমল।

বেশি কিছু বলব না ভেবেও এই মানুষটির কথা ঠিক দু'কথায় সারতে পারছি না। আরম্ভ যখন করেছি তখন তাঁর সম্বন্ধে শেষ ক'টা কথাও যত দূর সংক্ষেপে সম্ভব বলে নিচ্ছি।

সেকালের যথার্থ ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। সামাজিক মর্যাদা ধনসম্পদের সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু সাধারণ সুখ সম্পদ খ্যাতি প্রতিপত্তির জীবনে সন্তুষ্ট হবার মানুষ তিনি নন। সে যুগে বিরাট এক চালু ব্যবসার তিনি কর্ণধার, তারই মধ্যে গোপনে গোপনে তিনি বিপ্লবীদের যথাসম্ভব সাহায্য করেন। জার্মান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনের অজানা গোপন আঘাটায় মাল নামাতে এসে যে জাহাজ বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমেত ধরা পড়ে সেই জাহাজ বিদেশ থেকে সাজিয়ে আনার উদ্যোগে তাঁর অর্থসাহায্য ছিল যথেষ্ট বলেই শুনেছি। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর এ সংস্রব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোয়েন্দারা ঠিকই খুঁজে বার করে। তাঁকে কারারুদ্ধ হয়ে কাটাতে হয় বহু কাল। তার মধ্যে নিঃসঙ্গ কারাকক্ষ বাস, যথেষ্ট দীর্ঘ। বহু দিন বাদে মুক্তি

পাবার পর— পারিবারিক ব্যবসায় তিনি ছোট ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দেন। পড়াশুনা আর সুধী-সজ্জন, গুণীজন সঙ্গ করেই তিনি তখন দিন কাটান। গুণীজন বলতে অবশ্য প্রধান ও প্রায় একমাত্র হলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, কলেজে পাঠ্যাবস্থা থেকেই যিনি গভীর অটুট বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা।

বেশ কিছু বলা হল, তবু যেন কিছুই বলা হল না যে মানুষটির সম্বন্ধে, কী তাঁর নাম? কোথায় পাওয়া যাবে সে নাম?

না, কোনও দুর্লভ রচনার প্রচ্ছদপটে লেখক হিসেবে নয়, কারণ জীবনে বহু আশ্চর্য চেতনা-স্পন্দিত-করা কথা বহুজনকে বললেও এবং সেকালের বহু সার্থক-নামা লেখকের কিছুটা প্রেরণা-স্বরূপ হলেও তিনি ছাপার অক্ষরে নিজের নাম কোথাও রেখে যাননি।

তাঁর নাম পাওয়া যাবে শরৎচন্দ্রের যোড়শী নাটকের উৎসর্গপত্রে। শরৎচন্দ্র এ নাটকটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীসুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়কে। এই উৎসর্গেরও সামান্য একটু ইতিহাস না বললে নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটির নাট্যরূপ শিশিরকুমারের জন্যে তৈরি করার সময় শিশিরকুমারের সঙ্গে তা আলোচনা করতে যেতেন। সেখানে প্রথম প্রথম অজানা আর একজনের উপস্থিতি আর মাঝে মাঝে মন্তব্য তাঁকে এত বিরক্ত ও উষ্ণ করে তোলে যে শরৎচন্দ্র ওই অজানা অখ্যাত মানুষটি শিশিরকুমারের বিশেষ বন্ধু অনুমান করেও তার বিরুদ্ধে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু তারপর ক্রমশ এমন ব্যাপার হল যে নাট্যরূপ নিয়ে আলোচনার সময় ওই অজানা অখ্যাত লোকটি আর তার মন্তব্য ছাড়া তাঁর চলে না এবং শেষ পর্যন্ত গুণমুগ্ধতার গভীর প্রীতিতে নাটকটি তাঁকেই উৎসর্গ করে দিলেন।

এই সুধাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন তখনকার বারাণসীর মুক্ত আকাশের নীচে পথের ধারে কি ঘাটের বুরুজে জমানো বিচিত্র সব আড্ডার মধ্যমণি আমাদের 'সুধাদা'। সে সুধাদার নিজের কোনও লেখা কোথাও না থাকলেও তিনি অক্ষয় হয়ে আছেন তাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্য যাঁরা পেয়েছে এমন অনেকেরই লেখার মধ্যে অগোচর প্রভাব হয়ে।

তাঁকে ঘিরে যে ধরনের আড্ডা জমত প্রাচীন গ্রিসের সঙ্গে তার কিছু মিল হয়তো থাকলেও থাকতে পারে। অন্তত গ্রিসের সে যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শনের চর্চার আস্তানা যে আড্ডাগোছেরই কিছু ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আড্ডার আর একটা বিশেষত্ব হল এই যে তা এক মাপের কলে ছাঁটা কাটা জিনিসের মতো এক জাতের এক মানসিক গঠনের মানুষের জমায়েত নয়। জি কে

চেস্টারটন ক্লাব ও পাব-এর তফাত বুঝিয়ে তাই বলেছিলেন যে ক্লাব বলতে আজকাল যা হয়েছে তাতে আমরা নিজেরা নিজেকেই দেখি একটু ভিন্ন পোশাকে কি চেহারায়। 'পাব' কিন্তু বিচিত্র মানুষের মেলা। নিজের বাইরে পরকে দেখা শোনা বোঝার সেই হচ্ছে সত্যিকার পাঠশালা।

পাব না হোক আমাদের পথের আড্ডাও অনেকটা সেই জাতের। আর সে আড্ডা যাঁকে ঘিরে জমাট সেই মানুষটির তো তুলনাই নেই। কত কিছু যে তিনি পড়েছেন আর কত ভাবে ভেবেছেন মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা দুটো কথার ঝিলিকে তা প্রকাশ পায় বলেই যেন বেশি দামি।

এ মাপের মানুষকে ঘিরে বসবার দরুন যে ধরনের সার্থক আড্ডা জমে তা তো আর যখন তখন যেখানে সেখানে বসবার নয়। সে সৌভাগ্য আমাদের হোক বা না হোক আড্ডা ব্যাপারটায় নিজস্ব একটা আকর্ষণ আর দাম আমার কাছে অন্তত খুব বেশি।

শুধু আড্ডার জন্যেই আড্ডা দেওয়া আমার নেশা। আমার ঘরে বহু কাল ধরে প্রায় লাগাতার আড্ডার যে রেওয়াজ ছিল, যথার্থ অর্থে কুঁড়ে না হলেও আমার কুঁড়েমির একটা চালু অপবাদ তাই থেকেই বোধহয় রটেছে।

মধ্যমণি কেউ না থাকলেও আমার ঘরের আড্ডা বড় কম জমেনি আর কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং কী-সব বিচিত্র মানুষের সঙ্গ পাওয়ার সৌভাগ্যই না তার মারফৎ হয়েছে।

আমার বাড়িতে আমার বাইরের ঘরের আড্ডা এক সময়ে যেমন লাগাতার ছিল তেমনই অবারিত দ্বার। সস্তাগণ্ডার দিন আর সিনেমার রোজগারের কিঞ্চিৎ প্রাচুর্য না হলে শুধু চায়ের জোগান দিতেই ফতুর হবার কথা।

অবারিত দ্বার কথাটা যে কতখানি সত্য তার সামান্য একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি অল্পবয়সি ভদ্রলোক সকালে একদিন এদিকেই এসে আমার দালানের জোড়া তক্তপোশের এক পাশে আসন নিয়েছিলেন। তাঁকে লক্ষ করেছি নিশ্চয় সবাই, কিন্তু নতুন মুখ এখানে হামেশাই দেখা যায়, তাই লোকটির পরিচয় নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। এ আড্ডায় বয়স চেহারা পোশাক ইত্যাদির বাঁধাধরা কোনও মিল নেই। সবে কৈশোর পার হওয়া ছেলেরা তাদের হাতের লেখা পত্রিকার জন্যে লেখা চাইতে যেমন আসে, তেমনই আসেন বয়স্ক এক-আধডজন অচেনা মানুষ সিনেমায় পার্ট পাবার আশায়। এই নতুন মানুষটির চেহারা পোশাক তাদের থেকেও একটু আলাদা বলেই বোধহয় দুপুরের দিকে আড্ডা বেশ একটু পাতলা হবার পর তাঁর হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে

তুলতে গিয়েও কেমন দ্বিধাভাবে নামিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার ধরন দেখে তখনও পর্যন্ত উপস্থিত আমার এক অভিনেতা বন্ধু না জিজ্ঞেস করে বুঝি পারলেন না— আচ্ছা আপনি, মানে আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

ভদ্রলোক এবার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে যা বললেন তাতে দু'চোখ কপালে ওঠবারই কথা। তিনি যা বললেন তার মর্ম হল এই যে, এখানে কোথাও দৈব ওষুধ বিতরণ করা হয় শুনে তিনি সেই সুদূর শালকিয়া থেকে আসছেন। ঠিকানাটা তাঁর সঠিক জানা নেই। এ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এ বাড়ির বাইরে খোলা দরজা দিয়ে অনেককে আসতে যেতে দেখে তিনিও ঢুকে পড়েন। তারপর এ ঘরে এসে বসবার পর কিছুক্ষণ বাদে নিজের ভুল বুঝতে পারলেও বেশ লাগছিল বলে এতক্ষণ তিনি আর উঠতে পারেননি।

বলা বাহুল্য এহেন সভাসদকে সহাস্যেই আবার আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম সেদিন। দৈব ওষুধের যথার্থ ঠিকানা পেয়ে যাবার দরুনই হয়তো তিনি আর আসেননি।

সেই সময়কার কয়েকটা বছরের এমনই অবারিত দ্বার অবিরাম আড্ডায় সময় নষ্ট করার জন্য আমার বেশ ক্ষতি হয়েছে আমার অনেক হিতৈষী মনে করেন।

আমার ধারণা কিন্তু তার বিপরীত। ছাপানো লেখার পরিমাণ দিয়ে বিচার করলে সময়টা একটু বন্ধ্যা বলে হয়তো মনে হতে পারে, কিন্তু আমি ভাল করেই জানি যে ওই আড্ডা বাইরে দিয়ে দেখতে নিষ্ফলা হলেও ভেতরে ভেতরে কিছু সার্থক সঞ্চয়ই আমার জন্যে আহরণ করে রেখেছে।

না। সুধীসমাজে বদনাম বলে বিবেচিত হোক বা না হোক, আড্ডাবাজ হওয়াটা আমার কাছে লজ্জার কিছু নয়। যথার্থই যা আড্ডা তা নিরর্থক অলস কালহরণের বিলাস নয়, তার মধ্যেই আমাদের সভ্য নাগরিক-জীবনের প্রমাণ ও পরিচয়।

আমাদের যুবাকালের আড্ডা: ঝাঁকিদর্শন

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

কলকাতায় চায়ের দোকানের আড্ডার তুলনায় কফি হাউসের আড্ডা নিতান্তই অর্বাচীন। আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় বাড়িতে বাড়িতে চায়েরই একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল। চায়ের কোনও দোকানেই তখন এখনকার অনেক দোকানের মতো চায়ের সঙ্গে কফি পাওয়া যেত না। তখন বাজারে টি স্টেন্‌স নামে পলসনের মাখনের মতন টিনে-পোরা কফি পাওয়া যেত যা পারকোলেটার নামে যন্তর দিয়ে বেশ হাঙ্গামা করে তৈরি করতে হত। সেই ধরনের কফি বেশির ভাগ সাহেব-সুবো আর কিছু কিছু বাঙালি-সাহেব আর অ-বাঙালিরা খেতেন। আর কফি পাওয়া যেত গ্রেট ইস্টার্ন, স্পেনসেস, পেলিটি, ব্রিস্টল, গ্র্যান্ড আর ফারপোর মতন বনেদি বিদেশি হোটেল-রেস্টুরেন্টে। ডিনারের পর খাদ্যরসিকরা নানান ধরনের ব্রান্ডি-লিকিওর এর সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট বোন-চায়নার কাপে যাকে ফরাসিরা দেমি-তাস্‌ বলে তাতে দু-এক চুমুক কফি খেয়ে ভোলতেয়ারের ড. প্যানগ্লসের মতন 'অল ইজ ওয়েল ইন দিস্‌ বেস্ট অফ অল পসিব্‌ল ওয়ার্লর্ডস' গোছের তুরীয় ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

এখন কফি হাউস দুটো থাকলেও আর ইনস্ট্যান্ট কফি বাজার ছেয়ে গেলেও মধ্যবিত্ত বাঙালিদের কফি কি চায়ের মতন ধাতস্থ হয়েছে? আদম-সুমারি না করেও বলতে পারি হয়তো হয়নি। বহু মধ্যবিত্ত গিন্নিবান্নিরা এখনও বলেন 'ম্যাগো কফির গন্ধ শুকলেই মাথা ধরে'। প্রায় বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ আগে দর্মাহাটা স্ট্রিট অঞ্চলে একদিন ঘুরতে ঘুরতে যত দূর মনে পড়ছে 'গ্র্যান্ড বেঙ্গল কেফ্' গোছের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে দেখেছিলাম যে সেখানে কফির নাম-গন্ধ ছিল না। ফরাসি কাফের এই বাঙালি বিকৃতিটি তখন মানে না জানলেও অনেক চায়ের দোকানওয়ালার বড় প্রিয় ছিল। এখনও নামটা অনেকেরই পছন্দ, তবে তাঁরা এখন আর সাইনবোর্ডে 'কেফ' লেখেন না। প্রসঙ্গত বলি, ফরাসি দেশে যেমন কাফে

বলতে একাধারে কফি, ওয়াইন, খাবারের দোকান আর প্রধানত আড্ডার ঘাঁটি বোঝায় কলকাতায় কোনও দোকান কখনও হয়নি যার নাম 'চা'। এর কাছাকাছি ছিল হ্যারিসন রোডের 'জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান' যা একশো বছর চলার পর বেশ কিছু দিন আগে উঠে গেছে। সেখানে শেষবার গিয়ে চা আর সেঁকা পাঁউরুটির সঙ্গে চমৎকার হাঁড়ি কাবাব খেয়েছিলাম।

আমাদের বয়সের অনেক বুড়োদের মতনই আমারও আড্ডা দেওয়ার ডানা গজায় কলেজ আর ইউনিভার্সিটি জীবনে। তখন পুরনো সেনেট হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে লম্বাটে ধরনের চায়ের দোকান, জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান, মির্জাপুর স্ট্রিটের ফেভারিট কেবিন, ইউনিভার্সিটির উল্টো দিকের বসন্ত কেবিন, কলেজ স্ট্রিট ওয়াই এম সি-এর রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি আড্ডার আদর্শ জায়গা ছিল। তবে টানা রাশ-ছাড়া খাঁটি আড্ডা আমরা দিতে শিখলাম আমাদের ১৯৪১ সালে এম.এ. পরীক্ষার পর কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর উল্টো দিকের তখনকার দিনের কলকাতার নানান এলাকায় সুবিখ্যাত সাঙ্গুভ্যালি নামে অনেক চায়ের দোকানের একটাতে। সেই দোকানের অতি সহৃদয় চাটগেঁয়ে যুবক মালিক আমাদের মতন বেকার রেস্তোহীন ছোকরাদের তাঁর দোকানে সকাল নটা থেকে বারোটা-একটা আর সন্ধেয় সাতটা থেকে নটা অব্দি দুটো-তিনটে টেবিল জুড়ে নির্বিবাদে আড্ডা মারতে দিতেন। আর শুধু তাই নয় 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না' কুরুশ কাঠিতে এমব্রয়ডারি করা 'মটো'-টি মকুব করে প্লেন চা, ডবল-হাফ চা (অর্থাৎ বেশি দুধ আর চিনি দেওয়া আধ কাপ চা), টোস্ট, মামলেট, কেক, চপ-কাটলেট বকেয়ায় দিতেও কসুর করতেন না। কথাটা পাড়লাম আমাদের তখন পকেট কী রকম গড়ের মাঠ ছিল সেই অবস্থাটা বোঝাতে। আজ আমরা যারা যমের অরুচি হয়ে ষাটের কোঠার শেষ দিকে পৌঁছে গেছি তাদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে যে তখনকার দিনে শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট অব্দি বহু চায়ের দোকানে খদ্দের পাকড়ানোর জন্যে লাল শালুর কাপড়ের ওপর সাদা অক্ষরে বড় বড় করে লেখা থাকত— 'মাত্র ২ (দু) আনায় এক কাপ চা, দুটো টোস্ট আর ডবল-ডিমের মামলেট।' এ থেকে একটা জিনিসই প্রমাণ হয় যে জগৎ নিয়তই পরিবর্তনশীল। তবে সেটা ভালর দিকে না মন্দর দিকে সে ব্যাপার নিয়ে ধরতাই বুলিতে যাকে বলে 'বিতর্কের অবকাশ আছে।'

সেই সময়ে পয়সা না থাকলেও যৌবনের শুরুতে বাঁচার কী ফুর্তি, জীবনের সব বিষয় সব দিক নিয়ে কী ক্লান্তিহীন উৎসাহ, কী উদ্দীপনা। এই সাঙ্গুভ্যালি চায়ের দোকানে আমরা যারা নিয়মিত যেতাম তাদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ বোস (পরে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের অধ্যাপক), সৌম্য ঠাকুরের আরসিপিআই দলের মেম্বার

আর ব্যাংকের কেরানি সুধাময় দাশগুপ্ত, আমাদের সহপাঠী রবি সেন, ভূপাল সেন, সরল সেন, সুজিত মিত্র। অন্যদের মধ্যে ছিলেন প্রভাত দাস, সুনীল গুহ, রবি চৌধুরী, ত্রিদিব ঘোষ, ইন্দু সেনগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন। আর মাঝে মধ্যেই আসতেন লেখক অশোক গুহ, কবি দিনেশ দাস, সত্যেন মৈত্র আর দু-চারজন কলেজের মাস্টার। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়ুয়া ছিলেন সন্তোষ বোস। তাঁকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক রগুড়ে মুসলমান পুরনো-বইওয়ালা 'বইয়ের ঘুণ' বলে ডাকতেন। আমরা তখন কাজে না হলেও চিন্তাভাবনায় ঘোর মার্কসিস্ট। ঠাট্টা করে বললে বলতে হয় খানিকটা চায়ের কাপে ইনক্লাব করার দল। সে যাই হোক সন্তোষবাবুর কাছ থেকেই আমরা অনেক সময়ই নানান বিলিতি মার্কিন কেতাব আর বিশেষ করে বামপন্থী বই-পত্তরের খবর পেতাম। একটা বইয়ের নাম আমার বিশেষ কারণে মনে আছে। সেটা হল বাড্ শুলবার্গের লেখা 'হোয়াট মেক্স স্যামি র‍্যান্' বলে স্যাম গোল্ডউইনের জীবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা নভেল। সে এক অতি চমৎকার বই। আমার মনে আছে আমি এই পেপারব্যাকের একটা কপি সত্যজিৎ রায়কে দিয়েছিলাম এবং তিনি পড়ে খুব তারিফ করেছিলেন।

এই সময়ে আমেরিকা থেকে আর্মড সার্ভিসেস এডিশানে হাজারে হাজারে উঁচুতে খাটো আড়ে লম্বা কাগজের মলাট আর নিউজপ্রিন্টে ছাপা নাটক নভেল ছাড়া অজস্র বিষয়ের বই আর পত্রিকা জি আই-দের মধ্যে ঢালাও ভাবে বিলি করা হত। এগুলোকে হিপ পকেট বই বলা হত। তা ছাড়াও তাদের জন্যে শক্ত মলাটের বহু আধুনিক আর ক্লাসিক্সও আসত। জি আই-বা তক্ষুনি সেগুলোকে পুরনো বইওয়ালাদের কাছে সের দরে বেচে দিত। এই ধরনের বইয়ের একটা বড় আড়ত ছিল আশুতোষ কলেজের উল্টো দিকের ফুটপাতে রউফের দোকান। আমরা এক-আনা দু-আনা দিয়ে ভাল ভাল বই বেছে বেছে কিনে আনতাম, মডার্ন আর ক্লাসিক সব রকমের বই। আর তেমন তেমন ভাল বই পেলে সাঙ্গুভ্যালিতে নিয়ে গেলে কী হইচই যে হত তা বলা যায় না।

সাঙ্গুভ্যালির এই আড্ডার একজন সবচেয়ে রসিক আর বুদ্ধিমান লোক ছিলেন পূর্বোক্ত সুধাময় দাশগুপ্ত। সন্তোষ বসুর মতন অত না হলেও সব রকমের বই-ই তিনি পড়তেন। তবে তাঁর 'প্যাশন' ছিল দর্শন আর গোয়েন্দা উপন্যাস। সুধাময় সব সময়ে একেবারে মোদ্দা কথায় অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যাপারে মূলে যাবার চেষ্টা করতেন। তাই আমি তাঁকে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলাম 'ফান্ডামেন্টাল-ক্যাংলা'। সুধাময়ই আমাদের প্রথম বুঝিয়েছিলেন যে ডিটেকটিভ নভেলের খুনের মূল সমস্যা হল: ডিসপোজ্যাল অফ দি ডেড বডি। স্মার্ট উক্তি আর কূট প্রশ্ন দিয়ে আড্ডা জমাতে

তাঁর জুড়ি ছিল না। কেউ অসম্ভব অযৌক্তিক কথা নিয়ে এঁড়ে তর্ক করলে তাকে বলতেন, 'এখানে ও সব কথা বলো। গো টু অক্সফোর্ড, দি হোম অফ লস্ট কজেস।' কেউ একজন এক ছোকরার কথা বলে বলেছিল যে তাকে সব সময়ে একজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেখা যায়, তবে ব্যাপারটা একেবারে প্লেটোনিক। সুধাময় তাকে এক কথায় জব্দ করে দেন এই বলে: 'রেখে দাও তোমার প্লেটোনিক লাভ-টাভের কথা। আমার মতে এ কনস্টান্ট নিউট্রাল এসকর্ট ইজ এ বায়োলজিক্যাল অ্যাবসারডিটি'। সুধাময় আবার রামকৃষ্ণর মতন অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপারকে কংক্রিট উদাহরণ দিয়ে বোঝানোয় ওস্তাদ ছিলেন। যেমন কী পুরুষ কী মেয়েমানুষ সবাইকার মধ্যে 'নারসিসাস্ কমপ্লেক্স' যে মজ্জাগত তা বোঝাবার জন্যে মনে আছে তখনকার দিনের একজন বিরাট পণ্ডিত কিন্তু কোনও মতেই সুপুরুষ নন এমন এক নামজাদা অধ্যাপকের নাম করে বলেছিলেন যে তিনি যখন কলেজ স্ট্রিট দিয়ে হাঁটেন তখন তিনিও ভাবেন যে তাঁর মতন সুন্দর দেখতে লোক খুব কম আছে। এ কথা শুনে কিছু 'কথামৃত'র পাঠক-পাঠিকার রামকৃষ্ণ দেবের সেই উক্তি 'লাহাবাবুদের বাড়ির গুড়ের নাগরি দেখেছিস'-এর কথা মনে পড়তে পারে।

আমাদের আড্ডার প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে তাঁদের মধ্যে যাঁর সম্বন্ধে কিছু না বললে আড্ডার কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তিনি হলেন প্রভাত দাস। খাতায় নাম লেখানো না হলেও তিনি সত্যিকারের লেখা-পড়া করা কমিউনিস্ট। তবে আমাদের কাছে তাঁর আদত পরিচয় ছিল তাঁর এক্সেনট্রিসিটি। শুনেছি তাঁর আসল নাম ছিল ফণিভূষণ চোংদার। তারপর পালটে পালটে তাঁর নাম হয়েছিল যথাক্রমে প্রভাত দাস, স্টিফেন প্রভাত দাস (যখন ১৯৪৭-এর রায়টের সময় তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হয়ে মুসলমান-প্রধান অঞ্চল ওয়েলেসলিতে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে লুম্পেনদের সঙ্গে বাস করতেন) আর সব শেষে পারভেজ রিয়াজ। তিনি আড্ডায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বলতেন: 'আরে মশাই আজকে এক্ষুনি যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল তা ভাবতেই পারবেন না।' তখন আমরা 'কী ব্যাপার কী ব্যাপার মশাই বলে কী হয়েছিল' জানতে চাইলে তিনি 'দাঁড়ান দাঁড়ান এক কাপ চা আর সিগারেটটা খেয়েনি'। তারপর যে গল্প বলতেন তার কোনও 'ক্লাইম্যাক্স'ই থাকত না। এটা যাকে বলে তাঁর ডেলিবারেট ভিলেনি ছিল। যেমন 'একদিন কী মজার ব্যাপার ভাবতেই পারবেন না' বলে তিনি বলেছিলেন যে ভাওয়ালি মণ্ডল রোড দিয়ে আসতে আসতে দেখেন যে রাস্তায় কলের জল নিয়ে দু-চারজন হিন্দুস্থানি মেয়ে ঝগড়া করছে। তখন প্রভাত দাস নাকি তাদের বলেন: 'আরে, কাহে কাজিয়া করতা হ্যায়, পানি লেকে আপনা আপনা ঘর যাও।' তারপর

আমাদের বললেন: 'এই কথা বলায় কী হল জানেন মশাই, ভাবতেই পারবেন না। ওদের মধ্যে একজন মেয়ে একটা লাঠি দিয়ে আমার পেটে খোঁচা মেরে বললে, 'আরে ভালা আদমি আপনা রাস্তা দেখ্... হো হো হো'।

সেই একুশ-বাইশ বছর বয়সে আমরা তখন হাজার রকমের বই পড়া, ভারতীয় রাজনীতি, সোভিয়েত কমিউনিজম, স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার আর অজস্র বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি আর 'বিপ্লব এলো এলো' এই সব বিষয় নিয়েই সর্বক্ষণ মশগুল। আমার মনে আছে মার্কসিস্ট নানান বই ছাড়া এভরিম্যান এডিশানে কার্ল মার্কস-এর ক্যাপিটালও আমি পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। তবে মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একজন সুন্দরী যুবতীর ঝাঁকি দর্শনে যে আমরা কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম না বা কিছুটা 'অবসন্ন' বোধ করতাম না বললে ভুল হবে। তবে সেটা নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার ছিল। আমি বরঞ্চ কোনও স্বাস্থ্যবতী গুরুনিতম্বিনীকে দেখলে বাহাদুরি করে টুর্গেনিভের 'ফাদারস অ্যান্ড সনস্'-এর বাজারভের অ্যানার প্রেমে পড়ার আগে তার মেয়েদের সম্বন্ধে উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলতাম: 'হোয়াট এ স্পেসিমেন ফর দি অ্যানাটমি টেবল'। তখন কি ছাই বুঝেছি যে এদমন্দ না জ্যুলিয়ে, গোঁকুর-এর মতন তাঁর প্যারিসের বাড়ির দোরগোড়ায় একটা বই পড়তে পড়তে চোখ তুলে একজন চলমান ফরাসি রমণীকে দেখে তিনি বলেছিলেন একদিন আমাকেও তাই বলতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে, 'আমার পঞ্চাশ বছর লেগে গেল বুঝতে যে একজন রূপবতী নারী একটা ভাল বইয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সুন্দর।'

আমি এখানে বলে রাখতে চাই যে আমার এই লেখাটা ইচ্ছে করেই যাকে বলে এলোধাবাড়ি করে লিখছি এর বিষয়বস্তু খাঁটি আড্ডার মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। খাঁটি আড্ডা কখনও পাঁচ-দশ জনের বেশি লোক হলে জমে না। খাঁটি আড্ডার কোনও ব্যবসায় দপ্তর, রাজনীতিক বা পণ্ডিতি আলোচনার মিটিং-এর মতন যাকে বলে বাঁধা-ধরা এজেন্ডা থাকে না। একটা আড্ডা একদিন কী করে শুরু হবে, কী কী নিয়ে তর্কাতর্কি আর লড়াই হবে, জল কোথা থেকে কোথায় গড়াবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। ধরা যাক এক মুহূর্তে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে কোনও সুপারনোভার কথা হচ্ছে, আবার পর মুহূর্তেই হয়তো আলোচনা প্লেখানোভের 'দি রোল অফ ইনডিভিডুয়াল ইন হিস্ট্রি'র কথায় নেবে আসছে। তা ছাড়া অবশ্যই হাসি ঠাট্টা আর বেশ কিছুটা রসালো পরনিন্দা আর পরচর্চা আড্ডার প্রাণ। তাই আমি যদি এই লেখায় লজিকের নিয়মভঙ্গ করে আসল ব্যাপার ছেড়ে একটু ঘোরাফেরা করে মূল বক্তব্যে ফিরি তা হলে আশা করি যে প্রলাপ বকার অপরাধে দায়রা সোপর্দ হব না।

এইবার আমার প্রথম কফি হাউস দর্শনের কথায় আসি। সময়টা ১৯৪১-৪২

হবে, আমার অত খুঁটিনাটি মনে নেই। তখন পূর্ব রণাঙ্গনে মিত্র শক্তিদের (অ্যালায়েড পাওয়ার্স) প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতা। সারা কলকাতা ইংরেজ আর মার্কিন ফৌজে ভরে গেছে। বড় বড় মিলিটারি ট্রাক সারা শহর কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর কত লোক যে সেই চলমান দৈত্যগুলোর চাকার তলায় প্রাণ দিচ্ছে তার ইয়ত্তা ছিল না। তা ছাড়া প্রায়ই ব্ল্যাক-আউট আর সর্বত্র ব্যাফল ওয়াল আর ট্রেঞ্চ। তখন আমি চৌরঙ্গি পাড়ায় বিশেষ করে সন্ধের দিকে বড় একটা যেতাম-আসতাম না। তাই ওই এলাকার হাল-চাল আর চেহারা কী ভাবে বদলাচ্ছে, কী নতুন নতুন ব্যাপার-ট্যাপার ঘটছে না ঘটছে তার অতশত খবর রাখতাম না। ১৯৪১-৪২ সালে একদিন সন্ধেবেলায় আমার আবাল্য-সুহৃদ দাঁতের ডাক্তার গোপাল ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে তার মামা তখনকার সুবিখ্যাত দাঁতের ডাক্তার বঙ্কিম মুখার্জির তিন নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রিটের ক্লিনিকে যাই। সূর্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগরে-লালিত নব্য যুবক গোপাল তখন যাকে বলে পোশাকে-আশাকে, মেজাজে আর হাবভাবে দরকার মতো কখনও একেবারে পাক্কা সাহেব আবার কখনও কলকাতার খাঁটি ফুলবাবু। আমি সেদিন যখন গেছি তখন গোপাল কাজ সেরে চান করে ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরোবার জন্যে 'রেডি'। আমায় দেখে বলল: 'চ, তোকে একটা নতুন জায়গা দেখিয়ে আনি।' নতুন জায়গাটা কী জিজ্ঞেস করতে বললে: 'উহু বাবা ও ব্যাপারে এখন আমি স্পিকটি নট। তবে কাছেই, চ না, এক্ষুনি তো দেখতে পাবি।' এই বলে গোপাল আমাকে নিয়ে ওয়াটারলু স্ট্রিটের এখন যেখানে 'অ্যাম্বার' তখনকার দিনে সেখানের মানুয়ারি জাহাজ আর বিলিতি রাঙামুখো গোরাদের সুবিখ্যাত হই-হল্লোড়ের ঘাঁটি সেন্ট্রাল হোটেল পেরিয়ে বেন্টিংক স্ট্রিট ছাড়িয়ে মেরেডিথ স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের সদ্য-খোলা ইন্ডিয়া কফি হাউসে নিয়ে হাজির করলে। এখনকার যুবক-যুবতী কেন, ছেলে-মেয়েদের কোনও কিছুই দেখে বিশেষ অবাক হতে দেখেছি বলে মনে হয় না। আমি কিন্তু সেই 'বুড়ো' বয়সেও কফি হাউসের বিরাট বহর, ঝকঝকে-তকতকে চেহারা, পালিশ করা চেয়ার-টেবিল, টুপি আর উর্দি-পরা তকমা-আঁটা বয়, টেবিলে টেবিলে সুসজ্জিত খদ্দের দেখে বেশ হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। এখন লোকেদের আমার কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও একেবারে খাঁটি সত্যি। কারণ দু-একবার জীবনপণ করে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের একতলার লাউঞ্জে ছ-আনা দিয়ে লেমনেড খেতে গেলেও আমাদের দৌড় তো ছোট্ট ছাতা-পড়া সাঙ্গুভ্যালির মতন চায়ের দোকান অব্দি ছিল। আমার মরণ, আমার কোনও দিন 'ডাইরি' রাখার অভ্যেস ছিল না। থাকলে অনুমানের ওপর নির্ভর না করে আমার আড্ডার জীবনের একটা মোড় ঘোরার মাহেন্দ্রক্ষণের দিনক্ষণ দিতে পারতাম। তবে এটা ঠিক যে সে সন্ধেটা

ছিল ইন্ডিয়ান কফি বোর্ডের কফি নিয়ে কলকাতা আক্রমণের দু-চার দিনের মধ্যেই। এই অনুমানের আর একটা কারণ হল যে আমি বলার আগে আমার সাঙ্গুভ্যালির আড্ডাধারীদের মধ্যে যত দূর মনে আছে, কেউই তখনও এ কলকাতার এই খাঁটি কফি হাউস খোলার খবরটা পাননি। এর কিছু দিন পরেই কলেজ স্ট্রিটের পুরনো অ্যালবার্ট হলের কফি হাউস খোলা হল।

কলকাতায় ইন্ডিয়ান কফি এক্সপানশান বোর্ডের আওতায় এই দুটি কফি হাউস খোলার আগেই অবশ্য আমি আর আমাদের দু-চারজন আড্ডার বন্ধুর কফির নেশা শুরু হয়ে যায় আর এক ধরনের কফির দোকানে। সেগুলো বালিগঞ্জের দক্ষিণ ভারতীয় ছোট ছোট হোটেলের রেস্টুরেন্টে বা দক্ষিণ ভারতীয় কফি আর খাবারের দোকানে। আমার যত দূর মনে হয় রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর তার কাছাকাছি রসা রোড অঞ্চলে বালিগঞ্জবাসী হাজার হাজার দক্ষিণীদের জন্যে এই ধরনের হোটেল আর রেস্টুরেন্ট তিরিশের কোঠার গোড়ার দিক থেকে গজিয়ে ওঠে। অবশ্য সেই সময় থেকেই ডালহৌসির আপিস-পাড়ায়ও দক্ষিণী কফি আর খাবারের দোকানও শুরু হয়ে যায় বলে শুনেছি।

আমাদের এই ধরনের যে দোকানে আড্ডার জন্যে যাতায়াত শুরু হয় সেটা ছিল ন্যাশানাল লজ। এই লজ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর রসা রোডের কোণে কেওড়াতলা যেতে ডান দিকে প্রথমেই পড়ত আর তার ঢোকবার দরজা ছিল কেওড়াতলার রাস্তা দিয়েই। যাঁর দৌলতে আমরা এর একতলার আধা-অন্ধকার নিরিবিলি ঘরে রবিবারের একেবারে ভোরে মিছরির সঙ্গে ননী আর কফি আর বিকেলের দিকে প্রায়ই পেতলের বাটিতে বসানো পেতলের গেলাসে কফি খেতে যেতাম তাঁর নাম ছিল অমিতাভ সেন। তাঁর চেহারাটা ছিল মাঝারি উঁচু, একটু মোটার দিকে, রং কালো আর মাথার চুল চার-জিরো ক্লিপ দিয়ে কদমফুলি ধরনে ছাঁটা। পরনে সাধারণত থাকত খাটো ধুতি, মাঝে মাঝে ঢোলা প্যান্ট আর হাফহাতা শার্ট। অমিতাভবাবু আমাদের চেয়ে হয়তো বছর দশেকের বড় ছিলেন। তাঁর মতন ক্ষুরধার বুদ্ধি, কট্টর যুক্তিবাদী আর সব দিক দিয়েই অদ্ভুত প্রকৃতির বাঙালি আমি জীবনে দেখিনি। তাঁর সম্বন্ধে আমি ১৩৯১ সনের 'বর্তমান দিনকাল' বলে পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় একটু বড় করে লিখেছিলাম। এখানে শুধু বলব যে অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প সব কিছুর সম্বন্ধে তাঁর দখল দেখে আমাদের তাক লেগে যেত। দুনিয়ার কোথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী ঘটছে না ঘটছে তা ভাল ভাল বই আর বিদেশি পত্রিকা মারফত ছিল তাঁর নখদর্পণে। আজকালকার সর্বব্যাপী বলপেন তাঁর কাছেই প্রথম দেখি। সেটা ছিল রেনলড্স নামে বোধ হয় পৃথিবীর

প্রথম বলপেন। আমরা তো সে কলম দেখে অবাক। সবাই এক এক বার করে নিয়ে লিখছি। যেমন ইচ্ছে লেখো। অমিতাভবাবুর মুখে তাঁর বিখ্যাত মৃদু মৃদু হাসি। আমাদের কাণ্ড দেখে শুধু একটি মন্তব্য করলেন: 'ম্যানকাইন্ড অ্যাট লাস্ট হ্যাজ বিন ফ্রিড ফ্রম দি টিরানি অফ দি পেন-অ্যাঙ্গল'।

অমিতাভ সেন ছিলেন খাঁটি খাদ্য-রসিক। তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে আমরা শুধু চীনে খাবারের শাস্ত্রই নয় সেই মান্ধাতার আমলে ১৯৪০-৪১ সালে ফিয়ারস্ লেন দিয়ে পুরনো চীনে পাড়ার বাঁকা-চোরা নানান অলিগলির অগুনতি ছোট্ট ছোট্ট দোকানে 'স্বর্গীয়' চীনে খাবার খেয়ে বেড়াতাম। আমি 'স্বর্গীয়' খাবার বলছি কারণ তখন বেশির ভাগ বাঙালিরই ধারণা ছিল যে 'চীনেম্যানরা' তেলাপোকা আর ইঁদুর খায় আর এখনকার বাঙালি পাড়ার চীনে রেস্টুরেন্টগুলোর মতন তাদের খাবারগুলোকে দোঁ-আঁশলা চীনে-ভারতীয় করবার কোনও প্রশ্নই উঠত না। এই সময়ের কয়েক বছর আগে তৎকালীন দুঁদে আর ডাকসাইটে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট সেই রহস্যময় চাইনা-টাউনের আফিং-চণ্ডু-মাজঙ্গ জুয়ো খেলার ডেরাওয়ালা ও গুণ্ডাদের বেশ খানিকটা শায়েস্তা করলেও জানি না ক'জন বাঙালির তখন সেই 'বৃষ্টি পড়ে ছাতাওয়ালা গলির ভিতরে' ঢোকবার দুঃসাহস বা হিম্মত ছিল। কিন্তু অমিতাভ সেন সুখাদ্যের জন্যে উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে যেতে, এমনকী মরতেও রাজি ছিলেন।

অমিতাভবাবু মদ ছুঁতেন না। কিন্তু আড্ডা দিতে দিতে গেলাসের পর গেলাস কফি খেতে এতটুকুও এলিয়ে পড়তেন না। আর তাঁর ঝোলাতে দু-চারটে ছাড়া তাঁর মুখে থাকত সর্বক্ষণ তাঁর আশি-নব্বুইটার একটা পাইপ যা সেরা আমদানি করা তামাক বা দু-তিন রকমের তামাকের 'স্যান্ড-উইচ' করে ভরে খেতেন। তিনি কী রকম পাইপ-রসিক ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিই। আমরা তাঁর এক সময়ের ডেরা রাজা বসন্ত রায় রোডের মেসের ঘরে গিয়ে দেওয়ালে ছোট ছোট চৌখুপ্পি করা একটা বিশাল কাগজ সাঁটা দেখতাম। কাছে গেলে দেখতে পাওয়া যেত যে তাতে কলম করে তাঁর পাইপের নাম আর নম্বর লেখা থাকত। আর প্রত্যেকটি পাইপের পাশের চৌকোনো ঘরে কোন পাইপ কী তামাক বা কোন কোন তামাকের 'ককটেল' করে খেলে সবচেয়ে 'মিষ্টি' লাগে তা লেখা থাকত। তাঁর এই তামাকের টেবিলটি তাঁর বহু এক্সপেরিমেন্ট আর ট্রায়াল অর্থাৎ এক কথায় গবেষণার ফল বলে তিনি খুব গর্ব করে বলতেন। তিনি যখন কফির পাত্র সামনে নিয়ে একা একা প্রায় শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন অত্যন্ত মৃদুভাবে পাইপ টানতেন, তখন আমরা হঠাৎ গিয়ে পড়ে দেখতাম তাঁর চোখ আধবোজা আর মুখে তাওইস্ট সন্তের চরম প্রশান্তি।

আমি তাঁর পাইপ খাওয়া নিয়ে এত কথা বললাম তার কারণ তাঁকে দেখেই আমরা শুধু ডানহিল, পিটারসন, ডাবলিনার নানা ধরনের ফরাসি পাইপ, মিয়ারসম ইত্যাদি জাত পাইপ আর নানান ধরনের ভাল ভাল তামাক খেতেই শিখিনি, তার সঙ্গে সঙ্গে আলফ্রেড ডানহিলের বিখ্যাত 'দি বুক অফ পাইপ্‌স', জর্জ আরমের 'দি পাইপ' জাতীয় বই খুঁজে পেতে কিনে পাইপ খাওয়ার ইতিহাস, পাইপ সম্বন্ধে নানান গল্প আর মহামানবদের উক্তি ইত্যাদি পড়ে পাইপ টানার আনন্দকে আরও সূক্ষ্ম করে তুলতাম। যেমন একজন পুরনো ফরাসি কবি বলেছিলেন: 'আই স্মোক এ পাইপ অ্যাজ ব্রাউন অ্যাজ দি ব্রেস্ট্ অফ এ লিট্‌ল নিগ্রেস।' এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সত্যজিৎ রায়ও যে দু-চার বছর পাইপ উপভোগ করে খেতেন তাতে আমার একটু হাত ছিল। তা ছাড়া তিনি উপরোক্ত এবং আরও দু-চারটে বইও খুব মজা করে পড়েছিলেন। অমিতাভ সেন সম্বন্ধে আমার ধারণা ও তাঁর বহু ব্যঙ্গ রস— এখানে যা আমি দিতেই পারলাম না অর্থাৎ বহু কাণ্ড-কারখানার গল্প তা, বলতে পারেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের বর্তমান কর্তা পরম স্নেহভাজন দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিতাভ সেনের অদ্ভুত রসজ্ঞান আর পরিহাস-প্রিয়তার যে বুদ্ধি-দীপ্ত চেকনাই আমরা কফির আড্ডায় দেখেছি তা বলতে গেলে 'অমিতাভ কথামৃত' গোছের একটা বই লিখতে হবে।

আমার একজন দক্ষিণী বন্ধু, অমিতাভ সেনকে ন্যাশানাল লজে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে বসে পাইপ আর কফি খেতে আর আড্ডা দিতে দেখে এবং দু-এক বার তাঁর বেখাপ্পা কথা শুনে আমাকে একবার পাশে ডেকে কানে কানে ষড়যন্ত্র করার মতো বলেছিলেন যে তুমি কী করে ওর সঙ্গে মেশো। কারণ তাঁর কথায় 'হি ইজ এ্য সিনিক ম্যান'। সেই ভদ্রলোক 'সিনিক' কথাটা এমন ভাবে বলেছিলেন যে আমার মনে হয়েছিল যে সিনিক হওয়া নারী-ধর্ষক বা খুনি হওয়ার চেয়ে ঢের ঢের খারাপ।

অমিতাভ সেনের কথা আপাতত এই বলে শেষ করি যে ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'র প্রথম দিকের কোনও এক সংখ্যায় 'ডাইনামিক' কবিতা ছাপিয়ে তাঁকে খানিকটা বিপাকে ফেলেছিলেন। কারণ সেই 'ডাইনামিক' কবিতাগুলো ছিল এধার-ওধার থেকে জড়ো করা এক এক লাইনের অসংলগ্ন সমষ্টি। তবে অমিতাভ সেন কবিতা লিখতেন না, মাঝে মাঝে দু-এক লাইনের হাফ-হাইকুর মতন 'কবিতা' বলতেন। যেমন ধরুন গরম কালে সন্ধেবেলায় ঝিরঝিরে ঠান্ডা দখনে হাওয়ায় আরাম পেলে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মিশিমাখা শিখীপাখার মতন সরু সরু তানে তানে আপন মনে ফিস ফিস করে বলতেন:

'স্নিগ্ধ সন্ধ্যা যেন এক মৃদু বিরেচক'।

স্ট্যালিন মারা যাবার পর তাঁর 'পতন' ঘটলে তিনি বলেন:

স্ট্যালিনকে মা বলিয়া ডেকে ছিল যারা।
সে সব হতভাগ্য অট্টালিকা আজ হল গৃহহারা।।

হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে দু-চার লাইনের তাঁর একটা পদ্যর দু-লাইন মনে আছে:

এই সব হ্যান্ড গ্রেনেডগণ,
আসলে তো যুবতীর স্তন।

আর একবার কী এক প্রসঙ্গে গানের মতন করে বলেছিলেন:

ওরে মোর প্রাণের কানাই ধানাই পানাই করিস নারে,
ল্যাক্‌টোমিটার ভেঙে আর ফেলিস না রে।।

আর মনে পড়ছে অ্যাটম বোমা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি:

একটা সাদা শব্দ, সবাই জব্দ।

আমার বড় দুঃখ দু-চারজন ছাড়া সত্যেন বোস মশাইয়ের বড় পেয়ারের ছাত্র, লেখাপড়ায় রত্ন, হুইমসিক্যাল রসিকতায় অদ্বিতীয়, আমাদের যৌবনের 'গুরুদেব' বাঙালিরা কেউই বলতে গেলে অমিতাভ সেনের নামও শোনেননি। তবে যে কয়েকজন তাঁর সঙ্গ পেয়েছিলেন তাঁদের মতন তাঁর স্মৃতি, তাঁর সঙ্গে আড্ডার মজা আমার জীবনের একটা সেরা সম্পদ হয়ে রয়েছে। আমার ইচ্ছে আছে এই টিউশানি করে খাওয়া নিষ্কর্মার ধাড়ি লোকটির সম্বন্ধে তিলকাঞ্চনী গোছের স্মৃতিকথা লিখব যার খানিকটা 'বর্তমান দিনকাল'-এ শুরু করেছিলাম।

এবার ইন্ডিয়ান কফি হাউসের আড্ডার কথায় আসা যাক। ডাক্তার গোপাল ব্যানার্জি সেই যে কফি হাউসের সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বছরের আড্ডার গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে চলে গেল তারপর সে কোনও দিন আর সেখানে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসেনি। যত দূর মনে পড়ছে ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে আমাদের আড্ডা সন্ধেবেলায় কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে বসা শুরু হল। তবে আমরা কফি হাউসের প্রেমে মজে ন্যাশানাল লজ বা সাঙ্গুভ্যালিকে ভুলিনি। ছুটির দিন আর রবিবার ভোর সকালে ন্যাশানাল লজ আর সন্ধেয় সাঙ্গুভ্যালিতে জমায়েত হতাম। আর কিছু দিন পরে সাঙ্গুভ্যালির পর বসুশ্রী সিনেমার দোতলায়। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আড্ডার নাটের গুরু ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। আমি ১৩৯১ সনের 'শব্দপত্র' বলে পত্রিকার কমলকুমার সংখ্যায় লিখেছিলাম যে কমলবাবুকে ১৯৩৯-৪০ সালে প্রথম দেখি তাঁদের বালিগঞ্জের তেকোনা পার্কের উল্টো দিকের তাঁর তখনকার বাসস্থান সিডলি হাউসের ফটকের কাছে। কিন্তু তিনি কখনও আমাদের সাঙ্গুভ্যালির আড্ডায়

আসেননি। কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের আড্ডাতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ জমতে বুঝলাম উনি কী চিজ। সে সময়ের কমলবাবু পোশাকে-আশাকে ছিলেক একেবারে ফরাসি ধাঁচের জাত সাহেব। পরনে থাকত হারমান বা র‍্যাংকিনের বাড়ির দামি স্যুট, প্যারিসের বিখ্যাত সুলকার শার্ট, টাই, সিল্কের গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার আর রুমাল। পায়ে মিডলটন রোয়ের একটা ভীষণ এক্সক্লুসিভ ছোট্ট চীনে দোকানের জুতো। কমলবাবু সে দোকানে অর্ডার দিয়ে জুতো করাতেন। শুনেছি সেই দোকানে তাঁর পায়ের ছাঁচ নিয়ে তৈরি কাঠের লাস ছিল, দরকার মতো অর্ডার দিয়ে জুতো বানাতেন। কমলবাবু তখন কী সব কেমিক্যালের ব্যবসা করতেন বলতেন।

বসওয়েলের জনসনের জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে গোল্ডস্মিথ একবার বলেছিলেন যে তাঁদের আড্ডায় যতক্ষণ না ড. জনসন আসতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তা ডেমোক্র্যাটিক থাকত। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পরই আড্ডা তাঁর দাপটে 'অটোক্র্যাটিক' হয়ে উঠত। ততটা না হলেও কমলবাবু তাঁর সেই যুবা বয়সের ঝোড়ো কথাবার্তা আর হো হো হাসি দিয়ে আমাদের বেশ দাবড়ে রাখতেন। আমাদের সে সময়ে গাঁয়ের জীবন তো দূরের কথা, কলকাতার গেরস্থালি সম্বন্ধে বিশেষ হুঁশ ছিল না। আমরা জয়েস-উল্‌ফ-হাকস্‌লি-এলিয়ট-পাউন্ড-ফক্‌নার ইত্যাদি নিয়ে মজে আছি। অনুবাদে মালরো, কিছু কিছু রুশ, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান ভাষায় লেখাও পড়তাম। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম, টেকচাঁদ, হুতোম, দাশরথি রায়, হেমচন্দ্র এমনকী রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চাটুজ্যে ইত্যাদি মহাপুরুষদের লেখাও অনেকেই মন দিয়ে পড়িনি। কমলবাবু, আমরা বিদেশি সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত আর মার্কসিজম্ নিয়ে তর্কাতর্কি করলে খানিকটা ফরাসি খাদ দেওয়া খাঁটি বাঙালি ভাব নিতেন। আমি এই প্রসঙ্গে 'শব্দপত্র'তে লিখি: 'তাই আমরা যখন বিদেশি আর্টের কথা বলতাম উনি তখন ইতিন্দাঘাটের হাঁড়ি বা জালার ভলাপচুয়াস রোতাঁদিতের কথা একটু ফরাসি মোচড় দিয়ে উচ্চারণ করে বলতেন। বিলিতি গান-বাজনার কথা হলে ফরাসি ত্রুবাদুর, ফৈয়াজ খাঁর দরবারি বা কেঁদুলি বা ঘোষপাড়ার আউল-বাউল কর্তাভজাদের কথা বলতেন যখন তারা আজকের ভোটের মতো তখন পপুলার হননি। খাবারদাবারের কথা হলে সুক্তো আর কাঁটা চচ্চড়ি থেকে রেজালা রাঁধবার কথা বলতেন ইত্যাদি।' আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের যৌবনে আমাদের দোষেই চোখ-ফোটানোর জন্যে কোনও গুরু পাইনি। আমার বলতে এতটুকুও বাধে না যে কমলবাবুর সেই আড্ডার থেকে শুরু করে তাঁর আজীবন সান্নিধ্যে আসার ফলে আমাদের ঘোর পশ্চিমি ভাবের সঙ্গে কিছু কিছু দিশি জিনিস খানিকটা জানবার শেখবার প্রেরণা পেয়েছি।

এরপর চৌরঙ্গির কফি হাউসের আড্ডার কথায় আসার আগে বলি, কমলবাবু হঠাৎ দেখি একদিন বিলিতি পোশাক-আশাক ছেড়ে ধুতি আর পট্টিদার পাঞ্জাবি ধরেছেন। হঠাৎ কেন এই 'নব কলেবর' কথাটা জিজ্ঞেস করতে তিনি একটা গল্প বললেন। কমলবাবু একদিন চৌরঙ্গি 'পাড়ায় ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় একজন মুটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে 'বাবু, কেতনা বাজা হ্যায়?' এই 'বাবু' ডাকটা শুনে তাঁর মোহভঙ্গ হল। বললেন: 'জানো তখন আমার পরনে বিলিতি কাপড়ের স্যুট, হাতে অ্যাদমার-পিউজের ঘড়ি, আঙুলে বার্মা রুবির আংটি অর্থাৎ স্যুট-বুট-গয়না-গাঁটি নিয়ে আমার পরনে বেশ কয়েক হাজার টাকার জিনিস। অথচ সেই হিন্দুস্থানি আমায় সাহেব না বলে 'বাবু' বলে ডাকলে গো!'

এই সব ঘটনার কিছু পরে চল্লিশ দশকের ১৯৪৫-৪৬ সালে আমাদের আসল আড্ডা চৌরঙ্গির কফি হাউসের ছোট ঘরে উঠে এল। এখানে দুপুরবেলায় নিয়মিত যারা লাঞ্চের সময় আড্ডা দিতে আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ নিয়োগী, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, হরিসাধন দাসগুপ্ত, কালীসাধন দাসগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সত্যেন মৈত্র, সুভাষ ঘোষাল, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরলোকগত রণেন রায়, জেড এইচ (বান্টি) খান, গোপাল সান্যাল, আনন্দ দে আর প্রতাপ রায়। এ ছাড়া আমাদের সাঙ্গুভ্যালির রবি সেন, ভূপাল সেন। তা ছাড়া অনেক জ্ঞানীগুণীও মাঝে মাঝেই আসতেন যেমন প্রদোষ দাশগুপ্ত, পরিতোষ সেন, গোপাল ঘোষ, সুভো ঠাকুর প্রমুখ।

তখনকার চৌরঙ্গি কফি হাউসের ছোট ঘর নানান ধরনের, নানান চরিত্রের, নানান পেশার, লোকজনের লাঞ্চের সময় নিয়মিত উপস্থিতিতে গমগম করত। যেমন একটা টেবিল ছিল বাংলা সরকারের মাথাওয়ালা লোকেদের আড্ডা। সেই টেবিলে নিয়মিত থাকতেন তখনকার আই. সি. এস.-দের মধ্যে চিফ সেক্রেটারি এস এন (সত্যেন) রায়, কে হাজরা এবং এ ডি খান আর তাঁদের কিছু বন্ধু-বান্ধব। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে রগুড়ে ছিলেন স্টেটসম্যান (অর্থাৎ লন্ডন টাইমসের) ক্রশওয়ার্ড-পাগল সত্যেন রায়। সেই ক্রশওয়ার্ডের সূত্রেই আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় যদিও আমাদের মধ্যে সবচেয়ে চটপট ক্রশওয়ার্ড শেষ করতে পারতেন সত্যজিৎ রায়। সত্যেন রায় মশাই কত রকমের যে মজার মজার কথা বলতেন আর কাণ্ড করতেন তার ঠিক নেই। আমি তাঁর একটা কাণ্ডের কথা বলি।

ওপরে আমাদের দলের মধ্যে যাদের নাম করলাম তাঁদের মধ্যে আমি আর আমার অভিন্নহৃদয় সদাহাস্যময় রণেন রায় তখন প্রায় পুরোপুরি বেকার ছিলাম। কাজের মধ্যে দু-তিন জন মেয়ে পড়িয়ে যৎসামান্য রোজগার করতাম। তার থেকে

হাত-খরচের জন্যে আর কতটুকু থাকত। সেই সময়ে রণেন আর আমি প্রায়ই লাঞ্চের খানিকটা আগে থেকেই কফি হাউসের ছোট ঘরের বাইরের চাতালে বসে থাকতাম। পকেটে দুজনেরই বলতে গেলে কানাকড়িটিও নেই। অতএব ভেতরে ঢুকব কী করে। আমাদের বাইরে বসার মধ্যে একটা প্যাঁচ ছিল। কারণ দশ-বিশ মিনিট বসবার পর কেউ না কেউ জানাশোনা লোক এসে পড়ে বলতেন: 'আরে মশাই বাইরে কেন ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন'। তারপর কী খাবেন বলে কফি-টফি খাওয়াতেন।

এর মধ্যে একদিন দেখি রণেন রায় সত্যেন রায় মশাইয়ের সঙ্গে বসে কোল্ডক্রিম কফি, কেক, মামলেট ইত্যাদি গোগ্রাসে গিলছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি যে রণেন এ সব রাজভোগ জোটালে কী করে। তারপর রণেন রায় আমাকে সেই ভূরিভোজনের রহস্যটা বললে। সত্যেন রায়দের একজন পুরনো বন্ধু আর তাঁদের আড্ডার নিয়মিত লোক সুকুমার সেন (আই. সি. এস. নয়) হঠাৎ মারা যান। তখন কে একজন সুকুমার সেনের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে সত্যেন রায়দের টেবিলে বসতে শুরু করলে সত্যেন রায় মশাই বা তাঁর দলে এমন কেউ ছিলেন না যিনি সেই বাবুটির মুখের ওপর বলতে পারতেন যে আপনি মশাই এ টেবিলে বসবেন না। বলাবাহুল্য লোকটির উপস্থিতি তাঁদের কথাবার্তায় বড় অসুবিধে করত।

তখন সত্যেন রায় মাথা খাটালেন। তিনি লক্ষ করলেন যে লোকটার পায়ে প্রচণ্ড কড়া। অমনি একদিন প্রায় ষোলো-টন ওজনের রণেনকে ডেকে বললেন: দেখ রণেন, কাল যখন লোকটা আসবে তুমি ওর পাশে বসে সজোরে ওর কড়া মাড়িয়ে দেবে। আমার ঘোর বিশ্বাস যে তুমি একবার ওর কড়া মাড়ালে ও আর এ জীবনে কফি হাউস-মুখো হবে না। তবে আমি তিন দিন দেখব। তারপরও যদি না আসে তা হলে তুমি যা চাইবে তাই খাওয়াব। অবাক কাণ্ড। মতলব নিখুঁত ভাবে খেটে গেল। ফলে শ্রীমান রণেনের অন্তত একদিনের জন্যে আবু হোসেনের মতো ভাগ্য খুলে গেল। এই সত্যেন রায়ই একদিন চার্চিল যাঁকে পার্লামেন্টে বেশ সমীহ করতেন, সেই বিখ্যাত বলিয়ে-কইয়ে লেবার পার্টির একজন মাথা অ্যানিউরিন (নাই) বেভানকে বিকেলবেলায় আমাদের টেবিলে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আড্ডা দিতে নিয়ে এসেছিলেন। বেভান সাহেব আমাদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলে খুব আহ্লাদ করেন।

১৯৪৫-৪৬ থেকে ১৯৫৫-৫৬ অব্দি কফি হাউসের ছোট ঘরে কয়েকটা টেবিল জুড়ে একটা বেশ বড়সড় জায়গা আমাদের জন্যে অলিখিত ভাবে রিজার্ভড ছিল। সেখানে রোজ একটা থেকে শুরু করে আমরা আড়াইটে অব্দি জমায়েত হতাম। সেই আড্ডার কথা বলার আগে জানাই যে আমার তখন কফি হাউসেরই পাশে

একটা ছোট বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে একটা চাকরি জুটে গেছে। রণেনও তখন কিছু কিছু ঠিকে কাজ ধরেছে। যেমন মাস কয়েকের জন্যে সিটি কলেজে ইংরেজি লেকচারারের পাকা লোকের বদলে চাকরি, তারপর লালবাজার এলাকায় একটা আপিসে কাজ। আমাদেরও চাকরি হল দেখে কমলবাবু আমাদের একদিন বললেন 'হ্যাঁ হে, তালতলার অমুকের একটা ছিল্লে করতে পারো? দু-দুটো মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, অথচ বেচারার একটা কিছু হল না।' কমলবাবুর 'তালতলার অমুকের' শেষ পর্যন্ত কিছু হয়েছিল বলে তো আমার মনে হয় না।

বছর দেড়-দুয়েক আগে অ্যানড্রু রবিনসন বলে একজন ইংরেজ যুবক আমার সঙ্গে দু-একবার দেখা করতে আসেন। অনেকেই জানেন ভারত সংক্রান্ত আরও নানান কাজের সঙ্গে তিনি এখন সত্যজিৎ রায়ের জীবনী লিখছেন। নানান কথা প্রসঙ্গে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন যে আমি কফি হাউসের আড্ডার বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার আর বংশী চন্দ্রগুপ্তর মধ্যে যে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হত তার সম্বন্ধে কোনও নোট-টোট রাখতাম কী? বলার দরকার নেই যে তা রাখতাম না। কিন্তু কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। সেই টেবিলে যে দুনিয়ার কত জিনিস নিয়ে কত রকমের আলোচনা হত তার কোনও ইয়ত্তা ছিল না। যেমন একটু বলি। হলিউড আর বিলিতি ফিল্ম ছাড়া ইওরোপীয় চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের আড্ডায় যে সব কথাবার্তা সে সময় হত তখন ভারতের অন্য জায়গার বিদগ্ধ বাবুরা তা নিয়ে ভাবতেই শুরু করেননি। আমি বিশেষ করে ফিল্মের কথা তুললাম তার কারণ 'পথের পাঁচালি'র শ্যুটিং শুরু করার আগে সত্যজিৎ রায় তৎকালীন এ দেশের একজন সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনের কমার্সিয়াল আর্টিস্ট আর বইয়ের ডিজাইনার হলেও বেশির ভাগ সময়ই ফিল্মের ধ্যানেই মগ্ন থাকতেন। তা ছাড়া ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতের প্রথম ফিল্ম সোসাইটি অর্থাৎ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির জুর আমাদের আড্ডার মধ্যেই উপ্ত ছিল। সে যুগে 'ব্যাট্‌লশিপ পোটেমকিন', 'ইভান দি টেরিবল', ফরাসি আর অন্যান্য ইওরোপীয় ক্লাসিক্স ছবি দেখার থ্রিল বর্ণনা করা শক্ত। আমি ফিল্ম সোসাইটির কথাটা বিশেষভাবে বলছি এই জন্যে যে আজ সারা ভারতের ছোট বড় নানান শহরে ফিল্ম সোসাইটি ডাল-ভাত হয়ে গেলেও তখন এ দেশে ব্যাপারটা যে কত বৈপ্লবিক ছিল তা এখনকার যুগের চলচ্চিত্র-উৎসাহী যুবক-যুবতীরা কল্পনাই করতে পারবেন না। তখন এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত আর পণ্ডিতরা ভিজ্যুয়াল আর পারফরমিং আর্টস নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা ফিল্মকেও বিচার করতেন সাহিত্যের মাপকাঠি দিয়ে। বাঙালিরা এখনও যে ফিল্মকে অনেকেই মুখের কথায় এমনকী কেউ কেউ লেখাতেও 'বই' বলে উল্লেখ করেন তার সঙ্গে সেই পুরনো মনোভাবের কী কোনও সম্পর্ক আছে?

যাক, এ সব তত্ত্বকথা ছেড়ে বলি কফি হাউসের এই আড্ডার এমন একটা মজা আর মাদকতা ছিল যে সেখানে একদিন না গেলে আমাদের মনে হত দিনটা বৃথায় গেল। আমি আগে এধারে-ওধারে এই আড্ডায় সত্যজিৎ রায় আর কমলবাবুর কথা ইংরেজি বাংলায় বেশ কয়েকবার লিখেছি। কমলবাবুর তখন লেখক হিসেবে নাম ছড়ায়নি। তবে মনে হচ্ছে যে তখন কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্র' কাগজে তাঁর প্রথম বিখ্যাত 'জল' বলে গল্প বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই গল্পের প্রথম লাইন ছিল: ফজল হয় অতি ভাল লোক। যেহেতু সে জগদীশ্বরে ভক্তি রাখে।' মন থেকে লিখলাম বলে বলতে পারছি না উদ্ধৃতিটা হয়তো একেবারে ঠিক হল না। তবে কথার বৈচিত্র্যে, কল্পনার ছোঁয়াচে আর সবচেয়ে বড় কথা সূক্ষ্ম রসে তাঁর তখন কেউ জুড়ি ছিল না।

আড্ডার অন্যান্যদের কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় যার এখানে জায়গা নেই। তবে একটা কথা বলা দরকার যে আমাদের দলের সকলেই ছিলেন রসিক আর রসবেত্তা। প্রায়ই কোনও কোনও লেখাতে পড়া যায় যে লেখক বলছেন যে 'অমুক বাবু যে কী মহারসিক ছিলেন তা বলা যায় না। তাঁর কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেট ফেটে যেত।' কিন্তু তারপর সেই লেখক কিন্তু সেই রসিক বাবুটির একটি রসিকতারও নমুনা দেন না। আমারও এখানে সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ধরুন কুমারপ্রসাদ মুখার্জি, সুভাষ ঘোষাল, রণেন রায়, কালীসাধন দাসগুপ্ত, আনন্দ দে যাকে আমরা আদর করে 'সাজা পাগলা' বলতাম, সত্যেন মৈত্র আর কমলবাবুর যোগ্য শাগরেদ গোপাল সান্যালের বোকার ভান করে অনর্গল রসিকতার কথা এখানে কী করে বোঝাব?

তবুও একজনকার কথা একটু বিস্তারিত ভাবে বলছি যাঁর রসিকতা ছিল তাঁর অবিশ্বাস্য পান্ বা অনুপ্রাস করার ক্ষমতায়। বিদগ্ধজনেরা অবশ্য পান্‌কে লোয়েস্ট ফর্ম অফ উইট বলে খারিজ করে দেন। ড. জনসন তো একবার বলেছিলেন যে-লোক পান করতে পারে সে পকেটও মারতে পারে। কিন্তু তিনিও তো সময়ে-সময়ে পান্ করতে ছাড়েননি। যেমন একটা মনে পড়ছে, গ্রিস (Greece)-এর সঙ্গে গ্রিজ (Grease)। এ ছাড়া ফিল্ম-রসিকরা জানেন যে গ্রাউচো মার্কস 'পান্'-কে কোন স্তরে তুলে দিয়েছিলেন।

আমি যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি তিনি হলেন জেড এইচ (বান্টি) খান। বান্টি খান ছিলেন ১৯৩০-এর দশকের ভারতের সবচেয়ে সেরা দৌড়বাজ যাঁর জন্যে তখনকার ভেরনিউ, বেলিটি আর সাট্‌নের মতন ভারত-বিখ্যাত কম পাল্লার রানাররা হেরে ভূত হয়ে যাওয়ার ভয়ে কাঁপত। রাজনীতিতে ট্রট্‌স্কিপন্থী বান্টির মতন অনুপ্রাস খুব

কম লোককে করতে দেখেছি, বোধহয় কালীসাধন দাশগুপ্ত ছাড়া। দু-একটা নমুনা: Lingua France of Red China বান্টির মতে হল Mouth Tse Tongue। রক্তগত শনি আর দৈন্যের দায়গ্রস্ত আমি আর রণেন একবার পয়সার জন্যে চিদানন্দ দাশগুপ্ত যে কোম্পানিতে তখন কাজ করতেন তার হয়ে ডিলিউক্স টেনার বলে একটা সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবিতে ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অ্যাকটিং করতে বাধ্য হই। ছবির ডিরেক্টর ছিলেন বোধ হয় হরিসাধন দাশগুপ্ত, আর কোনও না কোনও ভাবে সত্যজিৎ রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই ছবিটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমার আর রণেনের সিনটা ছিল 'ছবির মধ্যে ছবি'। অর্থাৎ ছবির নায়ক ডিলিউক্স টেনারে সুখটান দিতে দিতে বউকে নিয়ে সিনেমা হলের পর্দায় আমার সঙ্গে রণেনের বক্সিং দেখছেন। আমার ওজন তখন নব্বুই পাউন্ড আর রণেনের ষোলো স্টোন। কিন্তু আমার একটা আপার-কাট খেয়ে রণেন লাট্টুর মতন বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে কাটা কলাগাছের মতো 'পপাত ধরণীতলে'। বান্টি ছবিটা দেখেই বললে "Ranen was in his merry-go-round and the g(o) round was sorry when he hit it। সরি হবার কথাটা খুব আশ্চর্য নয়। ষোলো স্টোনের ধাক্কা সর্বংসহা মা ধরিত্রীর পক্ষেও সহ্য করা খুব কম কথা ছিল না। বান্টি কাজ না করলেও দুঃখী ছিল না। সে ছিল লক্ষ্ণৌ-এর এক রইস পরিবারের লোক। আজকের ভারতীয় বিজ্ঞাপনের জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি সুভাষ ঘোষাল তখন জে ওয়ালটার টমসন অ্যাডভারটাইজিং কোম্পানির উঠতি তারকা। সুভাষের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা গেল বান্টিকে বিজ্ঞাপনের কোম্পানিতে চাকরি দিলে ভাল কপি আর হেডলাইন লিখতে পারবে। সুভাষ তক্ষুনি আপিসের বড়কর্তা মোরহাউসের সঙ্গে বান্টির মোলাকাতের ব্যবস্থা করলেন। নানান কথাবার্তার পর সাহেব বান্টিকে জিজ্ঞেস করলেন: What was your last job?

বান্টি বলল: I joined a paper called Close-Up.

সাহেব: And what happened to it?

বান্টি: It promptly closed down.

সাহেব: Thank you. Come and join us from tomorrow.

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে বান্টি Close-Up-এ 'বসুমতী'-তে শিবরাম চক্রবর্তীর মতন একটা কলম লিখতেন। তাতে ওঁর ছদ্মনাম ছিল I. Pundit।

'দি রিভার' ছবির শ্যুটিংয়ের সময় আমাদের কফি হাউসের আড্ডায় জ্যাঁ রেনোয়া দু-একবার এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁর কথা স্বয়ং সত্যজিৎ রায় থেকে এত লোক এতবার লিখেছেন যে সে সম্বন্ধে এখানে আমার কিছু বলতে যাওয়া

অবান্তর হবে। তবে বেভান আর রেনোয়া ছাড়া আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে জন মরিসের কথা বলা দরকার। ছ' ফুট লম্বা, দু-ভাগ করা (forked) হলদে দাড়ি-ওয়ালা যুবক মরিস তখন লন্ডন টাইমস-এর করেসপন্ডেন্ট হয়ে জন হান্ট-এর মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানের কথা লিখতে এসেছিলেন। মরিসকে কলকাতা দেখাচ্ছিলেন এক ফিরিঙ্গি। এখানে তিন চার দিন এধার-ওধার ঘোরাফেরার পর একদিন হঠাৎ কে যেন তাঁকে কফি হাউসে আমাদের আড্ডায় নিয়ে আসে। আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, কথাবার্তা বলে তিনি খালি বলতে লাগলেন যে গত চার দিন তোমাদের সঙ্গে রোজ রোজ দেখা হলে কি ভালই না হত। অনেকেই জানেন যে এই ঘটনার বেশ কিছু বছর পর মরিস শুধুই জগদ্বিখ্যাত লেখকই হননি, তাঁর সঙ্গে অস্ত্রোপচার করে মেয়ে হয়ে জান মরিস নাম নিয়ে বই লেখেন। 'কনানড্রাম' বলে বইয়ে তিনি তাঁর এই যৌন পরিবর্তনের মর্মস্পর্শী কাহিনি লিখেছেন।

১৯৫১ সাল থেকে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি' তুলতে শুরু করলেও তাঁর কফি হাউসের আড্ডায় আসা ১৯৫৫ অব্দি একেবারে থেমে যায়নি। তবে ১৯৫৪ নাগাদ আড্ডায় ভাঙন ধরতে শুরু হয়। পৃথ্বীশ নিয়োগী এর আগেই চাকরি নিয়ে আমেরিকায় চলে যান। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় আর রণেন রায় দু'জনেই বিলেত চলে যান। কমলবাবু সাউথ পয়েন্ট ইস্কুলে চাকরি নিয়ে দুপুরের দিকে আর কফি হাউসে আসতে পারতেন না। বান্টি খান চাষবাস করতে কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোরের আশপাশে ডেরা গাড়েন। অন্যান্যরা এমনকী আমিও আফিসের কাজে জড়িয়ে পড়ে দুপুরের দিকে কফি হাউসে আসা বন্ধ করতে বাধ্য হই। কফি হাউসে 'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে'র মতন প্রবাহিণী হয়ে রইল। শুধু ভেঙে গেল— অহো। আমাদের বড় সাধের, অবর্ণনীয় আনন্দের সেই আড্ডার চাঁদের হাট।

শেষকালে আবার বলি যে খাঁটি বাঙালি আড্ডার যা যা গুণ তা আমাদের যৌবনের আড্ডাগুলোর মধ্যে সবই ছিল বললে ভুল হবে না। কিছু দিন আগে আমায় একটি চিঠিতে সুলেখিকা অধ্যাপিকা কল্যাণী দত্ত প্রসঙ্গত লেখেন যে 'আমাদের ঠাকুরমারা যেমন ষাট-সত্তর ভরির গয়না বারোমাস পরতেন আর তাই পরে হেসে খেলে, রান্না কুটনো কাটনা করে যেতেন।' তেমনই আমাদের আড্ডায় যুবাবস্থায় যারা জ্ঞান-বৃদ্ধ ছিলেন তাঁরা তাঁদের নানান বিষয়ে পাণ্ডিত্য, কৌতূহল আর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি রস-রসিকতার মধ্যে দিয়ে অতি সহজ সরল ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। শ্রীমতী দত্ত তাঁর সেই চিঠিতে আরও লেখেন মিছরির রুটির কথা। যা তাঁর ভাষায় 'আড় করে খাও আর সিধে করেই খাও ভাল তো লাগবেই।' কথাটা আমাদের আড্ডাগুলোর সম্বন্ধে পুরোপুরি খাটে।

আজ সেই বয়সে পৌঁছে গেছি যখন মাঝে-মাঝেই সিসেরোর 'অন ওল্ড এজ' গোছের লেখা উলটেপালটে দেখি। আজ যৌবনের অনেক কথাই ভুলে গেছি। কিন্তু সেই সব অদ্ভুত আড্ডাগুলোর কথা তাদের মাদকতা নিয়ে আমার জীবনের কিছু শ্রেষ্ঠ স্মৃতির মতন জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে। সেই সব কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় একটা শব্দ বদলিয়ে বলিঃ

যে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না।

হীরের নাকছাবি

সাগরময় ঘোষ

কালীঘাট ট্রাম ডিপোর উলটো দিকে ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে কয়েকজন নিয়মিত আড্ডা জমাতুম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণ কলকাতাবাসী, তাঁরাই ছিলেন সে-আড্ডার নিত্যসঙ্গী। বিমল মিত্র থাকতেন কেওড়াতলায় কাঠের পুল পার হয়েই চেতলায়, রমাপদ চৌধুরী তখন থাকতেন ট্রাম ডিপোর উলটো দিকে অমৃত ব্যানার্জি রোডে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় টালিগঞ্জের চারু অ্যাভিনিউ থেকে মাঝে-মধ্যে এসে উদয় হতেন চায়ের নেশায় নয়, স্রেফ আড্ডার নেশায়। আর আসতেন সদানন্দ রোডের সদানন্দময় মানুষ বিশুদা, ওরফে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর কথা আমি আমার 'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থে একাধিক কাহিনির নায়ক হিসেবে বারবার উল্লেখ করেছি। আমরা সবাই ছিলাম কিছু-কিঞ্চিৎ সাহিত্যের কারবারী। একমাত্র বিশুদাই ছিলেন ব্যতিক্রম। পেশায় ছিলেন ব্যাঙ্কের কেরানি কিন্তু সাহিত্যই ছিল তাঁর নেশা এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ছিল একটা প্রাণের যোগ। লেখকদের উৎসাহ দিতেন প্রচুর কিন্তু নিজে কিছুই লিখতেন না। সেই জন্যে আমরা ওঁকে বলতাম 'না-লিখে-সাহিত্যিক' কিন্তু আড্ডায় বিশুদাই ছিলেন মধ্যমণি।

যে যার কাজকর্ম সেরে ধড়াচুড়ো বদলে সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটায় চায়ের দোকানে এসে গোল শ্বেতপাথরের টেবিলটা অধিকার করে বসেই এক কাপ চা আর একটা মাংসের চপ বা কাটলেট অর্ডার দিয়ে দিতাম। প্রথম রাউন্ডে ওই অর্ডারের উপরই আমরা ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়ে দিতাম। ইতিমধ্যে চায়ের দোকানের সব টেবিল খদ্দেরের ভিড়ে ভর্তি, ছোট-ছোট পর্দা-ফেলা কেবিনগুলো তরুণ-তরুণী অথবা সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর অস্ফুট কলগুঞ্জনে মুখরিত। আমরা বসতাম বাইরে, রাস্তার দিকের দেওয়ালের আড়ালে রাখা গোল টেবিলটায়, যাকে ঘিরে পাঁচ-ছ'টি চেয়ার গা ঠেকিয়ে বসতে পারত। রাত সাড়ে আটটা ন'টা নাগাদ ভিড় একটু বেশি

হলে অনেকে দোকানে ঢুকে খালি টেবিল-চেয়ার না পেয়ে হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যেত এবং যাবার সময় আমাদের শূন্য চায়ের কাপের টেবিলটার দিকে একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত। ঘরের এক কোণে ছোট্ট টেবিলটায় বসে দোকানের প্রৌঢ় বয়সি মালিক। আমাদের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই ছোকরা বেয়ারাকে কী ইশারা করতেন জানি না, সে এসে দ্বিতীয়বার তার টেবিল-মোছা ন্যাতাটা এনে আর একবার টেবিলটা মুছতে শুরু করত। আমরাও ইঙ্গিতটা বুঝে ফেলতাম। অনেকক্ষণ টেবিল জুড়ে বসে আছেন, এবার কেটে পড়ুন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আর এক রাউন্ড চায়ের অর্ডার দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতাম, উঠবার কোনও লক্ষণ দেখাতাম না। আর এক রাউন্ড চা মানে আরও এক ঘন্টা সময়। যখন দশটা বাজত তখনও সেই এক কাপ চায়ের উপরেই ঝড় বয়ে চলেছে— সাহিত্য নিয়ে তুমুল তর্ক তখন জমজমাট। হঠাৎ দেখি আমাদের মাথার উপরের ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বুঝতাম, এবার মালিকের এটা ফাইনাল নোটিশ। এবারেও যদি না উঠি তাহলে—

চায়ের দোকানে আমাদের এই সান্ধ্যকালীন আড্ডা নিত্যনিয়মিত যে বসত তা নয়। মাঝে-মধ্যে ছেদ পড়ত। কিন্তু প্রতি রবিবার সকালের আড্ডা খুব একটা জরুরি কারণ না ঘটলে কখনও ছেদ পড়ত না। সকাল ন'টার মধ্যেই আমরা জমায়েত হতাম এবং আড্ডা চলত প্রায় বেলা একটা। রবিবার সকালের আড্ডায় প্রায়ই দু-একজন বাড়তি সাহিত্যিক এসে জুটত, যেমন শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন টেবিল জোড়া দিয়ে আমাদের বসতে হত, রাস্তার লোকদের দৃষ্টি আর এড়ানো যেত না। একবার অচিন্ত্যদা ট্রামে করে যাবার সময় আমাদের এই আড্ডা লক্ষ করে আমাদেরই এক পরিচিত বন্ধুর কাছে বলেছিলেন— এতগুলো লেখককে হাতে রাখবার জন্য সাগরের তো অনেক খরচ করতে হয়, কী বলো?

অচিন্ত্যদা অবশ্য জানতেন না যে আমাদের আড্ডার সিস্টেমটা ছিল 'হিজ হিজ, হুজ হুজ'। চায়ের বিল যখন বেয়ারা এনে দিত, তখন সমান ভাগে ভাগ করে যে-যার পকেট থেকে টাকা বার করে দিয়ে দিতাম। পরবর্তী কালে পার্ক স্ট্রিট বা চৌরঙ্গির হোটেল-রেস্তোরাঁয় সুনীল-সমরেশদের পানীয়ের আড্ডায়ও গিয়ে দেখেছি, 'হিজ হিজ, হুজ হুজ' সিস্টেমটা ওরাও চালু রেখেছে।

যাক, যে-কথা বলছিলাম। শীতকালের এক রবিবার সকালে ঠিক ন'টার সময় চায়ের দোকানে আমাদের নির্দিষ্ট টেবিলে গিয়ে বসেছি, অন্য কারুর দেখা নেই। একাই এক কাপ চা নিয়ে এক ঘন্টা সময় দোকানের রাখা আনন্দবাজার পত্রিকাটা উল্টে পাল্টে পড়ে অবশেষে 'পাত্র-পাত্রী চাই' কলামটায় চোখ বুলোচ্ছি আর টেবিলের

উপর একটা ডিশে রেখে-যাওয়া মৌরি চিবোচ্ছি, এমন সময় বিমল মিত্র, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিশুদা এসে উপস্থিত। বিমলবাবুর মুখটা দেখলাম কিছু ব্যাজার, একটু মুষড়ে পড়া ভাব। শচীন আর বিশুদার মুখে কৌতুকের হাসি।

বিমলবাবু তখন 'দেশ' পত্রিকায় 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাস বৎসরাধিক কাল ধরে ধারাবাহিক লিখছিলেন এবং সেই সপ্তাহেই তাঁর উপন্যাসের শেষ কিস্তি ছাপা হয়েছে। প্রকাশক 'মিত্র ঘোষ'-এর সঙ্গে পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে উপন্যাসের প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিমলবাবুর তখন উপন্যাস-লেখক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি।

চা আর চপের অর্ডার দিয়ে আমরা বেশ জমিয়ে বসেছি হঠাৎ বিমলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'রবিবারের সকালটাই মাটি হয়ে গেল। ভাবছি কোন শালা আর লেখে।'

আমি তো অবাক। হলটা কী। বিশুদার মুখে তখনও মৃদু হাসি লেগে আছে, শচীন গম্ভীর।

কারণটা জানতে চাইলে বৃত্তান্ত যা শোনা গেল তা হচ্ছে এই—

ওঁবা তিনজনে একসঙ্গে গিয়েছিলেন প্রেমেনদার বাড়ি অভিনন্দন জানাতে। 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন তিনি, এঁরা তো তাঁর অনুজ লেখক, তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন। ওঁরা যাওয়াতে খুব খুশি হলেন প্রেমেনদা। একেবারে দোতলায় তাঁর লেখাপড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। কে কী লিখেছে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করার পর হঠাৎ বিমলবাবুকে বললেন—

বিমল, দেশ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে দেখলাম, তোমার 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটার প্রথম খণ্ড বই আকারে বেরোচ্ছে। তা, তুমি ভাল করে এডিট করে দিয়েছ তো?

বিমলবাবু প্রশ্নটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তাহলে কি দীর্ঘকাল ধরে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত উপন্যাসটি প্রেমেনদা ধৈর্যের সঙ্গে ধারাবাহিক পড়ে অনেক কিছু দোষ ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন? প্রেমেনদা যে একজন অত্যন্ত সচেতন পাঠক কে না জানে। নতুন লেখকদের লেখা সযত্নে পড়েন, শুধু তাই নয়, লেখা ভাল হলে বাড়িতে ডেকে এনে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে প্রচুর উৎসাহ দেন। আবার লেখার ত্রুটি দেখলে চুলচেরা সমালোচনা করে তাকে তা বুঝিয়ে দেন, উপদেশ দেন এবং কী করে আরও ভাল লিখতে হবে তার নির্দেশও দেন।

বিমলবাবু বললেন— না তো, আমি কিছুই এডিট করিনি। পত্রিকায় যা বেরিয়েছে বইয়ে তা-ই আছে।

একটিপ নস্যি নিয়ে রুমালে নাকটা মুছে প্রেমেনদা বললেন— ভুল করেছ বিমল, বইটা এডিট করে বার করলে ভাল করতে।

মন্তব্যটি বিমলবাবু সহজে মেনে নিতে পারলেন না। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটির প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘকাল ধরে, যখন তিনি রেলে চাকরি করতেন সেই সময় থেকেই। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই তাঁর নিজের চোখে দেখা। শুধু তাই-নয়, নিজে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, সেই সঙ্গে প্রচুর পড়াশুনা করে তিনি এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু গড়ে তুলেছেন। তবু শিক্ষার্থী ছাত্রের মতো বিমলবাবু বললেন— কোন কোন জায়গায় এডিট করা উচিত ছিল আপনি যদি একটু বলে দেন তাহলে বিষয়টা ভেবে দেখতে পারি।

এবার ধরা পড়ে গেলেন প্রেমেনদা। অত বড় উপন্যাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ অত ধৈর্য ধরে পড়বার সময় কোথায় তাঁর? শুধু উপন্যাসের আকার অনুমান করেই উপদেশটা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার উত্তরে বিমল এরকম একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসবে সেটা ভাবতেই পারেননি।

প্রেমেনদাও মিত্তির কায়েত। তাঁকে বেকায়দায় ফেলবে বিমল মিত্তির— তা কি কখনও হয়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

দ্যাখো বিমল, সত্যি কথা বলতে কি তোমার উপন্যাস আমি একেবারেই পড়িনি। তবে তোমারই একজন অন্ধ ভক্ত পাঠকই আমাকে বলেছিল যে উপন্যাসটা নাকি ভালই লিখেছ তবে এডিট করলে আরও ভাল হত।

সঙ্গে সঙ্গে বিমলবাবু বললেন— ওটা যখন আপনার কথা নয় তখন আমি মানতে রাজি নই। বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রেসে দেওয়া হয়েছে, আমি একটি লাইনও তার বাদ দেব না।

এ কথা বলেই বিমলবাবু যাবার জন্য উঠে পড়লেন, সঙ্গে শচীন আর বিশুদাও। তবে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেননি প্রেমেনদা। বললেন— তবে একটা কথা স্বীকার করছি বিমল, 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' উপন্যাসের পর তোমার এই উপন্যাসটাই বাংলা সাহিত্যে 'বিগেস্ট নভেল'। এটা একটা বিরাট কীর্তি, সেটা মানতেই হবে।

এই বৃত্তান্ত শোনার পর আমি স্তম্ভিত। প্রেমেনদার কাছে আমিও তো প্রায়ই সকালে যাই এবং একটা টগবগে উৎসাহের ফুর্তি নিয়ে ফিরে আসি। বিমলবাবুর ক্ষেত্রে ঘটল বিপরীত প্রতিক্রিয়া। উনি বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়েছিলেন প্রথম দিকে। ঘটনাটি সবিস্তারে আমার কাছে বলার পর এবার বেশ উত্তেজিত। বললেন— এই আপনাকে বলে রাখলুম সাগরবাবু, স্বাস্থ্যে যদি কুলোয় তাহলে এর জবাব আমি দেব আরও ভাল উপন্যাস লিখে এবং বড় উপন্যাস লিখেই।

ততক্ষণে দ্বিতীয় রাউন্ড চা হয়ে গিয়েছে। বেলাও হয়েছে অনেক, প্রায় সাড়ে এগারোটা, এখন আর এক রাউন্ড চায়ের অর্ডার না দিলে ছোকরা ন্যাতা এনে বারবার টেবিল মুছবে।

চায়ের অর্ডার দেওয়া হল। এবার মুখ খুললেন বিশুদা। বললেন— এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ে গেল দুই বাঁড়ুজ্যে লেখককে নিয়ে।

শচীন বললে— বাঁড়ুজ্যে লেখক? কে বিশুদা, আমি তার মধ্যে নেই তো?

— আরে না না। তুমি তো এখনও পোনামাছের চারা, তোমাকে নিয়ে গল্প তৈরি হবার সময় এখনও আসেনি। আমি বলছি বাংলা সাহিত্যের দুই রুই-কাতলাকে নিয়ে, তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণ।

বিশুদা সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে ধোঁওয়া ছেড়ে দুই বাঁড়ুজ্যেকে নিয়ে সেদিন আমাদের রসিয়ে শুনিয়েছিলেন, আমি এখানে তার সারাংশটুকু তুলে দিলাম।

একদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ কলেজ স্ট্রিটে 'মিত্র ঘোষ'-এর দোকানে হন্তদন্ত হয়ে বিভূতিবাবু এসে হাজির। তখন উনি থাকতেন বনগ্রাম মহকুমার ব্যারাকপুর গ্রামে। শেয়ালদা স্টেশন থেকে সোজা চলে এসেছেন বইয়ের দোকানে, তাঁর পঞ্চাশটা টাকার প্রয়োজন। গজেনবাবু বললেন— বড়দা, এই মাত্র দোকান খুলেছি, ক্যাশে এখনও কিছুই জমা পড়েনি। বিকেলের দিকে, এই চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ পেলে চলবে কি?

বিভূতিবাবু তাতেই রাজি। শুধু চিন্তায় পড়লেন সারা দুপুরটা তাহলে কী করবেন, কোথায় কাটাবেন। কাউকে কিছু না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে। সেখানে সার দিয়ে বসে থাকে চুল ছাঁটার নাপিত, ফুটপাতে ইটের উপর বসে চুল ছাঁটতে হয়। তাদের একজনকে ছয় আনার বদলে আট আনা দেবার কড়ারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন গজেনবাবুর দোকানে। এসেই বললেন— গজেন, একটা টিনের চেয়ার আর একটা খবরের কাগজ দাও।

পাঞ্জাবিটা দোকানের ভিতরে খুলে রেখে গেঞ্জি গায়ে রাস্তার উপর দোকানের দেওয়াল ঘেঁষে টিনের চেয়ারে বসলেন, খবরের কাগজটার মাঝখানটা ফুটো করে মাথা গলিয়ে দিলেন, যাতে গায়ে আর চুল না লাগে। দোকানের সবাই বিভূতিবাবুর কাণ্ড দেখে তাজ্জব।

চুল ছাঁটা চলছে এমন সময় গাড়ি করে তারাশঙ্করবাবু এসে হাজির। বিভূতিবাবুকে ওই অবস্থায় দেখেই বললেন— সে কী হে বিভূতি, একটা সেলুনে গেলেই তো পারতে। একেবারে রাস্তার ওপর বসে পড়লে?

উত্তরে বিভূতিবাবু রাস্তায় বসে চুল ছাঁটার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তারাশঙ্করবাবুকে বললেন— হ্যাঁ ভাই তারাশঙ্কর, তোমার বাড়িতে আজ দুপুরে কী কী রান্না হয়েছে বলবে?

প্রশ্ন শুনে তারাশঙ্করবাবু অবাক। কী রান্না হয়েছে তা উনি কী করে জানবেন। প্রতিদিন বাজার করে ছেলে সনৎ, সুতরাং ওঁর তো জানবার কথা নয়। তবে হ্যাঁ, সকালবেলায় শুনে এসেছেন যে বাজারে ভাল গলদা চিংড়ি উঠেছে এবং সনৎ কিছু কিনেও এনেছে।

গলদা চিংড়ির কথা শুনেই বিভূতিবাবু বললেন— ভালই হয়েছে। তাহলে আজ দুপুরের আহারটা তোমার ওখানেই সারা যাক। কী বলো!

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তারাশঙ্করবাবু। বললেন— সে তো উত্তম কথা। তুমি চুল ছেঁটে নাও, আমিও গজেনের সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিই। তারপর বাড়ি গিয়ে বামনী যা রেঁধে দেবে দু-ভাই তাই ভাগ করে খাব।

চুল ছাঁটা হয়ে গেল। দোকানের ভিতরে এসে পাঞ্জাবিটা পরেই তারাশঙ্করবাবুকে তাড়া দিলেন, গজেনবাবুকে বললেন— জোগাড় করে রেখো ভাই। বিকেল চারটের মধ্যেই এসে পড়ছি।

তারাশঙ্করবাবুর গাড়িতেই দুজনে চললেন টালায়। তারাশঙ্করবাবু তখন টালায় নিজের বাড়ি তৈরি করে বাগবাজার থেকে উঠে এসেছেন। হাতিবাগান আসতেই তারাশঙ্করবাবু গাড়ি থামিয়ে রামলালের দোকান থেকে এক ভাঁড় দই আর কিছু সন্দেশ কিনে নিলেন।

দুপুরে আহারটা বিভূতিবাবুর হয়েছিল ভালই। বেগুনভাজা ও পটলভাজার সঙ্গে গাওয়া ঘি, লাউ দিয়ে সোনামুগের ডাল, বড়ি-চালকুমড়োর তরকারি আর গলদা চিংড়ির মালাইকারি। দই-সন্দেশ তো ছিলই।

খাওয়াদাওয়ার পর এবারে বিভূতিবাবুর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু তারাশঙ্করবাবু বিভূতিবাবুকে তাঁর একতলার বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে সাহিত্যের আলোচনা শুরু করে দিলেন।

বিভূতিবাবুর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পর বললেন— দেখো বিভূতি, তুমি কিন্তু একটা ভুল করছ। তুমি তোমার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছ না। দেখছ না আমাদের সমাজে কত পরিবর্তন ঘটে গেল। দাঙ্গা, মন্বন্তর, অত বড় এক যুদ্ধের আঁচ তো আমাদের গায়েও কম লাগেনি, যার ফলে রাতারাতি সমাজের চেহারাটাই দিলে পালটে, জীবনের মূল্যবোধ কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা তুমি বুঝতে পারছ না? যে-বিশ্বাস নিয়ে আমরা বড় হয়েছি, সে-বিশ্বাস আজ কীভাবে ভেঙে

পড়ছে সে তো তুমি তোমার চারপাশে দেখতেই পাচ্ছ। তোমার কি উচিত নয় তোমার সাহিত্যে এসব কথা তুলে ধরা।

অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তারাশঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভূতিবাবু বললেন— তুমি কী বলতে চাইছ তারাশঙ্কর। আমি যা লিখেছি তাহলে সেগুলি কি কিছুই হচ্ছে না?

— আমি তা বলতে চাইছি না বিভূতি। আমি বলতে চাইছি তোমার সাহিত্যে তুমি এখনও সেই গ্রাম আর নদী, সাঁই-বাবলার জঙ্গল আর অরণ্য, এই নিয়েই পড়ে আছ। এর থেকে তো তোমার বৃহত্তর পটভূমিকায় বেরিয়ে আসতেই হবে।

তারাশঙ্করবাবুর অবশ্য এ-কথা বলবার অধিকার আছে। উনি তখন খ্যাতির তুঙ্গে। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, মন্বন্তর, গণদেবতা প্রভৃতি বই তখন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, ওঁর বইয়ের কাটতি তখন যে কোনও সাহিত্যিকের কাছে ঈর্ষার কারণ।

বিভূতিবাবু কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না। বললেন— আমি কোনও বড় ঘটনায় বিশ্বাসী নই, দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মতো মন্থর বেগে অথচ, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে— আসল জিনিসটা সেখানেই। আমি আমার গ্রামের চারপাশের প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে এই জীবনটাই দেখি— বুঝি। আমার কথা তাদের নিয়েই। কোনও কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কষা, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরি করা— আমি জানি না। সেই জন্যেই বোধহয় আমার কিছু হল না।

তারাশঙ্করবাবু সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন— না বিভূতিভূষণ, তোমার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা আছে। শুধু যুগের সঙ্গে, কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে। তা যদি না পারো পিছিয়ে পড়বে তুমি।

আলোচনা যখন এই খাতে অনেক দূর গড়িয়েছে হঠাৎ বিভূতির মনে সংশয় দেখা দিল। তাহলে আমি যা লিখছি তা কি সবই ভুল? সবই মুছে যাবে?

এই বিরাট প্রশ্নটা মনে নিয়ে তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন বিভূতিবাবু। টালা থেকে সোজা চলে গেলেন টালিগঞ্জে। চারু অ্যাভিনিউতে থাকেন কালিদাস রায়। যাঁর সাহিত্যিক বিচারবোধের উপর বিভূতিবাবুর অসীম শ্রদ্ধা।

সৌভাগ্যের বিষয় কালিদাসদা সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। উত্তেজিত বিভূতিবাবুকে দেখেই কালিদাসবাবু বললেন— কী হে বিভূতি, আবার কী হল? হঠাৎ এ-সময়ে আমার কাছে?

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছে তা সবিস্তারে কালিদাসদার কাছে পেশ করার পর বললেন— আচ্ছা দাদা, আপনিই বলুন, আমি কি ভুল পথে চলেছি? আমার লেখা কি সত্যই মুছে যাবে?

কালিদাসদা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত বিভূতিভূষণের অসহায় মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে ধীর কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন— শোনো বিভূতিভূষণ, দেবী সরস্বতীকে তারাশঙ্কর গা-ভরা সোনার গয়না দিয়ে যতই সাজাক, তুমি দেবীর নাকের নাকছাবিতে যে হিরে বসিয়েছ তা দেবীর সারা অঙ্গের গয়নার জৌলুসকে ছাপিয়ে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তুমি যে-পথে চলেছ সেইটিই ঠিক পথ— সেইটিই তোমার ধর্ম। কখনও ধর্মচ্যুত হয়ো না।

যে-প্রশ্ন এতক্ষণ বিভূতিবাবুর মনকে আলোড়িত করে চলেছিল, কালিদাসদার এই কথায় তার উত্তর পেয়ে প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল। সহসা চেয়ার থেকে উঠে কালিদাসদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন— চলি দাদা, আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি।

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে সোজা চলে এলেন গজেনবাবুর দোকানে। তখন বেলা শেষ, পাঁচটা বাজে।

গজেনবাবু বললেন— সে কি বড়দা, সারাদিন কোথায় ছিলেন? আপনি আসছেন না বলে আমরাও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে পারছি না। আপনার জন্যে মুড়ি তেলেভাজা আনিয়ে রেখেছি, খাবেন তো?

— না রে ভাই, তারাশঙ্কর আজ যা খাইয়েছে তারপরে আর কিছু মুখে রুচবে না। খাবার ক্ষমতাও আমার নেই। দাও, টাকাটা দাও, পাঁচটা পঞ্চান্নর বনগাঁ লোকালটা ধরতে না পারলে বাড়ি পৌঁছতে সেই রাত দশটা বেজে যাবে। তাছাড়া কল্যাণী বলে দিয়েছিল ফেরার সময় শেয়ালদা বাজার থেকে একটা কাশীর বেগুন যেন কিনে নিয়ে যাই।

এই বলেই বিভূতিবাবু গজেনবাবুর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন শিয়ালদার দিকে।

বিশুদা যখন এই কাহিনি শেষ করলেন তখন বেলা প্রায় একটা। মাথার উপরের পাখাটা যে কখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টেরও পাইনি।

পথের মোড়ে

অরুণ মিত্র

শিল্পসাহিত্যের ভাবনায় ও উদ্যমে আমি একদা যাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলাম তাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সবচেয়ে আগে। সে যখন সবে স্কুল ডিঙিয়েছে তখন তার সঙ্গে আমার প্রথম সংযোগ। আমি সে-সময় কলেজের গণ্ডি পার হয়ে গিয়েছি। পরে তার সঙ্গে আত্মীয়-সম্পর্ক হলে আমাদের সাহচর্যের সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। বিজনের ডাকনাম ছিল গোষ্ঠ। ওই নামেই আমি তাকে বরাবর ডাকতাম। এক সময় কালীঘাটে আমাদের সদানন্দ রোডের বাড়িতে সে প্রায় রোজই আসত। গৃহকর্তা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন তার বড় মামা। আমি তাঁর পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। গোষ্ঠ এ বাড়িতে এলে আমাদের আড্ডা চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাওয়া খাওয়া ভুলে। গান-নাচ, অন্যের নকল করে কথা বলা এবং চোখমুখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা ভঙ্গি সহযোগে গল্প বলা ছিল তার সহজাত প্রবণতা। সস্ত্রীক আমাকে (শান্তি ছিল তার স্বল্প বয়োজ্যেষ্ঠা দিদি, মাসতুতো বোন) সে তার সেই উচ্ছ্বাসের স্রোতে টেনে নিত। এই পর্বটার আরম্ভ ১৯৩৮-এ, চলে বোধ হয় ১৯৪৫ পর্যন্ত। অবশ্য ইতিমধ্যে এই আসরের পরিধি এবং প্রকৃতি অনেক বিস্তৃত হয়ে যায়। কেননা ঘরের সঙ্গে এসে মেলে বা'র। এই বিস্তৃতির বিবরণ যথেষ্ট কৌতূহলজনক। এবং যথেষ্ট জ্ঞাতব্য, যেহেতু বাংলা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক অধ্যায় এতে জড়িত।

ব্যক্তিগতের এই বিস্তৃতি দেখা দেয় কয়েকটি কারণের সমন্বয়ে, যাদের প্রধান তিনটিকে আমি এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি: আমাদের নিজেদের মনোভাব, আমাদের কর্মজীবন, ফাশিজমের অভ্যুদয় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

আমি ছাত্রাবস্থাতেই আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ শুরু করি। আমার বেশ পরে সেখানে যাঁরা নিযুক্ত হন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার

বিশেষ সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। সাহিত্য এবং মানব সমাজ সম্পর্কিত ধারণায় একটা আত্মীয়তাবোধ ছিল তার ভিত্তি, যদিও তা নিয়ে, যত দূর মনে পড়ে, খুব খোলাখুলি মত বিনিময় আমরা করিনি। যাঁদের সঙ্গে সেই বন্ধুত্ব হয় তাঁরা হলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, মন্মথ সান্যাল। এই দলে পরে যুক্ত হল আর একজন যার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অনেক আগে থেকেই। সে বিজন ভট্টাচার্য। বিজন কলেজি পড়াশোনায় ইতি করার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ পেয়ে গেল আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। আমরা এই ক'জন মিলে নিজেদের রচনা পাঠের এক বৈঠকও শুরু করে দিলাম। সেটা বসত সাধারণত আমাদের বাড়িতে (মন্মথ সান্যাল অবশ্য থাকতেন শ্রোতা হিসেবে)। এ দিকে আবার বিজনের এবং আমার সূত্রে অন্যান্য লেখক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল সদানন্দ রোডের বাড়িতে। যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আরও পরে শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল ঘোষ। প্রসঙ্গত বলি, এই বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছেও বহু লোক আসতেন, জ্ঞান বিদ্যা রাজনীতি নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট এবং অবশিষ্ট নানা মানুষ। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, কিন্তু তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের তৎপরতায় যুক্ত ছিলেন না।

আমাদের ওই বৈঠকের সঙ্গে বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংযোগ হয়নি, হয়েছিল বিনয় ঘোষের। তার একটা কারণ এই যে, এর সঙ্গে ব্যাপকতর ক্ষেত্রের সাহিত্য-তৎপরতাকে সংশ্লিষ্ট করার কোনও প্রশ্ন ছিল না। প্রচারিত হওয়া বা না হওয়ার সমস্যা যাঁদের মনের মধ্যে তখন ছিল না, একটা বিশেষ দৃষ্টির নিজস্ব প্রকাশকে বন্ধুদের সামনে রাখাই ছিল যাঁদের তখন প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁরাই ছিলেন এ-বৈঠকের অংশীদার। অবশ্য পরবর্তী কালে পত্রিকা ও পুস্তক মারফত তাঁরা খ্যাতি লাভ করেন, কেউ বেশি কেউ কম।

আর একটা মনোভাবও আমাদের এই একান্তে থাকার পেছনে কাজ করেছিল মনে হয়। তবে আমার ও বিজনের মধ্যে তির্যক মন্তব্যের বিনিময় ছাড়া স্পষ্টভাবে সে-মনোভাব কখনও প্রকাশ পেয়েছিল কি না সন্দেহ। সেটা হল মাপাজোকা কথাবার্তা, কৃত্রিম হাবভাব, পণ্ডিতি চাল-চলন এবং অতিশালীনতার প্রতি বিরূপতা। এ-সবের প্রকাশ বা প্রকাশের সম্ভাবনা যেখানে থাকত সেখানে ভিড়বার আগ্রহ আমাদের হত না। এক কথায় বলা যায় আমরা সকলেই একটু গেঁয়ো ছিলাম, সেজন্যে সভ্য মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে আমাদের অস্বস্তি হত।

সাহিত্য সম্পর্কে একটা বিশেষ ধরনের মনোভাবও ছিল আমাদের। তাকে

সাধারণভাবে বলা যায় বামপন্থী মনোভাব। সাহিত্য যে মিছিল করে উৎপন্ন করা যায় না, লেখকের একক আত্মনিয়োগই যে সৃষ্টির উৎস, সে-ধারণা আমাদের ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এও মনে করতাম যে, কোনও সৃষ্টিই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, সর্বসাধারণের যা অভিজ্ঞতা, শরিক হিসেবে লেখকের অভিজ্ঞতা তারই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সর্বসাধারণের সঙ্গে কোনও-না-কোনও ভাবে সাহিত্যে সৃষ্টির এক মানবিক সংযোগ থাকাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাহিত্য, শিল্পের খাতিরে শিল্প— এ সব তত্ত্বে আমরা বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু আমাদের এই রকম মনে হওয়াটা অল্পবিস্তর অনুভূতিরই অন্তর্গত ছিল। বিষয়টা স্পষ্টভাবে আমাদের মধ্যে কখনও আলোচিত হয়েছিল বলে স্মরণ করতে পারি না। সম্ভবত এই অস্পষ্টতার কারণেই পরে রাজনৈতিক মতের তাড়নায় কেউ কেউ পূর্বসাথিদের বর্জন করে অন্য পথে পা বাড়ান, এমনকী বিপরীত পথেও। যখন জাতিক এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কট খুব ঘনিয়ে উঠেছিল, তখনই এই অবস্থাটা দেখা দিয়েছিল। আমরা কয়েকজন কিন্তু একসঙ্গেই রইলাম শেষ পর্যন্ত। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ এবং আমি।

এখানে দুটো বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। কারও কারও লেখায় দেখেছি আমাদের এই সাহিত্য-বৈঠক প্রসঙ্গে "অনামী" নামক সাহিত্য-সংস্থার উল্লেখ। না, এই বৈঠকের পেছনে কোনও সংস্থা ছিল না, সুতরাং কোনও নামও ছিল না। পরবর্তী কালে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য "অনামী" ছদ্মনামে প্রতি সপ্তাহে অরণি পত্রিকায় "কথা প্রসঙ্গে" শিরোনাম দিয়ে বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নিবন্ধ লিখতেন, যা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটাই বোধ হয় এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তির কারণ। এও বলা দরকার এই সঙ্গে যে, আমাদের একত্রে বসে নিজেদের লেখা পড়ে শোনানোর মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা খুব ছিল না। আর যা ছিল না তা হল সাহিত্যিক অহঙ্কার। আমরা দারুণ লেখক এমন কোনও দাবি বা ভান আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় পায়নি কখনও। আমরা উৎসাহী ছিলাম সাহিত্য ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যে নয়, এক বিশেষ দৃষ্টির প্রকাশের জন্যে যে-দৃষ্টি জীবন ও মানবদশাকে পাশ কাটিয়ে আর্টের আতসবাজি দেখাতে লেখককে প্ররোচিত করে না। এ-দৃষ্টিকে সাহিত্যিক অথবা রাজনৈতিক মতানুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যায়, কেউ প্রতিপক্ষ খাড়া হয়ে নিন্দাসূচক নামকরণও করতে পারেন। আর এক রকম মন্তব্যও আমার নজরে এসেছে। 'অরণি' পত্রিকার লেখকদের আড়ালে নাকি এক গুপ্তচক্র ছিল, এই "অনামী" চক্র। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। এটা সজ্ঞান উক্তি যদি হয়ে থাকে তবে একে কুৎসা রটনা বলা চলে। 'অরণি' পত্রিকার রচনা সংগ্রহ, তার কার্যালয়ে আলাপ-আলোচনা,

নানান লেখকের যাতায়াত এবং সম্পর্ক স্থাপন, সবই খোলাখুলি চলত, গোপনে কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। যে-প্রগতিশীল চিন্তার বাহন ছিল এই পত্রিকা, তা তো মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণারই বিষয়।

আমাদের মনের গতি এবং নড়াচড়ার সীমা ব্যক্তিগতকে ছাড়িয়ে অনেক বড় পটে যে প্রসারিত হল তার প্রধান প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানুষের ভাবনা যাদের মনের মধ্যে বরাবর ছিল তারা বেশ কয়েক বছর ধরেই আশঙ্কা করছিল যে, এক ভয়ঙ্কর বিপদ মানুষের সামনে। ফাশিবাদের অভ্যুদয়ে এই বিপদের সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং মানব-সংস্কৃতি কী ভাবে ধ্বংস করা হয়, স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-১৯৩৯) সেই প্রাথমিক ফাশিস্ট মহড়াই দেশে দেশে বহু মনীষী ও চিন্তানায়কের চোখ খুলে দিয়েছিল, যাঁদের মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। ফাশিবাদী শক্তি যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দিল তখন বোঝা গেল বিপদ এবার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথম দিকে কিছু বিভ্রান্তি অবশ্য সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪১-এর জুনে সোভিয়েতভূমি আক্রান্ত হলে আমাদের অনেকের কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এখানে যদি ফাশিজম জয়ী হয় তাহলে সমস্ত মানুষের স্বাধীনতাই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে। তখনকার অবস্থার এক বর্ণনা আমার রচনায় এই রকম দিয়েছি ইতিপূর্বে: 'ফাশিজমের বিকট দানব মূর্তি হাঁ করে এগিয়ে এল আমাদের সকলকে গিলে খেতে। আমরা নিঃসংশয়ে বুঝলাম, কোনও মানবিক মূল্যই আর রক্ষা পাবে না, সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি সবই এখন বিপন্ন। শিল্পী-সাহিত্যিকরা যতই বাস্তবের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকুন না কেন, এই বাস্তব তাঁদের রেহাই দেবে না। এর আগেই অবশ্য সামাজিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের দশায় সাহিত্য-শিল্পের মানবিক মূল্য এবং মানুষের প্রতি তার অন্তর্নিহিত দায়িত্ব পুনরুজ্জীবিত করার অভিপ্রায়ে গঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘ। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত প্রতিভাবান তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যার পরই প্রত্যক্ষ ফাশিস্ট বিপদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার এবং প্রতিরোধের মনোভাব উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হল ফাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।'' প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলা দেশে এই বাস্তব রূপ নিল ১৯৪২-এর মার্চে।

কিন্তু এর আগেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত স্তরে আমাদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অরণি'। সেটা ১৯৪১-এর শেষ দিকের ঘটনা। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়েছেন। আনন্দবাজারের সঙ্গে আমাদের কয়েক জনের সম্পর্কও শিথিল হয়ে এসেছে। আসলে আমাদের মন সে-সময় সাহিত্য, সমাজ ও

স্বদেশ সম্বন্ধে অন্য কল্পনায় অন্য পরিকল্পনায় ভরপুর। 'অরণি'র পথে শুরু হয় আমাদের নতুন সাহিত্যিক যাত্রা। বলা চলে, আমাদের বৈঠকের ব্যক্তিগত এখানে এক আনুষ্ঠানিক চেহারা পেল এবং সেই সঙ্গে এক সামগ্রিক পরিচিতি। পুরনো সবাই যে আমাদের সঙ্গে রইলেন তা নয়, কিন্তু নতুন অনেকে এসে গেলেন। সে এক উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা। খ্যাত অখ্যাত কতজন সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। পূর্বতনেরা দেখা দিলেন নতুনত্ব নিয়ে, নতুনেরা প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হতে থাকলেন। বাংলা কাব্যে যাঁরা পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এমন কয়েক জনের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'অরণি'র পৃষ্ঠাতেই। যেমন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন। এক উচ্ছল সহমর্মিতার পরিবেশে আমরা 'অরণি'তে কাজ করতাম। সে-সময়ের কথা যাঁদের স্মরণে আছে তাঁরা জানেন এই পত্রিকা অল্প দিনের মধ্যেই প্রগতিকামী সমাজ-ভাবনার এবং বিকারমুক্ত সাহিত্য-চেতনার কী প্রবল মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

অতএব ফাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ যখন গঠিত হল তখন তাতে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপরতলার ঘরে সঙ্ঘের কেন্দ্র বস্তুত ছিল নতুন বাস্তব পরিস্থিতিতে শিল্প সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট চিন্তা ও তৎপরতার এক প্রকাশ-কেন্দ্র। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, অভিনয় এ সমস্ত সম্বন্ধেই ভাবনার এবং চর্চার একটা পরিচয় সেখানে পাওয়া যেত। প্রথম পর্বে তো এ-সঙ্ঘের সহযোগের পরিধি ছিল বিশাল। বাংলা দেশে এমন লেখক ও শিল্পী কমই ছিলেন যাঁরা এর উদ্যমে যুক্ত হননি। পরে অবশ্য রাজনৈতিক কারণে এই সহযোগ সঙ্কুচিত হয়।

আমাদের কয়েকজনের মনে হত বাড়ির আড্ডাটাই যেন ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। মনে হত আমাদের যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য এবং সমভাবনা ছিল তা যেন এক উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ফাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ অচিরে এক আশ্চর্য মিলনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। কত নতুন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এখানে, কত নতুন উদ্যমের পথ খুলে যায়। এর যে-ছবি অন্য রচনায় আমি এঁকেছি তার পুনরাবৃত্তি এখানে বাহুল্য হবে না: "দেশ, পৃথিবী, মানুষ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের ভাবনা যেন এক বৃহৎ সঙ্গ পেল। আমাদের কয়েক জনের সেই আড্ডা মিশে গেল এক মস্ত প্রবাহে। সরকারি ঠিকানা অবশ্য ছিল ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিট, আসলে ঠিকানা ছিল সর্বত্র: কখনও ট্রামে, কখনও সদানন্দ রোডের বাড়িতে, কখনও অন্য কোথাও। মনে পড়ে, ধর্মতলার ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা দক্ষিণ কলকাতাবাসী কয়েকজন, যেমন বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ

মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য আর আমি প্রায়ই রাত্তিরে এক সঙ্গে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে বাড়ি ফিরতাম। গাড়ির মধ্যে চলত আমাদের যৌথ গান, তখনকার সব বিখ্যাত গণসঙ্গীত। অবশ্য সুরে বেসুরে। তবে তাতে আমাদের পরোয়া ছিল না। এবং প্রায়ই কন্ডাক্টর মহাশয় আমাদের টিকিট কাটতে ভুলে যেতেন।"

এখানে যাঁদের সঙ্গে নতুন পরিচয় হল এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান। আগে থেকেই আমার পরিচিত ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি যখন আনন্দবাজারে ছিলাম তখন শারদীয় সংখ্যা সম্পাদনার সহকারিত্ব করতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে-আলাপ তাঁদের রচনা সংগ্রহেই শেষ হয়নি, মাঝে মাঝেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হয়েছে। এই সঙ্ঘে এক অন্য পটভূমিতে আমি তাঁদের যেন নতুন করে দেখলাম। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয় এবং প্রীতির সম্পর্ক এখানে যেন এক সমধর্মের অন্তরঙ্গতা পেল।

সঙ্ঘের বিবিধ তৎপরতা এবং আমাদের সদানন্দ রোডের গৃহ, এ দুয়ের মধ্যে একটা সেতু স্বাভাবিকভাবে আপনা থেকেই রচিত হয়ে যায়, কেননা ব্যক্তিগত গণ্ডির মধ্যে আমাদের চিন্তায়, মেলামেশায় ও প্রবণতায় এই রকম তৎপরতার ভিত তৈরি হয়েই ছিল। এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন ফাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী, গীতিকার, অভিনেতা, নাট্যকার এবং কলা-কুশলীদের নিয়ে পৃথকভাবে গঠিত হল গণনাট্য সঙ্ঘ। যার ভূমিকা এই সংগঠনে নানাদিক থেকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই বিজন ছিল আমাদের একান্ত আপন এবং তার সঙ্গীত ও অভিনয় প্রবণতার প্রায় দৈনন্দিন প্রকাশ-ক্ষেত্র ছিল আমাদের গৃহকোণ। তার প্রকৃতির সেই স্বতোৎসারের কথা আমি প্রথমেই বলেছি। আমরা সবাই ছিলাম সঙ্গীত ও অভিনয় বিষয়ে আগ্রহী, সাহিত্যে তো বটেই। গণনাট্য সঙ্ঘ যখন গঠিত হল তখন প্রকাশ পেল আমাদের বাড়িতেই বিশেষ অভিনয় ক্ষমতা উন্মুখ হয়ে আছে। শান্তি নিজে অভিনয় ব্যাপারে বরাবর অত্যন্ত উৎসাহী, সে-সময়ে তৃপ্তি থাকত দিদির কাছে। মাসতুতো দাদা বিজনের আগ্রহে এবং দিদির সমর্থনে তৃপ্তি গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনেত্রী হয়ে গেল। তার উত্তরোত্তর খ্যাতি এবং কৃতিত্বের ইতিহাস তো সবারই জানা। মোট কথা, কার্যত আমাদের বাড়ি গণনাট্য সঙ্ঘের এক অংশ হয়ে দাঁড়াল। আমাদের তেতলার ঘরে অভিনয় ও গানের মহলা চলত দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে নাটক ও উপন্যাস পাঠও হত, প্রধানত বিজনের। কত গুণিজন আসতেন সেই ঘরে, অংশ নিতেন সেই নবজীবনের উদ্যমে। একমাত্র গুণহীন আমি একপাশে মন্ত্রমুগ্ধ বসে থাকতাম। এ আর এক পর্ব, যার স্মৃতি হয়তো অক্ষরে গেঁথে তোলা যাবে অন্য কোনও সময়।

আড্ডা! আড্ডা!

তরুণ মজুমদার

শুনে কেউ অবাক হবেন না যেন। আড্ডার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রায় আমার জ্ঞানোদয় থেকে। আমার বয়স তখন চার।

না না, আড্ডাধারীদের মধ্যে আমি কেউ নই। কিন্তু চোখের সামনে এমন জমাটি আড্ডা দেখেছিলাম ওই বয়সে যে, আমার শিশুমনে ওই আনন্দময় ব্যাপারটির ছবি চিরদিনের মতো খোদাই হয়ে গেল। এখন আমি সত্তরের কোঠায়।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। আমার শৈশব কেটেছে গ্রামে-ঘেরা একটা ছোট্ট শহরে। শহরটা এখন আর ভারতবর্ষের চৌহদ্দির মধ্যে নেই। আমার বাবা ছিলেন এক স্বাধীনতা সংগ্রামী। তখন ব্রিটিশ শাসন চলছে। আমাদের দুই ভাইকে মার জিম্মায় রেখে বাবাকে মাঝে মধ্যেই জেলে যেতে হত। রাজবন্দি। যখন জেল থেকে ছাড়া পেতেন তখন তাঁর অন্য সব রাজনৈতিক কাজকর্মের পাশাপাশি আর একটি আর্টের চর্চা করতেন। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে চুটিয়ে আড্ডা মারা।

যে সময়টার কথা বলছি, তখন মায়ের কোল জুড়ে শুধুই আমি। আমার ছোট ভাইয়ের জন্ম হবে আরও এক বছর পরে। একদিন বাবা এসে মাকে বললেন, ক'টা দিনের জন্যে একটু কলকাতা ঘুরে আসা দরকার। তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, এবার ভাবছি ওকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

মার মৃদু আপত্তিকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে একদিন বাবা আমাকে নিয়ে চেপে বসলেন রেলগাড়িতে। কয়লার ইঞ্জিনের রেলগাড়ি। থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। চলন্ত গাড়িতে কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়ে। জানালার ফ্রেম দিয়ে জীবনে প্রথম রেলে-চাপা আমি বাইরের দিকেই চেয়েছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ বেশিক্ষণ বরাতে সয়নি। হঠাৎ কামরার মধ্যে প্রচণ্ড হইচই। চেয়ে দেখি—

আগে একটু বলে নিই কামরার মধ্যে কারা কারা ছিলেন। বাবা ছাড়াও বাবার ঘনিষ্ঠ ৮/১০ বন্ধু— যাদের মধ্যে ফণি কাকা, অতুল কাকা, ধর জ্যাঠা— আরও কে কে যেন। আর হ্যাঁ, আমাদের সেই ছোট্ট শহর বগুড়ার ডাকসাইটে মঞ্চাভিনেতা কাঁকর ভুইঞা। সেই সঙ্গে এটাও বলা দরকার যে, বগুড়াতে শৌখিন নাট্যচর্চা একটু বাড়াবাড়ি রকমের ছিল বলেই তখনকার দিনে, সেই অবিভক্ত বাংলায়, কলকাতার বাইরে 'রিভলভিং স্টেজ' বলতে একমাত্র আমাদের ওখানেই ছিল।

তা, হইচই শুনে ফিরে দেখি এক অদ্ভুত কাণ্ড! আমার সেই কাকা-জ্যাঠাদের এক-একজন করে দাঁড়িয়ে উঠে প্রচণ্ড চিৎকার করে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কী যেন আওড়াচ্ছেন— আওড়াতে আওড়াতে তাদের মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো ঠিকরে পড়ে আর কী, দমও প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত শ্বাস বন্ধ হয়ে তিনি যখন রণে ভঙ্গ দিলেন, বাবা তাঁর হাতঘড়িটা দেখে কী যেন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন (ঠিক কী বলেছিলেন, এতদিন পরে আর মনে নেই— কিন্তু ধরা যাক 'এক মিনিট বারো সেকেন্ড')। সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের দু-হাত তুলে নৃত্য, 'হেরে গেছে, হেরে গেছে! সামনেই সান্তাহার জংশন— তিন হাঁড়ি রসগোল্লার পয়সা ফেলো এক্ষুনি।' তার পরেই বাবার ঘোষণা, 'নেকস্ট!'

পরের জন উঠলেন। তিনিও আগের কাকুর মতোই বলতে লাগলে। এক দমে— একবারও নিশ্বাস না ছেড়ে। ক্রমশ তারও মুখচোখ লাল হয়ে উঠছে। তারও যাই যাই অবস্থা। অবশেষে বিষম খেয়ে থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার ঘোষণা, 'এ হে হে! মোটে ছাপ্পান্ন সেকেন্ড!' আবার কামরা জুড়ে হইচই, উল্লাস। ঈশ্বরদি! ঈশ্বরদিতে পরোটা-আলুর দম!' হাল ছেড়ে দিয়ে পরাজিত কাকু পকেট থেকে গিঁট-বাঁধা রুমাল বের করলেন। গিঁটের মধ্যেই টাকা।

অত অল্প বয়সে শোনা সংলাপগুলোর হয়তো কিছুটা হেরফের থাকতে পারে— কিন্তু বিষয়টা যে এই, এ ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু, কী নিয়ে লড়াইটা হচ্ছে এদের মধ্যে সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। পাশেই বসা জেঠু-স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি ফিসফিস করে জানালেন, 'চন্দ্রগুপ্ত'।

আমি তখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি। সেই জেঠু আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন, 'চন্দ্রগুপ্ত' হল একটা থিয়েটার। পাল্লা চলছে, এক দমে কে কতটা ঠিক ঠিক বলতে পারে। হেরে গেলেই পেট পুরে খাওয়াতে হবে সব্বাইকে।

এক-একটা স্টেশনে গাড়ি থামছে আর রাশি রাশি খাবার উঠছে কামরায়। নাটোরের কাঁচাগোল্লা, ঈশ্বরদির উৎকৃষ্ট পরোটা, পোড়াদহর পানতুয়া, রানাঘাটের সরপুরিয়া, নৈহাটির চা-তেলেভাজা ইত্যাদি গলাধঃকরণ করে বিশাল উদ্গার তুলতে তুলতে সবাই যখন শিয়ালদা স্টেশনে অবতীর্ণ হলেন, তখন দেখা গেল, চলৎশক্তির

বড়ই অভাব। কোনও রকমে তিনটি ঘোড়ায়-টানা কেরাঞ্চিগাড়ি ভাড়া করে সবাই উঠে পড়লেন।

তখনকার দিনে বউবাজারের গোপী বোস লেনের ভেতর দিকে একটা আশ্চর্য তেতলা বাড়ি ছিল— যাকে বলা হত 'বগুড়া মেস'। বগুড়ার যারা যারা চাকরিসূত্রে কলকাতায় থাকতেন তাঁদের ডেরা এটা। বগুড়াগামী অন্য কেউ যদি কোনও কাজে ক'টা দিনের জন্য কলকাতায় চলে আসতেন— চোখ বুজে চলে আসতেন এখানে। নিজেদের চৌকি ছেড়ে দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দারা অস্থায়ীদের জায়গা করে দিতেন। উদ্দেশ্য একটাই। অন্তত আরও কটা দিনের জন্যে আরও জমাটি আড্ডাটা তো সারা যাবে। একতলা, দোতলা, তিনতলা, ছাদ— সর্বত্রই হইচই, সর্বত্রই দুদ্দাড়— আর থেকে থেকেই চা। মনে আছে, এই গোপী বোস লেনের বিচিত্র মেসবাড়িতেই মোটে চার বছর বয়সে আমার প্রথম 'চায়ে-খড়ি' হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সেই চা আজও আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

যখন বড় হলাম, সবাই বলল, আমি নাকি বেজায় মুখচোরা। কথাটা হয়তো সত্যি। মফস্‌সলের সেই স্কুল জীবনে আড্ডা মেরেছি— এমন স্মৃতি আমার নেই। স্কুল ছেড়ে যখন কলকাতায় পাকাপাকিভাবে এলাম, তখন আমাদের পরিবার উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল। সে কষ্ট আর লড়াইয়ের কথা আজ আর টেনে এনে লাভ নেই। গ্রাসাচ্ছাদন ব্যাপারটা এমন জরুরি যে তাব কাছে অন্য সব প্রয়োজন হার মানে। এমনকী, শিক্ষার প্রয়োজনও। তবু যে আমি সেন্ট পল্‌স কলেজে পড়ে, তার বিশাল হস্টেলে মাথা গুঁজে কোনও রকমে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে পারলাম, তার কারণ অন্য। এর জন্যে আমার অভিভাবকদের কোনও অর্থব্যয় করতে হয়নি। কয়েকটা স্টাইপেন্ড আমাকে সাহায্য করেছিল।

সেন্ট পলসের পরে স্কটিশ চার্চ— সেখানে না চাইতেই এক অনাবিল আড্ডা জুটে গেল আমার কপালে। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের কাছাকাছি গ্যালিফ স্ট্রিটে তখন আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই। আমার কিছু সহপাঠী— সুব্রত, শৈলেন্দ্র, প্রভাত, শশবিন্দু, পশুপতি— এরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওদের আড্ডায়। দেশবন্ধু পার্কের মুখোমুখি একটা চায়ের দোকানে, একদম আটপৌরে। সেখানেই ওরা সন্ধেবেলা বসত। দোকানের মালিক ফণিবাবু বোধহয় এদের একটু বেশিই পছন্দ করতেন। কারণ, চার কাপ চা আট ভাগ করে (ব্যাপারটার টেকনিক্যাল নাম 'ডবল হাফ') ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানের অনেকটা জুড়ে, রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে গেলেও জীবনে কোনও দিন সামান্যতম ইঙ্গিতও দেননি যে, উঠে যাও এবার। তোমাদের জন্যে আমার অনেক খদ্দের নষ্ট হচ্ছে।

এখানে বলা দরবার, এই আড্ডার আড্ডাধারীরা পড়াশোনার ব্যাপারে যাকে বলে এক-একটি 'জুয়েল'। থার্ড ইয়ার-ফোর্থ ইয়ারে এদের মার্কশিট হিংসে করার মতো। এই আড্ডাতেই ক্রমে ক্রমে জুটে গেল আরও কিছু অসম্ভব রঙিন চরিত্র। একজন শোভাবাজারের অলঙ্গ ম্যানসনবাসী সুনীল— সুনীল মৈত্র— যে পরবর্তী কালে কমিউনিসট পার্টি মার্কসবাদীর কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য পর্যন্ত হয়েছিল। সুনীলের সঙ্গে এল অসীম— বলতে গেলে তার পাশের বাড়ির ছেলে। সুনীলের বৈশিষ্ট্য হল, যে কোনও বিষয়ে অনর্গল তর্ক করার প্রবণতা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সিনেমা, নাটক, যাত্রা, কবিগান, টুসু, ভাদু, হাপু, আলকাপ— দুনিয়ার এমন কোনও বিষয় নেই যেটা ওর তর্কের খোরাক নয়। অসম্ভব পড়াশোনা তার। প্রতিপক্ষকে কাত করে দিতে ওর জুড়ি নেই। কিন্তু দোষ একটাই। ওর সঙ্গে একমত হলেও ও ছাড়বে না কিছুতেই। কেন একমত হলাম তাই নিয়ে আবার নতুন তর্ক জুড়ে দেবে। ওর সঙ্গী অসীম— সে আবার একেবারেই উলটো। তর্কাতর্কির ধারে কাছে নেই, চুপচাপ থাকবে, প্রায়শই সমস্ত চায়ের বিল মেটাবে আর মাথার ভেতর অদ্ভুত অদ্ভুত আইডিয়ার চাষ করবে। একবার আমাদের এক বন্ধু বিয়ে করল। আমরা ঠিক করলাম, সবাই মিলে একটা কিছু ভদ্র চেহারার উপহার দেব। কিন্তু অসীম জানাল, না ভাই, তোমরা যা দেবার দাও, আমি আমার মতো দেব। শীতকালে অনুষ্ঠান। ছাদের ওপরে ম্যারাপ। আমাদের দলটা আগে ভাগেই পৌঁছে নববধূর হাতে আমাদের 'সম্মিলিত উপহার'টি অর্পণ করে সবেমাত্র দায়মুক্ত হয়েছি, এই সময় সাদা পাঞ্জাবির ওপর সাদা শাল মুড়ে অসীম ঢুকল। আজ যেন একটু মোটা-মোটাই দেখাচ্ছে তাকে। ওদিকে ঠাণ্ডাও জব্বর। অসীমের হাত দুটো শালের মধ্যে জড়োসড়ো। সোজা নববধূর সামনে গেল আর হাতদুটো শালের ভেতর থেকে বের করে নিজের উপহারটা বাড়িয়ে ধরল। তাই দেখে নতুন বউয়ের তো মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়। আমরা সবাই থ'। অসীমের মুখে মিটিমিটি হাসি— যে হাসির মধ্যে দিয়ে নব-বিবাহিতদের প্রতি তার অন্তরের সমস্ত শুভকামনা যেন ঝরে পড়ছে। হাতের উপহারটি বাড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। দুটি ফুটফুটে সাদা বেড়ালছানা, গলায় লাল রিবনে ঘুঙুর বাঁধা। অত ভিড়ে ভড়কে গিয়ে তারা মিঁউ মিঁউ করে ডাকছে আর এদিক ওদিক চাইছে।

ফণিবাবুর এই চায়ের দোকানের জমাটি আড্ডায় যারা যারা ছিল সেদিন তাদের মধ্যে সুনীল আজ নেই। অনেক আগেই তার অকালমৃত্যু হয়েছে। কেউ কেউ বিদেশে গিয়ে নাম করেছে। কেউ কেউ স্বদেশে। কিন্তু সেদিন যারা ছিল, আজ পেছন দিকে চেয়ে ভাবলে মনে হয়, সে যেন এক ছেলেমানুষের মেলা। হইহই, আড্ডা, তর্ক, পেছনে লাগা, উচ্চকিত হাসি দিয়ে গড়া এক সব পেয়েছির দেশ।

আবার এরই মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে অন্য সুরও লেগে যেত। একটা নমুনা পেশ করি। একদিন শেষ বিকেলে আমরা সবাই জড়ো হয়েছি ফণিবাবুর চা-খানায়। কিন্তু সেদিন সুব্রতর দেখা নেই। ফলে, আমি উসখুস করছি। কারণ, অন্যদের তুলনায় সুব্রত আর আমিই একটু নীরব প্রকৃতির। অন্য সবাই যখন ঝড় তুলত, সুব্রত আর আমিই হাল ধরে বসে থাকতাম। সেই সুব্রত আজ কেন দেরি করছে? অসুখ-বিসুখ করল না তো? ভাবছি, এমন সময়, তখন সন্ধে নেমে এসেছে, সুব্রত এসে ঢুকল। 'কী ব্যাপার, এত দেরি?' শুনেও কোনও উত্তর নেই। গম্ভীর মুখে একটা বেঞ্চের এক কোণে গিয়ে বসল। মুখে কোনও কথা নেই।

সবাই ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল ওর দেরি হবার কারণ।

সব প্রশ্ন যেন সুব্রতর এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আগেই বলে নিই, এটা ১৯৫৫ সালের কথা।

অনেক পীড়াপীড়ির পর সুব্রত মুখ খুলল। মহাচিন্তিত দার্শনিকের মতো বলল, আজ একটা ছবি দেখে এলাম।

— কার ছবি? কীসের ছবি?

— ফিল্ম। 'আবোল-তাবোল'-এর সুকুমার রায়— তার ছেলে বানিয়েছে।

— সে তো সত্যজিৎ রায়। সিগনেট প্রেসের সব বইয়ের কভার ডিজাইন করেন। দারুণ ইলাস্ট্রেটার!— বলল সুনীল।

— কিন্তু ছবিটা চলবে না।

— হতেই পারে। ক'টা ছবি আর চলে? কিন্তু তাতে তোমার এমন মুখ গোমড়া কেন?

— ছবিটা নেহাত খারাপ নয় হে। 'পথের পাঁচালী' নাম।

আমরা একসঙ্গে চমকে উঠলাম। না; 'পথের পাঁচালী' নামটা শুনে নয়। 'ছবিটা নেহাত খারাপ নয়' শুনে। আমরা সবাই জানতাম, সুব্রত ছিল আন্ডার স্টেটমেন্টের রাজা। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলার মতো জিনিসকে সে বলত নিস্পৃহভাবে— যেন পোলাও-কালিয়া নয়, সাদামাটা ডালভাত খাচ্ছে সে। এ হেন সুব্রতর মুখে 'নেহাত খারাপ নয়' শুনে আর সেই সঙ্গে 'ছবিটা চলবে না' শুনে, সেই মুহূর্তেই সবাই মিলে ঠিক করে ফেললাম ছবিটা সেদিনই নাইট শোতেই দেখে নিতে হবে।

নাইট শোতে 'পথের পাঁচালী' দেখে ফিরে আসছি— গভীর রাত তখন। আমাদের কারও মুখে কোনও কথা নেই। দেশবন্ধু পার্কের দরজা বন্ধ। রেলিং টপকে ঢুকলাম আমরা। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বসে পড়লাম।

এখনও কারও মুখে কোনও কথা নেই। অথচ বড় বড় আড্ডাধারীরা চারপাশে বসে। হঠাৎ আমাদের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, নাঃ, একটা কিছু করা দরকার।

সবাই তাকালাম তার দিকে।

— এ ছবি চলবে না। কিছুতেই চলবে না। তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব কিছু তো একটা করতে হয়।

— কী?

— কী?

— কী করা যেতে পারে?

অত রাতে আমরা চলে গেলাম আমাদের বন্ধু নীলুর বাড়ি। পুরনো খবরের কাগজের ওপর পোস্টার লিখব। প্ল্যাকার্ডে সাঁটব। পরদিন একটা প্রসেশন বের করব দেশবন্ধু পার্কের গেট থেকে।

পরদিন সকাল। প্রসেশনে বেরোবার আগে ফণিবাবুর দোকানে ঢুকে আধকাপ করে চা খেয়ে নিলাম। মনোবল বাড়ানো দরকার। মুখে যতই ফটরফটর করি, জীবনে কোনও দিন প্রসেশনে হাঁটিনি। তাও আবার এ ধরনের প্রসেশন।

মিছিল শুরু হল। ফণিবাবু তাঁর দোকান থেকেই শুভেচ্ছাসূচক হাত নাড়লেন। চোখ নামিয়ে, আড়ষ্ট পায়ে, প্ল্যাকার্ড হাতে হাঁটতে লাগলাম আমরা। প্ল্যাকার্ডে আলতার কালি দিয়ে লেখা:

'পথের পাঁচালী দেখুন।
'পথের পাঁচালী' দেখা আমাদের কর্তব্য।

মিছিল ফড়িয়াপুকুর হয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে পড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। দু-পাশের লোক অবাক হয়ে দেখছে আমাদের। বেশ লজ্জা লজ্জা করছে। হঠাৎ, শিকদার বাগানের মোড়ে দাঁড়াল দু-তিন জন লোক আপনা থেকে এসেই আমাদের সঙ্গে জুটে গেল। তারাও, আমাদেরই মতো, হয়তো আগের দিনই 'পথের পাঁচালী' দেখে থাকবে। দু-পা এগোতেই আরও কয়েকজন এল। তারপর আরও কয়েকজন। যত এগোচ্ছি, লোক বাড়ছে।

হাতিবাগানের কাছে এলে দেখা গেল, আমরা, যারা মূল মিছিলটা শুরু করেছিলাম, সংখ্যালঘু হয়ে গেছি। ক্রমশ লোক বাড়ছে। সুনীল আমাদের কানে ফিসফিস করে বলল, ব্যস্, আর কী? আমরা এবার অনায়াসেই একটা চায়ের দোকানে ঢুকে আড্ডা মারতে পারি।

আড্ডা: সম্পাদকের দপ্তরে

রণজিৎকুমার সেন

অল্প বয়সে দেরি করে বাড়ি ফিরলে অনেক সময় কটূক্তি কানে আসত: 'এতক্ষণে আড্ডা দিয়ে তবে ফেরা হল, তাই না?' আড্ডা শব্দটা তখন খুব একটা রুচিকর অর্থে ব্যবহৃত হত না। দলে মিশে আড্ডা দিলে বখে যাবে, এটাই ছিল তখনকার অভিভাবক শ্রেণির ধারণা। সেই ধারণার পরিবেশেই সেদিন আমার বয়স ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। পরে যখন কলেজের পাঠ শেষ করে বেরলাম, তখন আড্ডাটাই আমার প্রধান হয়ে দাঁড়াল। নিছক যে সময় কাটাবার জন্যে, তা নয়। ছেলেবেলা থেকে শিক্ষার সঙ্গে আমার সাহিত্য সাধনা চলছিল সমান্তরাল ভাবে। তাই সাহিত্যরসিক দু-চারজন বন্ধু ভিন্ন অপর কারুর সঙ্গে মেলামেশার বড় একটা আগ্রহ বোধ করতাম না। তাদের সঙ্গে অকারণে বসে গল্প আলাপ করে সে সময়টা কাটাতাম, সেইটেই ছিল আড্ডা। সেখানে নানা চটুল আলোচনা থেকে শুরু করে সাহিত্যের অনেক ভারী-ভারী বিষয় দানা বেঁধে উঠত। তাতে লাভ হত এই যে, সেই সার্বিক আলোচনার সারাংশটা মনের মধ্যে থেকে যেত, বাকিটা ধীরে ধীরে মুছে যেত স্মৃতি থেকে। যেটুকু সারাংশ তা থেকে মাঝে মাঝে এমন উপাদান পেয়ে যেতাম— যা দিয়ে ভাল একটি গল্প গড়ে উঠতে পারে, তৈরি হতে পারে একটি সুন্দর প্রবন্ধ। সমধর্মী ব্যক্তিদের সঙ্গে আড্ডার সার্থকতা এইখানেই। যে বয়সে আড্ডা শব্দটা রুচিকর অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে কটূক্তি হয়ে আমার কানে আসত, সে বয়সের কথাটা ভেবে পরবর্তী কালে খুব হাসি পেত। আসলে আড্ডারও শ্রেণিবিভাগ আছে। পাত্র ভেদে তার বিচার বিভিন্ন অর্থে দাঁড়ায়। পরবর্তী কালে আড্ডা শব্দটার একটা দার্শনিক সংজ্ঞা খুঁজে পেলাম। তার গুণগত অর্থ হচ্ছে— আড্ডা পরোক্ষে শুধু ভাবেরই সৃষ্টি করে না, প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়েরই একটা মধুর সম্পর্কও গড়ে দেয়। আড্ডা কখনও তত্ত্বালোচনার বৈঠক নয়, বৈঠক রসালোচনার। এই রস জীবনকে

সুধাসিক্ত করে মানুষের সৃষ্টিশীল নান্দনিক ক্ষেত্রকে উর্বর করে তোলে। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে একদা এই আড্ডাই ছিল নানা উদ্ভাবনী সুকুমার সৃষ্টির উৎস। সেই উৎস থেকেই গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতি। আড্ডাকে কেন্দ্র করে সেদিন চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতিকে তাই মনে করা হত সংস্কৃতির সূতিকাগৃহ বলে।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আড্ডার যে কতটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করি পরবর্তী কালে আমার সাংবাদিক জীবনে। সাময়িকপত্র ও দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে সাধারণত আড্ডার সময়টা হচ্ছে অপরাহ্ন। সম্পাদকের হাতে এ সময়ে কাজ হালকা হয়, এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা নানা অফিসে কর্মরত, তাঁরা আসেন দশটা পাঁচটার ডিউটি শেষ করে। শিক্ষক, অধ্যাপক, অ্যাডভোকেট প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাই। আমি যখন মাসিক 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনা করি, তখন যাঁরা আসার তাঁরা এই নিয়মেই আসতেন; এসে আড্ডাকে আসরে রূপ দিতেন। আসলে সাহিত্যের আড্ডা তো আসরই। সবাই যে নিয়মিত আসতেন, তা নয়, কিন্তু আসাটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে যেত। অকাজকে কেন্দ্র করে কাজের লক্ষ্যও ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিত। অর্থাৎ রথ দেখা আর কলা বেচা— দুটোই ঘটত একই দৃশ্যপটে। আসতেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবিশেখর কালিদাস রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়, সুরেশ চন্দ্র দেব, মেঘলাল রায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী মণ্ডল, বন্দে আলী মিয়া, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, মনোরঞ্জন বড়াল প্রভৃতি থেকে শুরু করে তরুণতম দুর্গাদাস সরকার, প্রফুল্ল রায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাঁরা সকলেই ছিলেন বঙ্গশ্রীর লেখক। প্রফুল্ল ও প্রণবের তখন কেবল হাতেখড়ি, এখন তারা মস্ত ঔপন্যাসিক ও কবি। মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে আসতেন সুরুচি সেনগুপ্ত। ভাল গল্প লিখতেন। বয়সে বৃদ্ধা হলেও অভিনয়েও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। চলচ্চিত্রে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি দর্শকদের অভিভূত করেছিলেন। নাট্যকার সলিল সেনগুপ্ত তাঁরই পুত্র। আমাকে সহোদর ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন তিনি। মাঝে মাঝে সুন্দর গল্প জমাতেন এসে আড্ডায়। আর যাঁরা আসতেন, তাঁরা ছিলেন চিত্রশিল্পী সুনীল মাধব সেনগুপ্ত, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আমার সম্পাদকীয় দপ্তর তখন বেলা এগারোটা থেকে রাত সাতটা অবধি জমজমাট হয়ে থাকত। চা আনাতাম, কখনও চায়ের সঙ্গে খাবারও আসত। সে ব্যয় অবশ্য কোম্পানি বহন করত না, বহন করতে হত আমাকেই। তাতে পকেটে অবশ্য কিছু টান পড়লেও ব্যাপারটা ছিল আনন্দের। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ

যাঁরা আসতেন, তাঁরা শুধু 'বঙ্গশ্রী'র টানেই আসতেন না, আসতেন আমাকে ভালবেসে। তাঁদের কথায়ও যে মাঝে মাঝে কিছু চটুলতা প্রকাশ না পেত এমন নয়; কিন্তু গুরুচালের আলোচনাই মুখ্য। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছোটদের জন্যে 'শিশু ভারতী' ও বাংলার ডাকাতদের কাহিনি লিখে এক সময় বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিশেষত তাঁর 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-এর তো তুলনাই নেই! আলোচনা প্রসঙ্গে এক সময় বললাম· 'বাংলার বারো ভুঁইয়া সম্পর্কেও তো যাবতীয় ইতিহাস আপনার জানা। লিখুন না ভুঁইয়াদের কাহিনি।' যোগেনদা বললেন, 'কবিশেখর যদি বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে লেখেন, আমি তবে ভুঁইয়াদের কথা লিখতে পারি।' কবিশেখর কালিদাকে বললাম: 'কী, শুরু করবেন নাকি?' কালিদা বললেন: 'বঙ্গশ্রীর পাতায় ভুঁইয়া আর বৈষ্ণবে কি মিল খাবে?' বললাম: মাঝখানে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাসের চ্যাপ্টার থাকবে, গল্প থাকবে মেঘেন্দ্রলাল রায় কিংবা অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের; সুতরাং বৈষ্ণবেরও জাত যাবে না, ভুঁইয়ারাও কিছু শ্বাস নিতে পারবে।' হলও তাই। বঙ্গশ্রীর জন্যে বৈষ্ণব সাহিত্যও পেলাম, বারো ভুঁইয়াদেব সম্পর্কে ঐতিহাসিক চিত্রও পেলাম। মেঘেন্দ্রলাল রায় ছিলেন যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আত্মীয়, তেমনই সুরেশ চন্দ্র দেব ছিলেন বিপিনচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠ জামাতা। আড্ডা উপযোগী মানুষ। বয়সে বৃদ্ধ হলেও নিজেকে খুব একটা রেখে ঢেকে চলতেন না। লিখতেন সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান নিয়ে প্রবন্ধ— বঙ্গশ্রীতে যা মাঝে মাঝে ছাপতাম। অফিসের আড্ডা ছাড়াও মাঝে মাঝে তিনি সোজা চলে আসতেন আমার বাসায়, যেমন আসতেন যোগেশচন্দ্র বাগল, নারায়ণ চৌধুবী, নলিনীকুমার ভদ্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায প্রভৃতি। নলিনীকুমার মূলত 'প্রবাসী'র সহ সম্পাদক হলেও মাঝে মাঝে আড্ডা জমাতে ছুটে আসতেন বঙ্গশ্রীতে। অ্যাস্ট্রোলজিতে তাঁর কিছু দখল ছিল। তিনি এলেই কেউ না-কেউ তাঁর দিকে হাত বাড়িযে দিতেন। মানুষের ভাগ্য যে তাঁর হাতে— এ কথাটা নানা রেখা মিলিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের যোগে বলে দিতেন নলিনীবাবু। কখনও কাবও কিছু বা ফলেও যেত। এ সম্পর্কে আরও বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন হাইকোর্টের একটা বিভাগে। সেদিন আড্ডায় কথা উঠেছিল কলকাতার বাজারে মাছের দুর্মূল্যতা নিয়ে। অপূর্বকৃষ্ণ বললেন: 'মাছ কেনা থেকে আপাতত আমি বেঁচে গেছি। এক ভেড়িওয়ালার হাত দেখে কিছু বলেছিলাম। পুরোপুরি তা ফলে যাওয়ায় ভেড়িওয়ালা একদিন এসে বললে: আপনি বাবু দয়া করে মাছের জন্যে মিছেমিছি খরচা করবেন না, ওটা আমার ছেলে এসে রোজ আপনার ঘরে পৌঁছে দেবে।' শুনে উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, বললেন: 'আমাদের ঈর্ষা হচ্ছে।' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অপূর্বকৃষ্ণ বললেন: 'আমি যে আজ সুপারিনটেন্ডেন্ট,

তাও হাত দেখে। এলিস সাহেব ছিলেন আমাদের Top Boss, খাঁটি ইংরেজ। হঠাৎ লন্ডন থেকে কল পাওয়ায় আমাদের বিভাগে এসে বললেন: 'Home আমাকে ফিরিয়ে নিচ্ছে, তাই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

আমি তাঁর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বললাম: 'আপনি home-এ গেলেও আবার আপনাকে এই হাইকোর্টে ফিরে আসতে হবে স্যার।' এলিস সাহেব জিজ্ঞেস করলেন: 'কী করে বুঝলে বট্টাচারিয়া?' বললাম: আপনার কপাল দেখে স্যার।' এবার এলিস সাহবে প্রতিবাদ করে বললেন: অ্যাবসার্ড, তা হতেই পারে না। Home-এ কেউ একবার গেলে তার পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়।' বললাম: 'তবু আপনাকে আসতেই হবে স্যার, আপনার কপালে আমি sign দেখতে পাচ্ছি।' আর কিছু না বলে একবার উপহাসের হাসি হেসে সাহেব চলে গেলেন। আমি তখন মাত্র একজন আপার ডিভিশন ক্লার্ক। প্রমোশনের কোনও চান্স নেই ধারে কাছে। এলিস সাহেব চলে যাবার পর এভাবেই দু'বছর কেটে গেল। হঠাৎ বেয়ারার হাত দিয়ে একটা স্লিপ এল একদিন আমার হাতে: 'Dear Bhattacharya, I am again in the court. Please see me once'—Elis. আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম— সে কি, এলিস সাহেব সত্যিই তবে দু'বছর বাদে আবার হাইকোর্টে ফিরে এলেন। গিয়ে দেখা করতেই তিনি বললেন: 'You are correct. I like to being you direct under me as a Superintendent.' শুনে মনে মনে আমি ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করলাম। সেই থেকে এখনও আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট।

এতক্ষণ বিরাট কৌতূহল নিয়ে শুনছিলেন সবাই। এবারে উচ্ছ্বাসে সকলে ফেটে পড়লেন। কে একজন একটু ব্যঙ্গ করে বললেন: হঠাৎ কথাটা ফলে গিয়েছিল ভাগ্যিস, তাই সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়ে রিটায়ার করতে পারছেন।'— কিন্তু সে কথাটা কানে নিলেন না অপূর্বকৃষ্ণ। আড্ডা সেদিন জমজমাট। গল্প পেলে কারও কথা নেই। জীবনটাই তো নানা গল্পের সমষ্টি। আড্ডার সময়টা সেদিন আরও এক ঘণ্টা বেড়ে গিয়েছিল।

এ রকম এক-একদিন এক-একটা বিষয় হঠাৎ প্রাধান্য পেয়ে যেত। এই সব ছিল প্রাসঙ্গিক এবং এক্সটেম্পো। কেউ কিছু একটা নিয়ে শুরু করা সাপেক্ষ, তাই নিয়েই চলল কিছুক্ষণ, তারপর আবার কিছু একটা। তাতে এমন বিষয় ছিল না— যা ঘুরে ফিরে না আসত। অর্থনীতি, সমাজনীতি, বেকারত্ব, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, গ্রহ-নক্ষত্র, স্বপ্নতত্ত্ব, ধর্ম ও দর্শন, চিত্রকলা, যাদুবিদ্যা, কৃষি-বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সঙ্গীত, মঞ্চ ও চিত্রাভিনয়, নারীপ্রগতি, বিবাহ ও লোকচরিত্র প্রভৃতি সবই ছিল আড্ডার আলোচ্য বিষয়; সঙ্গে কিছু টীকা-টীপ্পনি হাস্যরস। একদিন

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার এলেন তাঁর কিছু আলোকচিত্রসহ। সদ্য আমেরিকায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে এসেছেন। বললেন: 'ওদের দেশে সংবাদপত্র কত উন্নত দেখুন! আমি ওয়াশিংটনে ল্যান্ড করতেই ওঁদের সেরা ম্যাজিসিয়ান এলেন আমাকে রিসিভ করতে, তারপর তাঁরই গাড়িতে আমাকে নিয়ে চললেন নির্ধারিত হোটেলে আমার জন্যে রিজার্ভ করা রুমে। এরোড্রোম থেকে এই রুমে এসে পৌঁছতে খুব বেশি হলে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লেগে থাকবে। আমার রুমে এসে পা দিতেই কে একজন ষোলো পৃষ্ঠার একটি রঙিন ছাপা পত্রিকা এনে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল: It is your's— তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় আকারে আমাকে রিসিভ করার ছবি। এত অল্প সময়ে এ কী করে সম্ভব হল ভেবে আমি তখন বিস্মিত ও অভিভূত।'— পত্রিকাখানি মি. সরকারের সঙ্গেই ছিল, পোর্টফোলিও থেকে বার করে সামনে ধরতেই সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। দুটি আলোকচিত্রসহ মি. সরকারের এই আমেরিকা বিজয় আমি পরবর্তী সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করলাম।

পরবর্তী কালে এ রকম আড্ডা কিছু লক্ষ করেছি যুগান্তর সাময়িক বিভাগে। তার কেন্দ্রমণি ছিলেন পরিমল গোস্বামী। যুগান্তরের নিয়মিত লেখক হিসেবে আমিও যেতাম সেই আড্ডায়। আসতেন বনফুল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), দাদাঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই। আসত মুড়িসহ বাগবাজারের তেলেভাজা ও চা। কিন্তু বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের এতে কুলোত না। এসেই বলতেন: পরিমল, খাবার আনাও, বড্ড খিদে বোধ করছি। বেয়ারাকে ডেকে পরিমলদা বলতেন: 'বাবুর জন্যে টোস্ট আর চা।' গলা ছেড়ে বলতেন. 'ওতে কি হবে, আনবে ডবল ডিমের ওমলেট আর দুটো টোস্ট, পরে পনেরো মিনিটের এদিক ওদিকে দু'কাপ চা।'— তাই আসত। আমরা তখন মুড়ি আর তেলেভাজা চিবোচ্ছি। নিজে যেমন খেতে ভালবাসতেন বলাইদা, তেমনই অপরকে খাইয়েও তৃপ্তি পেতেন। কখনও কোনও দিন মণীশ ঘটক আসতেন উচ্ছল হয়ে। এমনই একদিন এসেই বললেন: পরিমল, পুজোর কবিতা আমি বহরমপুরে গিয়ে পাঠিয়ে দেব। আপাতত এসো বেরোই গ্র্যান্ড, নিউ ক্যাথে কিংবা অলিম্পিয়া থেকে কিছু খেয়ে ফিরি।' বুঝলাম— মণীশদার এখন ড্রিংকসের দরকার। পরিমলদা বললেন: দপ্তর ছেড়ে এখন আমি উঠি কী করে, আরও অনেকে তো আসবেন। তুমি বরং রণজিৎকে নিয়ে বেরোও। এবারে মণীশদা পাকড়াও করলেন আমাকে। ইচ্ছে না থাকলেও আপত্তি করতে পারলুম না। পথে এসে ট্যাক্সি নিলেন মণীশদা, তারপর সোজা চৌরঙ্গির নিউ ক্যাথে। দু'ঘণ্টায় বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে তুলনা করে এক অনবদ্য আলোচনা করলেন মণীশদা। সঙ্গে চলল ড্রিংকস আর

ফুড। যুগান্তর সাময়িকীতে তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল নলিনীকান্ত সরকার লিখিত দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জীবন। পরবর্তী কালে যা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। নলিনীকান্ত পণ্ডিচেরীতে থাকায় দাদাঠাকুর নিজেই প্রতি সপ্তাহে এসে পরিমলদার সামনে বসে এই ধারাবাহিক রচনাটির প্রুফ দেখে দিতেন। এই প্রুফ দেখা থেকেই আড্ডা জমে উঠত। সাময়িকীর কর্মসূত্রে এপাশে ওপাশে থাকতেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য। সেদিন ছিল বর্ষার সন্ধ্যা। কে একজন বললে এ-বেলা গরম খিচুড়ির সঙ্গে টাটকা তেলেভাজা হলে জমত ভাল। সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুর বলে উঠলেন: 'খিচুড়ি শব্দটা খচ্চর থেকে এসেছে, জানো তো? ঘোড়াও নয়, গাধাও নয়, দুয়ের মিশ্রণে খচ্চর। তেমনই চালও নয়, ডালও নয়, দুয়ের মিশ্রণে খিচুড়ি।' এরকম রসিকতায় খিচুড়ি প্রসঙ্গ তলিয়ে গিয়ে অকস্মাৎ হাসির হুল্লোড় বেড়ে গেল। থেমে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি খালি পায়ে চলেন কেন দাদা?' দাদাঠাকুর বললেন: গরিব ছেলে, মাথার উপর ছিলেন কাকা। কাকার ছেলেদের জুতো ছিল, আমার জুতো ছিল না; স্কুলে যেতে কষ্ট হত। একদিন সেই কথা তুলে ধরতেই কাকা বললেন: 'পাড়ার স্যাকরার একটা পা নেই, তাই নিয়ে সে সব কাজ করছে; আর তোর দুটো পা থাকতেও জুতো ছাড়া তোর স্কুলে যেতে কষ্ট হয়! শুনে মনে বড় দুঃখ হল। সেদিন থেকে এ জীবনে কোনও দিন আর জুতো পরিনি।" শুনে আড্ডার সব হাসি অকস্মাৎ চুপসে গেল। আমাদের সকলের মনে তখন বিষাদের ছায়া। পরিমলদা যত দিন যুগান্তর সাময়িকীর সম্পাদক ছিলেন, এ রকম আড্ডা সপ্তাহে দু' একদিন খুব জমিয়েই বসত। পরে সময়ের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে তা উঠে গেল।

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের সান্ধ্য আড্ডাটাও ছিল এক সময় খুব জমজমাট। মালিক সুধীরচন্দ্র সরকার যদিও বাইরে গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু অন্তরে ছিলেন শিশুর মতো। 'মৌচাক' সম্পাদনায় তাঁর সহকারী ছিলেন বিশু মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় আসতেন তৎকালীন 'প্রবাসী' সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, শিবরাম চক্রবর্তী, মনোজ বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীল রায় এবং আরও অনেকে। অচিন্ত্যদা ছিলেন প্রাণবন্ত পুরুষ, আসর জমিয়ে তুলতে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর প্রধান লক্ষ্যটা থাকত প্রবোধদার দিকে। কেদারদা ও তুষারকান্তি সকলের চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও রঙ্গ তামাসায় তাঁরাও কম যেতেন না।

এ রকম আড্ডার অভাব ছিল না তখন। এই আড্ডা থেকেই নতুন প্রতিভার সৃষ্টি হত। সাহিত্য রথের চাকা কোনও দিন তাই থেমে থাকেনি। ১৯৩৭-৩৮ সালে

'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে এক সময় আসর উত্তাল হয়ে উঠত। সেখানে কাজীদাই প্রধান আকর্ষণ। গান থেকে রাজনীতি কিছু বাদ যেত না। মাঝে মাঝে কিছু সূত্র ধরিয়ে দিতেন বার্তা সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত, আর অনর্গল ও অবিশ্রান্ত হয়ে উঠতেন কাজীদা। অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'বকসা ক্যাম্প', 'ডেটিনিউ ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ' এই সময়েরই রচনা। আমিও তখন কর্মসূত্রে 'নবযুগ'-এর সঙ্গে যুক্ত। কাজের ফাঁকে এই আড্ডাটাই ছিল সেদিনের প্রাণ। মাঝে মাঝে কাজীদার সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানিতে। সেখানে কাজীদা ছিলেন গীতিকার ও অনন্য সুরকার। আমার গানেরও তখন কিছু রেকর্ড বেরিয়েছিল। দু-একটি ইসলামি গানও লিখে দিয়েছি বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দীন আহমেদকে। তার প্রেরণা কাজীদাই।

এইভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের নানা আড্ডায় যুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে আমি যে অফুরন্ত সম্পদ লাভ করেছি, এ জীবনে তার তুলনা নেই। সুস্থ ও সুকুমার আড্ডা শুধু সম মানসিকতায় পারস্পরিক প্রীতিরই সঞ্চার করে না, তা এক স্বর্গীয় সুধারসে জীবনকে ভরে দেয়। বিন্দু বিন্দু সেই রস কখন আমাদের নিজেদের অলক্ষেই সাহিত্যের উপাদান হয়ে সঞ্চারিত হয়ে যায় সংস্কৃতির নানা মঞ্চে। এ জীবনে সেইটেই বড় করে প্রত্যক্ষ করলাম।

তৃষ্ণা ও বিষাদ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কবে প্রথম দুধের দাঁত পড়েছিল— কবে প্রথম দেখলাম— কলকাতা শহরের বুকের ভেতর দাঁড়ানো পাউরুটি কারখানার চিমনি পূর্ণিমার রাতে গলগল করে চাঁদের দিকে গোল্লা-পাকানো মিশকালো ধোঁয়া পাঠাচ্ছে— সেই ধোঁয়ার গায়েও জ্যোৎস্না দেখেই মুগ্ধ হলাম— এ সব কি মনে থাকে।

কৃত্তিবাস-কৃত্তিবাস খেলাটাও অমনি এক ভুলে-যাওয়া, কিন্তু বড় খেলা। কেউ তো জানি না— কে কী করব। কেবলই মনে হয়— না-জানি সামনে কী আছে। এই অবস্থানে রোজই দেখা হওয়ার একটা অজানা আনন্দ। তারপর আনতাবড়ি কোনও অভিযান। অনেক অভিযানের শেষে বিপদ ওত পেতে থাকত।

অনেক অভিযানে যাওয়া হয়নি। কৈশোর পেরিয়ে যেতে-যেতে দেশভাগ। তাই কলকাতায় চলে আসা। দেশভাগের আগে থেকেই অনেকে কলকাতায়। শ্যামবাজার তাদের প্রায় আদিনিবাস। জন্মভূমি না-হলেও মনোভূমি তো বটেই। তাদের হাত দিয়ে কৃত্তিবাসের নৌকা যখন নেমে পড়ল, তখন আমরা ২০/২১/২২।

সে সময়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরি সবে খুলেছে। একদিন উৎপল এসে বলল, একটা লেখা দিতে হবে *কৃত্তিবাস*-এ। সে বোধ হয় তৃতীয় কি দ্বিতীয় সংখ্যা। সবে দু-তিনটি গল্প এখানে সেখানে বেরিয়েছে। কৃত্তিবাসের লেখার চেয়ে কৃত্তিবাসীদের সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা পাগল-পাগল ইচ্ছে কাজ করত। ওরা ঠিক আমাদের মতো গেঁয়ো নয়। কলকাতা ওদের কাছে যেন জলভাত। নিমু গোস্বামী লেন চেনে। বেশ শহুরে। *সুন্দর* নামে একটি গদ্য ছাপা হল কৃত্তিবাসে। তার বহু পরে ছাপা হয়েছিল বড় গল্প *বিদ্যুৎ চন্দ্র*... ১৯৬৫ সনে। সঙ্কোচ ছিল। কলকাতাকে তেমন করে জানি না। সবাই কবিতা লেখে। আমি লিখি না। আসলে আমি কিছুই লিখি না। ডবল ডেকারের দোতলায় বসে উত্তরে যাওয়া। সুনীল একদিন মোমবাতির আলোয় একটা কাঠের

টেবিলে চা খেতে-খেতে ওর কবিতার বই *একা* এবং *কয়েকজন* উপহার দিল। রেস্তরাঁটির মেঝে মাটির। উপহার দেবার সময় সুনীল বেশ গম্ভীর। আমার কেমন সম্ভ্রম-সম্ভ্রম লাগল। শক্তি দাড়ি রেখেছে। নিশুতি রাতে প্রায়ই একটা অভিজ্ঞতা হয়। কোনওটায় থাকি। কোনওটায় থাকি না। আসলে আমি আড্ডার নিয়মটা জানি না। কিন্তু গন্ধ পাই। নিজেই জানি না আমি কী? আমি কীসের? এর ভেতর সন্দীপনও ধুতির ওপর ফিনফিনে পাঞ্জাবি। শরৎ স্যুট। দীপক গলার শিরা ফুলিয়ে চমৎকার গায়। শুনতে পাই, মতি দেশবন্ধু পার্কে বসে গল্প পড়ে শুনিয়েছে। সমরেন্দ্র ওষুধের ভারী ব্যাগ হাতে কৃত্তিবাস বের করছে। লিখছে বেলালও। কাগজে ঢুকেছিলাম সবার আগে। বিকেল বেলাগুলো কাগজ খেয়ে নিত। ছিটেফোঁটা যা পেতাম বন্ধুদের— তাতে মন ভরত না। খিদে থাকত। সব শুনতে পাই। কিন্তু যোগ দেওয়া হয় না। বিয়ে করে ফেলেছি। বাবা হয়ে গেছি অনেক আগে। তারপর হয়ে গেলাম চম্পাহাটি থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জার। বীজ। ধান। চাষবাস। গরু। ঘরবাড়ি। পুকুর।

প্রায় চল্লিশে কলকাতায় ফিরে এলাম। তখন আমরা সবাই লোক হয়ে গেছি। এক-এক জন আলাদা লোক। যার-যার মতো। বেশ অনেক দিন তো ডেলি প্যাসেঞ্জারি হল। বউ হল। বাবা হওয়া গেল। ধুতি-পাঞ্জাবি আট হাটের পাম স্যু পরে দেখা গেল এবার। বন্ধুত্বের সেই না-মেটা তেষ্টা আমাকে টেনে নিয়ে গেল নতুন করে বের করা মাসিক কৃত্তিবাস-এর দিকে। সে সময়ে আমি আস্ত একটা বাড়ি ফেলে এসেছি পেছনে। খোলা মাঠ, পুকুর, গরু, ধান, দিগন্ত। কৃত্তিবাসীরা তখন কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনবে-কিনবে। আমার আর বাড়ি ভাল লাগে না। এই সময় মাসিক কৃত্তিবাস। রোজ আনন্দ। পেজ দেখা হয়। খুব ঘন করে মেলামিশি। তুমুল ভালবাসাবাসি। দেখা না-হলে কষ্ট হয়। বিশাল হৃদয়, বিশাল চেহারার গণেশচাঁদ দে সম্ভবত শক্তি ও শান্তির (লাহিড়ির) আবিষ্কার। তাঁর তরুণ প্রেসে *সোভিয়েত দেশ* ছাপা হত। সেখান থেকেই কৃত্তিবাস ছাপা শুরু হল। ,গণেশদা একজন চমৎকার পুরুষমানুষ ছিল। আমাদের চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়। বিরাট প্রেস। বড় সংসার। বউবাজারে বাড়ি। আমরা সবাই মিলে তখন সপরিবারে সে এক বিরাট কল্যাণী কংগ্রেস। আমরাই রিসেপশন কমিটি। আমরাই সাবজেক্টস কমিটি। আমরাই প্রকাশ্য অধিবেশন। আমরা আমাদের ভেতর মজে আছি। ওরই ভেতর থিয়েটার-পাড়ার বিজ্ঞাপন, শ'ওয়ালেস-এর বিজ্ঞাপন, কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞাপন, বড় গল্প লেখা, কাগজের অফিসে রাত জেগে পাতা সাজানো, লেখা— মন দিই। ২২-২৪ বছর বয়সে যে-আনন্দ করা হয়নি— করার সময় পাইনি— তা করতে গিয়েছিলাম ৪০-৪১ বছর বয়সে। তেতাল্লিশেও।

শান্তি তখন মোটর সাইকেল চালাত। শীতকাল। রাত প্রায় একটা। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। খাওয়াদাওয়া করে মোটরবাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। প্রিয়ার সামনে রাস্তা খুঁড়ে রেখেছিল টেলিফোনের লোক। শান্তি ফুলস্পিডে উলটে পড়ল। কেউ কাছাকাছি নেই আমরা। রাস্তায় নিশুতি রাতে আড্ডা দেওয়া পাড়ার ছেলেরাই ওকে হাসপাতালে দিয়ে এল। পর দিন শুনে তো থমকে গেলাম। শান্তি বেঁচে ফিরল। ফিরে বলল, অত সহজে মরব না।

মাসিক কৃত্তিবাস যে-দিন বেরোত সে দিন খুব হইহই রইরই। এই কাগজ বের করা নিয়ে সুনীল একটা মিটিং ডেকেছিল ওর বাড়ির ছাদে। সবাই ছিলাম। গড়িয়াহাট ব্রিজের কাছে। মিটিংয়ে প্রায়ই খাওয়াটা বেশি হয়ে যেত।

একদিন সন্ধেবেলা গণেশদা বলল, আজ কাগজ বেরোবে। আমরা কাগজ কাঁধে নিয়ে রাস্তা দিয়ে গান গাইতে-গাইতে যাব।

গণেশদার ভেতর একটা প্রভাতফেরি ভাব ছিল। মাসিক কৃত্তিবাসকে ঘিরে এমন একটা গড়ে উঠেছিল— যা কিনা প্রায় সাহিত্যমনস্ক কমিউনের মতো। সেই দেড়-দু বছরে অনেক কিছু পেয়েছি। অনেক কিছু হারিয়েছি। ওখানে থাকতেই বুঝতে পারি, আমার জন্যে পথটা অন্য রকম। এ জন্যে কেউ দায়ী নয়। যে যার মতো গড়ে ওঠে। আমি এক আদলের। অন্য জন আরেক আদলের। তবু বলব, এ সব সত্ত্বেও সেই মাতন, সেই আনচান, সেই টান-ভালবাসা— আর তো কোথাও পেলাম না।

এখন তো অনেক কিছুই জুড়িয়ে এসেছে। এখন অনেক কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাই। মাসিক কৃত্তিবাস করতে গিয়ে মতের অমিল হয়েছে— ভালবাসার অমিল এক দিনের জন্যেও হয়নি। অভিমান হয়েছে। তা কখনও ক্রোধ হয়ে ওঠেনি। কার ওপর অভিমান! কীসের অভিমান? এখানে তো হাজার বছরের জন্যে থাকতে আসিনি। এখান থেকে তো একেবারে চলে যাব। যেমন চলে গিয়েছেন আমার আগে বহু-বহু জন। তাদের সব অভিমান রোদে ভাজা-ভাজা হয়ে কবেই উবে গেছে।

আমরা সবাই যে যার মতো করে অন্যকে চাই। কিন্তু সেই 'অন্য' কেন আমার ছাঁচে খাপ খাবে? তা তো কখনও হয় না। আমার আদলে অন্যের আদলে মিশ খাবে না। অথচ দল বেঁধে কিছু করতে গেলে— সে কৃত্তিবাসই হোক কিংবা কোনও ফুটবল টিমই হোক— আমরা সব কিছুকে— বন্ধুত্বকে নিজের আদলে মিশিয়ে ফেলতে চেষ্টা করি। আর এখানেই দুঃখের কারণ, অভিমানের কারণ লুকিয়ে থাকে। তুলো বা কাগজে আগুন লাগলে যেমন দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই আদলে— মনের ইচ্ছার সঙ্গে না-মিললে— বিচ্ছেদ, কষ্ট-পাওয়া দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়ে।

এ সব জিনিস অনেককে স্পর্শ করে, ভাবায়। অনেককে আবার স্পর্শই করে না। ভাবায় না। সব ভুলে গেছি প্রায়। কিছু মনে আছে— কষ্ট পেয়েছি! তবে এই অভিমান বা কষ্টের ওপরেও একটা কথা আছে। তা হল কৃত্তিবাস-কৃত্তিবাস খেলা খেলে কী হল? কিছু কি হয়েছে? একটা জিনিস হয়েছে বুঝতে পারি। জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে লিখি-লিখি করে কিছু লেখা হয়ে গেছে। আর হয়েছে, যাদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, বুড়ো হয়েছি— তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার ইচ্ছা বা তৃষ্ণা নেভেনি, বরং বেড়েছে। তেষ্টা বলাই ভাল।

শীতের বেশি রাতে কলকাতার রাস্তায় ধোঁয়াটে স্ট্রিটলাইটের ভেতর কুয়াশা দলা পাকিয়ে ঝুলছে। যেন লোকাল মেঘ। তার ভেতর ভাস্কর, আমি, সুনীল গড়পারে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছুটছি। জ্ঞান নেই ভাল করে। আবার.ভাস্করদের পারিবারিক বাড়ির এক তলায় অন্ধকার ঘরে নিশুতি রাতে বসে আছি। ভাস্কর বিলেত থেকে অনেক এনেছে। এ সব এই তো সে দিন। '৭৬-এর জানুয়ারির শেষ দিকটা। এখন এ সব তো আর হয় না।

কিংবা ১৯৬৫-র বর্ষা। সুনীল একগাদা প্রুফ নিয়ে লালবাজারের দিকে যাচ্ছে। প্যান্ট গুটিয়ে। তখন কৃত্তিবাস ওখানে ছাপা হত। সেই প্রুফের ভেতর আমার একটা গল্প ছিল। ছিল গিন্সবার্গের সেই কবিতা— যেটা মলাটে ছাপা হয়েছিল খুব সম্ভব। আমি ট্যাক্সি করে শেয়ালদা যাচ্ছি। ট্রেন ধরব। সন্ধেবেলা। এ সব ছবি বিঁধে আছে। নিজেকে খুব অপরাধী লেগেছিল সে দিন। সবার প্রুফের বোঝা বগলদাবা করে বর্ষার সন্ধ্যায় সুনীল একা চলেছে প্রেসে জল ভেঙে। আর আমি সন্ধে হলে চম্পাহাটি ফিরে চলেছি। যাবার সময়ে সুনীল ডেকে বলল, কৃত্তিবাসের এ সংখ্যার একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিস *দেশ*-এ।

দিয়েছিলাম। দিয়েও একটা না-মেটা তেষ্টা থেকে গিয়েছিল আমার ভেতরে-ভেতরে। না-মেশার তেষ্টা। মিশতে না-পারার তেষ্টা। এ ব্যাপারটা এ বারই শারদীয় *আজকাল*-এর কবিতায় সুনীল লিখেছে। ওর দিক থেকে। ঠিকই লিখেছে।

আমারও দোষ ছিল না। আমি তখন মজে আছি ধান করায়। কী করে ধান করে? বীজধান ভিজিয়ে অঙ্কুর করে বীজতলা বানানো। বীজ ভেঙে বীজ রোয়া। মাটি করা। ধানে থোড় আসা। গর্ভথোড় থেকে ধানের ছড়া বেরোনো। নিশুতিজ্যোৎস্নায় হলুদ হয়ে পেকে আসা ধানে টিয়ার ঝাঁক নেমে পড়া। বাঁজা গরুকে পাল খাইয়ে গাভীন করা। বর্ষায় ডুবে যাওয়া সাদা মাঠে মাছধরা। খাল ধরে ডোঙায় চড়ে ভেসে যাওয়া। মন কিন্তু পড়ে থাকত কৃত্তিবাসীদের সঙ্গে মিশতে যেতে না-পারার না-মেটা তেষ্টায়। যদিও তখন সাইকেল রিকশা ভাড়া করে ভগবান দেখতে যাই। পিচরাস্তা দিয়ে। গাইড একজন ঈশ্বরপ্রেমিক রিকশাঅলা।

সেই তৃষ্ণা মেটাতে যাই মাসিক কৃত্তিবাসের সময়। তখন পুরোদস্তুর আস্ত লোক হয়ে পড়েছি। চল্লিশ পার হয়ে গেছে। অথচ মনে হয়, বয়স মোটে বাইশ। পেছনে পড়ে আছে চম্পাহাটির জীবন। সেখানে মাছ ধরার জন্যে রাতে বসানো আইলে খাল থেকে কেউটে ধরা পড়েছে। খগেন গুণিন এসেছে কেউটেটাকে নিয়ে গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বারান্দায় অসাড় করে চিৎ করে দেখাবে— ওর বুকটা সাদা কেন? ফণায় কোথায় গোক্ষুরের ছাপ? আবার সাপুড়ে আশু বৈদ্য এসেছে— কেউটেটার বিষ জমে থাকলে সেটুকু নিঙড়ে নিয়ে যাবে হোমিওপ্যাথির শিশিতে— কোন কবিরাজকে বিক্রি করবে। ভরি তেইশ টাকা।

মাসিক কৃত্তিবাস করতে গিয়ে থিয়েটারের অসীম চক্রবর্তী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যমনস্ক শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, শ'ওয়ালেসের তখনকার সর্বেসর্বা মিস্টার হেওয়ার্ড (যার বাবার নামে হেওয়ার্ড বিয়ার, হুইস্কি)— অনেকেই এগিয়ে এসে সাহায্য করেছেন। সবার কথা মনে নেই।

মাসিক কৃত্তিবাস করতে গিয়ে গাঢ় ভালবাসা হয়েছে। মেশামিশি হয়েছে। আবার মতেও ভীষণ অমিল হয়েছে। তবু বলব— সব মিলিয়ে সে এক মধুর সময়। বিষাদ, আনন্দ— সবই নাকি আমাদের মনের ভেতর থাক দিয়ে সাজানো আছে। কোনও কিছুকে উপলক্ষ করে তা জেগে ওঠে। নয়তো বিষাদ, আনন্দ— দুই-ই আগে থেকে মনের ভেতর ছিল। কৃত্তিবাস উপলক্ষ মাত্র। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্র। জ্ঞান হয়ে গেলে শাস্ত্র মরে যায়। লেখার জন্যে কৃত্তিবাস। লেখা হয়ে গেছে। কৃত্তিবাস ঝরে গেছে।

আকাশবাণীর আসরে

কবিতা সিংহ

আমাব আকাশবাণীর কর্মজীবনের জন্মই হল আকাশবাণীর আড্ডার মধ্য দিয়ে। আমরা যদি আকাশবাণীকে আড্ডাবাণীও বলতাম তাহলেও সত্যের বিশেষ অপলাপ হত বলে মনে হয় না। তা বলে ভাববেন না যে আকাশবাণীতে কেবল আড্ডাই হয়। কাজকর্ম হয় না। একবার ভেবে দেখেছেন কি, যখন সারা দেশ জুড়ে হরতাল, ধর্মঘট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা ধরুন যুদ্ধ, কারফিউ, ব্ল্যাক-আউট— তখনও আকাশবাণীকে কি থেমে থাকতে দেখেছেন। যে করেই হোক বিপদ, আশঙ্কা, প্রাণভয় আর খুন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও আকাশবাণীর কর্মীরা কাজ চালিয়ে গেছেন। এভাবে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আকাশবাণী কলকাতার এককালের মধুকণ্ঠ-ঘোষক ইন্দু সাহার প্রাণ যায়। ইন্দু সাহা ও নীলিমা সান্যাল জুটির মতো, খুব কমই কণ্ঠ-ব্যক্তিত্বের জুটি আকাশবাণীতে এসেছিলেন।

এক সময় আকাশবাণীকে বলা হত আই.বি.সি, সেটা ছিল সাহেবদের আমলের ব্যাপার। সেই ত্রিশের দশকে। সাহেব পরিচালিত আই. বি. সি. বা ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস তখন সবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছে। লালমুখো সাহেব কর্তারাও এই আড্ডা রোধ করতে পারেননি। ফিলডেন সাহেব জহুরি ছিলেন, তিনি ঠিক জহর চিনেছিলেন নৃপেন মজুমদার মহাশয়কে। নৃপেনদা তথা নেপেনদা বা বড়বাবু এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। বড়বাবু ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ছেলে, ধরা। তিনি ঠিক খুঁজে খুঁজে প্রতিভাধরদের পাকড়ে পাকড়ে আনতেন। এখন আকাশবাণী চলে ধরা বাঁধা প্রোগ্রাম শিডিউলের দ্বারা। সুশৃঙ্খলায়। সেই শিডিউলের জন্মদাতা ছিলেন নৃপেন্দ্র মজুমদার। মূলত তিনি ক্লারিওনেট বাদক ছিলেন। কিন্তু মানুষকে আকৃষ্ট করার আর্ট তিনি জানতেন। জ্ঞানী ও গুণীদের খুঁজে বের করে প্রোগ্রামকে সমৃদ্ধ করার কলাকৌশলও তাঁর অজানা ছিল না। তাই ধীরে ধীরে আকর্ষিত হয়ে তাঁর

কাছে যাঁরা চলে এলেন আজকের দিনে তাঁরা ইতিহাসের নাম হয়ে গেছেন। যেমন হীরেন্দ্রনাথ বসু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বাণীকুমার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, সুরেশ চক্রবর্তী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি। আর এঁদের সাদর আহ্বানে আসতেন পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, নীরোদ. সি. চৌধুরী, এন. কে জি., নলিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি। দাদাঠাকুর ছিলেন এই আড্ডার ধূমকেতু জ্যোতিষ্ক। এলেই মাত।

শ্রদ্ধেয় পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আকাশবাণীর পুরনো দিনের অনেক শিল্পীর ফটোগ্রাফ ছিল। তিনি সেগুলো আমাকে দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছবি ছিল আশ্চর্য এক ঘটনার সাক্ষ্য হিসাবে। রেসের মাঠে যেমন ঘোড়ার রেস হত তেমনি চিত্ত-বিনোদনের জন্য গার্স্টিন প্লেসের আকাশবাণীতে কাঠের ঘোড়ার রেস হত। এই আলোকচিত্রে ছিল সেই ঘোড়ার রেসের দৃশ্য। লাওনেল ফিলডেন সাহেব আর তাঁর মেমসাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের পাশে সজনীকান্ত দাস এবং আরও কয়েকজন। তাঁরা নিচু হয়ে ছোট ছোট কাঠের ঘোড়ার রেস দেখছেন।

এঁদের আড্ডায় কখনও কখনও সেকালের কলকাতার শিল্প ও সাহিত্য, নাটক ও সিনেমা জগতের বহু নামী ব্যক্তিত্ব আকর্ষিত হয়ে চলে আসতেন। আর তখন স্বাধীন চিন্তা থেকে বহু মস্তিষ্কের বৈচিত্র থেকে তৈরি হয়ে উঠত এক একটি উজ্জ্বল বেতার অনুষ্ঠান। সেদিনের আকাশবাণীর চেহারা সর্বভারতীয় ছিল না। আজ যেমন ন্যাশনাল প্রোগ্রামের সঙ্গে লোকাল প্রোগ্রামের একটা সামঞ্জস্য করা হয় তেমন কোনও বহু অভিনিবেশের সুষ্ঠু পরিকল্পনা সেদিন ছিল না। কিন্তু প্রোগ্রামে ছিল একটা আকাঁড়া বাঙালিআনা। সেই বাঙালিআনার একটা বড় অংশই হল খোশগল্প। রসালাপ। এবং আড্ডা।

এই আড্ডায় থেকেই গান বাঁধতেন নজরুল। নতুন নাটকের মহড়া দিতে দিতে দিনরাত এক করে দিতেন বীরেনদা-বাণীকুমার। আর চলত পান আর চা। চা আর পান। চাপান-উতোর। উতোর-চাপান। বীরেনদার কাছে পুরনো কালের অনেক আড্ডার গল্প শুনেছি। সেই আড্ডার এক অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। বুড়োদা বলে খ্যাত। আর সাহিত্য-জগতে যিনি ছিলেন 'মহাস্থবির' ছদ্মনামে। মহাস্থবির জাতক নামক আশ্চর্য আত্মজৈবনিক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে। বীরেনদার কাছে এঁদের হাস্যরসের নানান কাহিনি শুনতাম। একবার বুড়োদা দলবল পরিবৃত হয়ে চিৎপুরের একটি ট্রামের সামনের দিকে আসনে সমাসীন হয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় পিছন থেকে একজন অতি উৎসাহীর উল্লসিত কণ্ঠ শোনা গেল।

আরে! বুড়োদা! রেডিয়ো থেকে বুঝি?

রেডিয়ো শব্দটি বিদ্যুৎ শকের মতো কাজ করল যাত্রীদের মনে। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে দেখতে লাগল। রেডিয়ো সে যুগে সিনেমার মতোই গ্ল্যামারাস ছিল। নতুন এই গণমাধ্যম নিয়ে সে যুগের বাঙালিদের জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়।

— বুড়োদা সেদিন সন্ধেবেলা আপনার সেই বেকার-নাশনের ওপর কথিকাটি চমৎকার হয়েছিল। অতি উপাদেয়।

প্রেমাঙ্কুর ঘাড় গুঁজে শুধু গম্ভীর স্বরে বললেন— হুঁ।

— বুড়োদা হরিমতীর কের্ত্তনটা পিসিমার খুব ভাল লেগেছিল। আর একবার ওনাকে আনবেন তো।

বুড়োদা আবার জলদখাদে বললেন— হুঁ।

— আচ্ছা বুড়োদা অহীন চৌধুরী কি সোজা থিয়েটার হল থেকে চলে আসেন শুক্কুরবারের নাটক থাকলে?

— বুড়োদা আমাকে একদিন স্টুডিয়োটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন?

সারা রাস্তা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এদিকে পরিমল গোস্বামী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার, মনমোহন ঘোষ এঁরা বুড়োদার দশা দেখে খুব মজা পাচ্ছেন। ট্রাম যখন কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া স্টপে এসে পৌঁছল তখন বুড়োদা উঠলেন। ঘুরে তাকালেন সেই অতি উৎসাহী লোকটির দিকে। ভিড় তখন বেড়েছে। যাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ। বুড়োদা বললেন, এই যে, মশাই, আপনার নামটা যেন কী?

আমার নাম বুড়োদা— আমার নাম হল, অমুক চন্দ্র অমুক।

ওঃ আচ্ছা! আচ্ছা!

বুড়োদার মুখে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বেশ চেঁচিয়ে স্পষ্ট স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে একটা কুখ্যাত যৌনরোগের নাম করে বললেন, আপনার শুনেছিলুম 'অমুক' রোগ হয়েছে, তা এখন রোগটা কেমন আছে?

কাজী নজরুল ইসলাম বলতেন— দে গরুর গা ধুইয়ে। তারপর বলতেন সুর হবে কী করে আমি যে বড় পানাসক্ত। পান না পেলে লাল নীল সুরের পরীরা আমার কাছে আসে না যে। আর চা।

— 'এত চা, ও পেয়ালাতে! পাষাণী আনল বলো কে?' একথা বলেছিলেন এক শিক্ষার্থিনীর মাকে পেয়ালা ভরা চা আনতে দেখে। সে শিক্ষার্থিনী আবার যে সে শিক্ষার্থিনী না! রাণু সোম। বিখ্যাত লেখিকা শ্রদ্ধেয়া প্রতিভা বসু। অনেকেই খবর

রাখেন না যে রাণু সোম নজরুল ইসলামের এক প্রিয় প্রতিভাময়ী ছাত্রী ছিলেন। অসামান্য ছিল তাঁর গায়কী।

প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে এসে বলি প্রতিভা বসুর সঙ্গে একটি আধ ঘন্টা ব্যাপী সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেছিলাম তাঁর বাড়িতে। নবনীতা দেবসেন সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর প্রতিভা বসুকে বিশেষ করে অনুরোধ করলাম তাঁর কোনও রেকর্ডের কণ্ঠ যদি থাকে তবে তা আমাদের ধার দিতে। প্রতিভা বসু বললেন, না-রে কবিতা, কিছুই আমার কাছে নেই। রাণু সোমের কণ্ঠ হারিয়ে যাবে একথা ভাবতেই কষ্ট হয়। তাই অনেক খুঁজে খুঁজে শিল্পী বন্ধু শোভন সোমকে অনুরোধ করলাম তাঁর রেকর্ডের সঞ্চয় ভাণ্ডার খুঁজে দেখতে। পাওয়াও গেল। প্রতিভা বসুকে এ খবরটা কিন্তু জানলাম না। অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে একটা জায়গায় টেপ থামিয়ে বললাম,— প্রতিভাদি, এ বছর আপনার বয়স ষাট বছর পূর্ণ হল। আজ আপনাকে উপহার দিই আপনারই গাওয়া একটি গানের অংশ। তারপর চালিয়ে দিলাম রেকর্ডটি।

আজ গিরীন চক্রবর্তী আর আমাদের মধ্যে নেই। মুকুন্দ দাস ও নজরুলের স্বদেশী গান তাঁর মতো প্রাণ দিয়ে খুব কম মানুষই গাইতে পারেন আজ। তিনি বলেছিলেন, তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন নজরুল। নজরুল কোমল মনের মানুষ ছিলেন। চট করে কাউকে ফেরাতে পারতেন না। কেবল বলতেন হবে! হবে! সব হবে। কণ্ঠ থাকলে গান তৈরি হবে। গান তৈরি হলে সুর বসবে আর গানে সুর লাগলে রেকর্ড হবে।

সুপ্রভা সরকারও আজ আমাদের মধ্যে নেই। তিনি বলেছিলেন ছেলেমানুষ মেয়ে। বারো-তেরো বছর বয়স। নজরুলের কাছে কোনও বেতার গীতি আলেখ্যর জন্য গান তুলতে এসেছি। কে একজন ঠাট্টা টিটকারি করে আমার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম দুঃখে। অপমানে। কিন্তু উনি তাকে বললেন, শোনো, বড় আমও আম। ছোট আমও আম— এ মেয়েকে কখনও অপমান কোরো না।

সেদিনের কলকাতা বেতারে বেশির ভাগ প্রোগ্রামই হত লাইভ। নজরুল ছোটদের আসরে লাইভ প্রোগ্রাম করতে এসেছেন। চশমা সঙ্গে নেই। বার বার আটকে যাচ্ছেন, আর হাসছেন। সেই হাসি, সেই আটকে যাওয়াও আমার মা দিদিমাদের ভাল লেগেছিল। অ্যানাউনসমেন্ট টেবিলেই আড্ডা চলত। আড্ডা দিতে দিতে নস্য নেওয়া বীরেন্দ্রকৃষ্ণের রীতিমত অভ্যাস। তাঁর নস্যি বর্ণের রুমালটি একবার পকেট থেকে বের করলেই আমরা সবাই হাসতে এবং হাঁচতে থাকতাম। কিন্তু আমরা তো বাঙালি নন্দিনী। নস্যের গন্ধ তবু আমাদের কিছুটা নাক সওয়া হলেও, তা যে বিলিতি মেমসাহেব খবর পড়তেন, তাঁর নাক সওয়া ছিল না। তিনি এসে খবর পড়তে গিয়ে

বীরেনদার পরিত্যক্ত নস্যর গুঁড়ো কখন যে নিশ্বাসের সঙ্গে নাক-সই করে ফেলেছিলেন। যেই 'ফেডার' তুলে বলেছেন, This is All India Radio, হিঁচ্চিস— The News হিঁচ্চিস। সেদিনের খবর ছিল— কেবল হিঁচ্চিস। হিঁচ্চিস আর হিঁচ্চিস।

সে যুগের আড্ডার কত গল্প যে শুনেছি। হীরেন বসু। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচয়িতা, অভিনেতা— আকাশবাণীর বহু নাটকে-কথিকায় অংশ নিতেন। সুর দিতেন বহু গানে। তিনি আড্ডায় আনতেন সিনেমার গল্প। আমরা একদিন আমাদের ঘরের আড্ডায় তাঁর কাছে দুটি চমৎকার সিনেমা সংক্রান্ত হাসির গল্প শুনেছিলাম। কানন দেবীর প্রথম চিত্রাবতরণ হয় 'ঋষির প্রেম' ছায়াছবিতে। ছবি তৈরি শেষ হয়ে যাবার পর, একটা গান জুড়ে দেবার কথা ভাবেন হীরেন বসু। গানটির চিত্রগ্রহণও হয়। ছবির মাঝখানে গানটি জুড়েও দেওয়া হয়।

ছবিটি রিলিজ করে সে যুগের রসা-থিয়েটার বা পূর্ণ সিনেমায়। যখন সেই নির্দিষ্ট দৃশ্যটি এল, তখন তো হীরেনবাবুর মাথায় হাত। তিনি দেখেন যে কানন দেবী উলটো অবস্থায় মানে নীচে মাথা ওপরে পা করে পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

বিখ্যাত লোক-কাহিনি 'মহুয়া'তে মহুয়া চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সে যুগের নৃত্যগীত পটিয়সী ছিপছিপে সুন্দরী মলিনা দেবী। এক গুহার মধ্যে হীরেন বসু ও মলিনা দেবী। মহুয়া আর তার প্রেমিক, একটি ময়াল সাপ গুহার ছাদ থেকে ঝুলে পড়বে, আর তাঁরা দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু ক্যামেরা যখন চালু হল মলিনা দেবী সেই ময়াল সাপ দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতেই ঢলে পড়লেন একেবারে। হীরেনবাবুই আমাদের গল্প করেছিলেন যে গার্স্টিন প্লেসে মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানের সময় একটি মাইক্রোফোন বুম্ করে দেওয়া হত জানালার বাইরে, একেবারে কবরখানায় অবস্থিত একটি মহীরুহের শাখাগুলির মধ্যে। ভোরের পাখির স্বাভাবিক প্রভাত বন্দনাকে সঙ্গে রেখে শুরু হত লাইভ মহালয়ার অনুষ্ঠান।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেদিনের ব্রিটিশ সরকার আকাশবাণীকে সরকারি সংস্থা করে গড়ে তুললেন। মাঝে একবার যখন ঘাটতির জন্য আকাশবাণী বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন কলকাতার অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যাঁদের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর-এর তুষারকান্তি ঘোষও অন্যতম ছিলেন, দিল্লিতে গিয়ে রীতিমত দরবার করে, আবার আকাশবাণী বন্ধ করার ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেন।

আকাশবাণী তখন ক্রমশ সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের চেহারা নিতে শুরু করেছে। সে সময় গেজেটেড পোস্ট ছিল প্রোগ্রাম অফিসারদের। যাঁরা পরে প্রোগ্রাম

একজিকিউটিভ নামে কথিত হন। এই প্রথম সারির প্রোগ্রাম একজিকিউটিভরাও আমাদের সৌভাগ্যবশত ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাশালী। এঁদের বেশির ভাগেরই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা। এঁদের মধ্যে আমি যাঁদের দেখেছি তাঁরা হলেন, বিখ্যাত চিত্রপরিচালক প্রভাত মুখার্জি, অভিনেতা বিকাশ রায়, অতুল মুখোপাধ্যায়, সবিতাকুমার মিত্র মুস্তাফি, বিমান ঘোষ, সরল গুহ, সন্তোষবিকাশ বড়ুয়া প্রমুখ। প্রোডিউসারদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি. জি. যোগ, গোপাল দাশগুপ্ত, দীপালি নাগ চৌধুরী, লীলা মজুমদার প্রমুখ। এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সম্মেলনেও যেমন কাজ হত তেমনই আড্ডাও জমত। আকাশবাণীর পঞ্চাশ বছর পূর্তির সময় এঁদের অনেকেরই স্মৃতিচারণ আমি রেকর্ডবদ্ধ করেছিলাম। স্মৃতিচারণগুলি ছিল আড্ডার মেজাজে। যেমন প্রভাত মুখার্জির দুটি স্মৃতিচারণ সংক্ষেপে বলি।

একবার দিল্লি আকাশবাণীতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তখন লাওনেল ফিলডেন দিল্লি আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেল। সে সময় একজন সারেঙ্গি বাদক ছিলেন বুন্দু খাঁ। লোকে বলে অমন সারেঙ্গি বাদক কখনও হয়নি, আর হবেও না। এক হাড় কাঁপানো শীতের রাতে ছিল বুন্দু খাঁর সারেঙ্গি বাদন। তা তিনি সারেঙ্গি বাদন শেষ করে ডিউটি-রুমে এলেন। সেদিন যাঁর ডিউটি ছিল তিনি এক গেজেটেড অফিসার ছিলেন। বুন্দু খাঁ নিজের চেকটি নেওয়ার পর ওই পদস্থ অফিসারকে বললেন, অতি সবিনয়ে— আচ্ছা সাব আজ আমাকে বাড়ি ফেরার জন্য একটি গাড়ি দিতে পারেন?

— গাড়ি? ভুরু উঁচু হয়ে উঠল অফিসারের।

— গাড়ি কী হবে?

— আজ্ঞে বড্ড শীত। আমার, আমার এই সারেঙ্গিটার ঠান্ডা লাগবে।

গাড়ি দেওয়া খুব মুশকিলের ব্যাপার ছিল না। বুন্দু খাঁর মতো শিল্পী গাড়ি চাইলে তো কখনওই নয়। কিন্তু ওই আর কি। একসেরি পাত্রয় তো দশ সের বুদ্ধি আঁটে না। তার উপর আবার গেজেটেড অফিসারের মার্কা মারা রয়েছে। বুন্দু খাঁ গাড়ি পেলেন না। তিনি নিজের গায়ের মোটা গরম চাদরটি দিয়ে তাঁর সারেঙ্গিকে ঢেকে ঢুকে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন প্রোগ্রাম মিটিংয়ে লাওনেল ফিলডেনকে দেখে সবাই ভাবল একটা রাগী নেকড়ে বাঘ যেন ছাড়া পেয়ে ডিরেক্টর জেনারেলের চেয়ারে বসে পড়েছে।

সেই গেজেটেড অফিসারকে ডাকলেন ফিলডেন সাহেব।

— কী হে, কী ব্যাপার তোমার?

— কেন? কেন স্যার?

— যা প্রশ্ন করছি জবাব দাও। ভারতবর্ষে কত গেজেটেড অফিসার আছে?

— শত শত স্যার, মানে হাজার হাজার—

— কটা বুন্দু খাঁ আছে?

— একজন স্যার। মাত্র একজন।

— তাহলে কাল সে গাড়ি পায়নি কেন? আকাশবাণী কি গেজেটেড অফিসারদের না শিল্পীদের?

আর একবার প্রভাত মুখার্জি ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিলেন। তখন ব্রিটিশ শাসন তুঙ্গে। আর গান্ধীজির প্রতিবাদও তুঙ্গে।

— কী ব্যাপার? হঠাৎ ক্যাজুয়াল লিভ?

— হ্যাঁ স্যার... মানে!

— ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে যদি কেউ গান্ধীকে দেখতে যায় তবে অবশ্য আমি তাকে লিভ দিতে পারি!

গান্ধীজিকে কাছ থেকে দেখার বাসনা মনে বহু দিন ধরেই ছিল। কিন্তু ফিলডেন সাহেবের অফিস কানুনের কড়াকড়িতেই ছুটি-ছাটা একদম নেওয়া যেত না।

পরদিন ফিলডেন সাহেবের কাছে ইঙ্গিত পাবার পর ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে গান্ধীজিকে দেখতে গেলেন প্রভাত মুখার্জি।

তিনি যখন গান্ধীজির ঘরে ঢুকছেন তখন, দেখলেন, লালমুখো লাওনেল ফিলডেন গান্ধীজির ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

এমনই যে কত গল্প শুনতাম বড়দের সঙ্গে বসে, আকাশবাণীর আড্ডায়।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে যিনি গান গেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সংগীত সম্রাজ্ঞী আঙুরবালা। আঙুরবালার কাছে শুনতাম বেতার প্রচার বা গ্রামোফোন রেকর্ড করা সম্বন্ধে তাঁদের প্রাথমিক ভীতির কথা। আঙুরবালা বলেছিলেন ছেলেবেলায় আমার মনে হত আমাদের বুঝি ভেঙে দুমড়ে ওই কলের গানের বাক্সের মধ্যে ভরে দেবে। তারপর পিষে পিষে গান বের করবে। সন্তোষবিকাশ বড়ুয়া ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি অনেক সময় সকালে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনাতেন। কিন্তু বন্ধুদের দুষ্টুমি যাবে কোথায়! লাইভ স্টুডিওতে সন্তোষবিকাশ বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করে যাচ্ছেন আর অন্যরা এসে ধীরে ধীরে তাঁর শার্ট, গেঞ্জি এমনকী প্যান্ট পর্যন্ত খুলে নিল। তাঁর থামবার বা অন্য শব্দ করার উপায় নেই। তাই তিনি হাত তুলে শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে বন্ধুদের সাহায্যই করে যেতে লাগলেন। এদিকে অবিরাম গ্রন্থ পাঠও চলছে। শেষে বন্ধুরা আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সন্তোষবিকাশ মুখস্থ রাখতেন বলেই প্রোগ্রাম শেষ করা সম্ভব হল। কিন্তু এ জন্যে কারও ওপর রাগ বা অফিসিয়াল অ্যাকশন নেওয়ার কথা এঁদের মনেই আসত না। ক্রমে এলেন উষা

ভট্টাচার্য, উমা চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পাঞ্জলি সেন প্রভৃতি অফিসার। আকাশবাণী জমজমাট হয়ে উঠল।

তাই বলছি এই আড্ডার মধ্যেই আমাদের জন্ম। আমাদের সময়েও এই আড্ডার ধারা অব্যাহত ছিল। বস্তুত এক সময় যুববাণীতে একটি অনুষ্ঠান রেখেছিলাম। তার নামই দিয়েছিলাম 'আড্ডা', ইংরেজিতে— চিট্-চ্যাট্। আমার কর্মজীবনের প্রথম দিকে মনে পড়ে আকাশবাণীতে দীপেন্দ্রকুমার সান্যালের সঙ্গে আড্ডা দেবার কথা। উনি যখন আসতেন তখন ওঁর বাবা বিখ্যাত প্রচারবিদ, সুধীরেন্দ্র সান্যালের আমলের মতো জমে উঠত আড্ডা। অচলপত্রের এই উজ্জ্বল সম্পাদক কথার পরে লাগসই কথার 'পান' করে লোককে 'রাগসই' করে দিতে পারতেন। একবার প্রায় ঘণ্টাখানেক ওঁকে বসিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম চা আসার অজুহাত ধরে। উনি একটার পর একটা মজার কথা বলে যাচ্ছেন আর আমরা উপভোগ করছি। শেষ পর্যন্ত 'চা' এল। কিন্তু সেদিন চা-টা ছিল অকথ্য তেতো। সান্যালমশাই এক চুমুক খেয়েই বললেন:

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা 'চা'ই-ই না।

চা-টা যে আদৌ চা-ই হয়নি একথা তিনি ছাড়া আর এমন করে কে বলতে পারতেন!

আর সুনীতিকুমার? শুরু করলেন যদি ঢাকা বিক্রমপুর নিয়ে শেষ করবেন যে কোথায়? হা ঈশ্বর তা আমরা কেউ জানতাম না। কিন্তু কত কিছু যে জানা হয়ে যেত এই কথা ও গল্পের সূত্র ধরে। সেই ব্রাহ্মসমাজের গলিতে তেলেভাজা খাচ্ছেন প্রশান্ত মহলানবীশের সঙ্গে। উপেন্দ্রকিশোরের গড়পাড়ের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন নতুন প্রিন্টিং ব্যবস্থা দেখতে। কোথা থেকে কোথায়। হঠাৎ হঠাৎ আমাদের আড্ডায় এসে পড়তেন পণ্ডিচেরী থেকে নলিনীকান্ত সরকার। তাঁরই প্রেরণায় জ্ঞানবাবু গেলেন পণ্ডিচেরী, রেকর্ডবদ্ধ হলেন সাহানা দেবী। মৃদুভাষী কবি অমিয় চক্রবর্তী আসতেন আমেরিকা থেকে আর তাঁর সাহেবি হোটেল থেকে বেরিয়ে একটাও ইংরেজি না মিশিয়ে বাংলা বলে যেতেন অনর্গল। পরিমল গোস্বামী এই আড্ডাতেই প্ল্যান দিয়েছিলেন— 'আমি বলছি, মরে যাবার পর'। অর্থাৎ বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাঞ্জলি না বাজিয়ে, মৃত্যু বিষয়ে বা মৃত্যুর পর তিনি যা বলতে চান তা বাজানো হবে। তবে এ প্রস্তাব নিয়ে কারও কাছে যাবার সাহস হয়নি আমাদের। আড্ডা দিতে দিতেই একদিন কেয়া চক্রবর্তীকে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হল চার চরিত্রের এক কাব্য নাটক। আর বহু দিন পরে লেখক বিমল মিত্রকে দিয়ে গাইয়ে নেওয়া হল গান। এমন কত যে ঘটনা কত গল্পের চেয়েও গল্প হয়ে থাকা অবিশ্বাস্যের স্মৃতি!

তবে আমাদের যাকে বলে ঘরোয়া আড্ডাও কম আকর্ষণীয় ছিল না। ঘরের আড্ডা মানে পেশা সংক্রান্ত আড্ডা। পেশা সংক্রান্ত আড্ডা পেশার লোকেরাই ভাল বোঝেন। এবং রস পান। ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায় যিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম গোল্ড মেডালিস্ট ও ওস্তাদ আমীর খানের প্রিয় শিষ্য, তিনি একবার এক বহুবার অডিশনে ব্যর্থ গায়কের হাত থেকে সংগীত বিভাগকে বাঁচিয়েছিলেন। বারবার অডিশনে অসফল হবার পরও সেই গায়ক ধরাধরি মাঝে মাঝে জোরাজোরিও ছাড়ে না। আড্ডায় এ কথা উঠতেই প্রদ্যুম্নবাবু তাকে ডাকলেন। বললেন, বাবু হে তুমি আমার সামনে রেকর্ড করো তো। আমি নিজে শুনি। লোকটি রেকর্ড করল। সেই ভয়ংকর গান শুনে প্রদ্যুম্নবাবু বললেন, এটি ভাল করে রেখে দিয়ে একটা খালি টেপ আনো। খালি টেপ বাজিয়ে শোনানো হল লোকটিকে। সে বলল, কই স্যার এতে আমার গান কোথায়? প্রদ্যুম্নবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন, গান? গান তো শোনা যাবে না। যাদের গলায় কিলোসাইক্ল থাকে না তাদের গান এই টেপে ওঠে না। তুমি এক কাজ করো, বেশ কিছুদিন মেগাসাইক্লিন ট্যাবলেট খাও। তারপর দেখা করো। আর একজন ছন্দহীন, ত্রুটিপূর্ণ ভাষায় যা হোক কিছু লিখে এনে বলত, স্যার আমার এই গানগুলি অ্যাপ্রুভ করে দিন। আড্ডায় এ সমস্যাও তোলা হল। প্রদ্যুম্নবাবু তাকে ডাকালেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, আপনার এ গানগুলো কিছু খারাপ হয়নি। তবে আপনি কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখে আনলে আমাদের অ্যাপ্রুভ করতে সুবিধে হয়। সরলবাবু আড্ডায় বসলেই মেয়েদের লক্ষ্য করে বাছাবাছা ব্যঙ্গ ছুড়তেন। একদিন ক্যান্টিন থেকে খেয়ে ওপরে এসে কাজে বসছি সরলবাবু আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ক্যান্টিনে ফোন করলেন, ক্যান্টিন! খাবার কি আছে?— আচ্ছা একটু আগে কি কবিতা ক্যান্টিনে গিয়েছিল, ও স্যরি! তাহলে থাক, তাহলে তো বলাই বাহুল্য সব খাবার শেষ।

তখন পুষ্প ব্যানার্জি ও আমি একই ঘরে বসতাম। পুষ্প ব্যানার্জি দূর্বা ব্যানার্জির দিদি। সত্যিই প্রস্ফুটিত ফুলের মতো সুন্দরী। একদিন সরলবাবু আমাকে ডেকে বললেন— এই শোন তোকে খুঁজতে একদল তরুণ কবি এসেছিল, আমি অবশ্য তাদের স্বপ্নভঙ্গ করিনি। পুষ্পকে দেখিয়ে বলেছি উনিই কবিতা সিংহ। উমাদি ছিলেন সরলবাবুর মতোই প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। একদিন উমাদি সরলবাবুকে বললেন, সরল তোমার ফোন এসেছে। ফোনটা ধরেই সরলবাবু বললেন, কে? লীলা কথা বলছ? না, না, যে ফোন ধরেছিল ও একটা সামান্য কাজ করে। প্রোগ্রাম সেক্রেটারি। মনে আছে উমাদি রাগে সরলবাবুর দিকে পেপার ওয়েট ছুড়ে দিয়েছিলেন। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের জাতীয় স্তরের বিশেষজ্ঞ বুলবুল সরকার। অমন আত্মভোলা কাজপাগল

মেয়ে আকাশবাণীতে কেউ ছিল না। চমৎকার বাংলা জানত বুলবুল। কিন্তু যেহেতু ওর পরিবেশ ও কাজ ইংরেজি নিয়ে ওকে সবাই ভুল বোঝাতেন। একদিন আড্ডায় ও বলেছে— সে কি কিম্ভুত কিমাকার ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ওকে ছি ছি করে ওঠেন। বাংলা বিশেষজ্ঞ সরলবাবু— বললেন, ছিঃ বুলবুল আকাশবাণীর মতো একটা কালচারাল অর্গানাইজেশনে তুমি বাংলা ভুল বলছ। ওটা কিম্ভুত কিমাকার হবে না, হবে কিম্ভুত কিমালাকার। বুলবুল তারপর বহু দিন কিম্ভুত কিমালাকার কথাটাই ঠিক বলে ধরে নিয়েছিল। আমাদের এক জাঁদরেল অফিসারের নাম ছিল সুদেব বসু। তিনি বুদ্ধদেব বসুর বৈমাত্রেয় ভাই। সুদেববাবুর কাছে প্রোপোজাল খাতা সই করানোর ভয়ে বুলবুল একবার চাকরিই ছেড়ে দিয়েছিল। এহেন সুদেববাবুর কাছে একবার আড্ডার নির্দেশে বুলবুলকে পাঠানো হয়। বুলবুল কোনও এক সীমান্ত রাজ্যের রাজপুত্রকে চিলড্রেন প্রোগ্রামে একবার বুক করেছিল। আড্ডায় সবাই বুলবুলকে বোঝাল যে ওই সীমান্ত রাজ্যের রাজপুত্রদের নিয়ম তাঁরা বাচ্চা হাতি চড়ে আসেন। এবং হাতির পিঠ থেকে নামেন না। সুতরাং হাতির পিঠ থেকেই তিনি ব্রডকাস্ট করবেন। আকাশবাণীর স্টুডিওতে ঢুকতে, বলাবাহুল্য গেটপাস লাগে। বুলবুল রাজপুত্রের গেটপাস করিয়েছিল। আবার তাকে হাতির গেটপাসের জন্য সুদেববাবুর কাছে খাতা পাঠাতে হয়। এবং তার ফল যা হয়েছিল তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এমন যে কত আড্ডা মজার জোকসে আমাদের কর্মজীবনে গভীর চাপের মধ্যেও আনন্দের ফোয়ারা খুলে দিয়ে গেছে তা ভাবতে গেলেও ভাবনার শেষ হয় না। আজও আমি বিশ্বাস করি আড্ডাও আমাদের কাজের একটা অংশ আর আড্ডাই যে কোনও গণমাধ্যমের বেঁচে থাকার প্রাণভ্রমর।

আড্ডার একটা ছোট্ট আসর বসত প্রোগ্রাম মিটিংয়ের পর। যার যার রেকর্ডিং বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত না, তারা চায়ের আসরে বসে খানিকটা আড্ডা দিয়ে সারা দিন সারা সন্ধ্যার জন্য শক্তি সংগ্রহ করে নিত। বিমানবাবু কিছুদিন লক্ষ্ণৌতে পোস্টেড ছিলেন। সেখানকার কোনও ব্যাপার নিয়ে তাঁকে খেপানো হত। বিমানবাবু লক্ষ্ণৌয়ের কথা উঠলেই খুব রেগে যেতেন। কিন্তু রাগলে কি হবে? আমাদের ছোটদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি একদিন বিমানবাবুর ঘরে। Closed Circuit-এ একটি গান তাঁকে শোনানো হয়েছিল। সে গান বেঁধেছিলেন সরলবাবু, সুর দিয়েছিলেন দীপালি নাগ। কে গেয়েছিলেন তা আর এখন আমার মনে নেই।

ব্যাচেলর বিমানবাবু সারাদিন অফিস করে তারপর যেতেন নানান ফাংশনে। বাড়ি ফিরতে মধ্যরাত হত। আবার সকাল নটায় হাজির। তাই মাঝে মাঝে ঢুলতেন। তিনি ঢুলতে ঢুলতে বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে কীভাবে কখনও নরম, কখনও গরম, কখনও

সম্ভ্রম, নানা সুরে কথা বলতেন সেটা মিমিক্রি করে দেখাতে হত আমাকে প্রায়ই। সবাই বলতেন, আর একবার দেখাও। আর একবার দেখাও। কিন্তু বিমানবাবু খুব রেগে যেতেন। একদিন টিফিনের সময় বিমানবাবু আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। বললেন, বসো। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি ভয়ে ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বিমানবাবু বললেন, এবার বলো, কী কী খাবে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? খামোখা খেতে যাব কেন?— বিমানবাবু বললেন- – কাটলেট? ওমলেট? চপ? রসগোল্লা? লুচি? আলুর দম? ডিমের ডালনা? চিকেন?

আমি বললাম— এত খাব কেন?

বিমানবাবু তার উত্তর না দিয়ে বললেন— কফি? এসপ্রেসো? যাই হোক খাবারদাবার এল। সদ্ব্যবহারও করলাম। কফিও খেলাম। তারপর বিমানবাবুকে বললাম, এবার বলুন ব্যাপারটা কী?

দ্যাখো তুমি সবাইকে ওই 'নকল'টা আর দেখাবে না।

আমি বললাম, পাগল? আর দেখাই!

দুঃখের বিষয় আমি কথা রাখিনি। পরদিনই প্রোগ্রাম মিটিংয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ওই নকলটা করে দেখাতে হল।

উষাদি আর বুলবুল সরকার তখন এক ঘরে বসতেন। ওঁরা যখন খেতেন তখনও লোক আসত। আসলে আকাশবাণীতে কোনও টিফিন টাইম বলে সে ভাবে ছিল না। যে যখন পারত একটু সময় বের করে নিত।

অন্তত খাবার সময় যাতে কেউ বিরক্ত না করে তাই ওঁরা দরজা বন্ধ করে বাইরে একটা ছোট্ট বোর্ড ঝুলিয়ে দিতেন। তাতে লেখা থাকত 'ইটিং টাইম'। আমি একদিন একটি বোর্ডে আঁকলাম একটি রোগা আর একটি মোটা মহিলা ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকাচ্ছেন। আর তাতে লিখে দিলাম 'স্লিপিং টাইম'। বুলবুল ও উষাদি দরজা খুলে ওই বোর্ড দেখে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছিল। উষাদি আমায় খুব ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন গভীর অন্তঃশায়ী স্রোতের মতো। হঠাৎ আমার জন্মদিনে আমাকে একটি সঞ্চয়িতা উপহার দিয়ে আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিলেন।

তারপর এল যুববাণীর পালা। যুববাণীর রূপরেখা তৈরি করার সময় অজস্র তরুণ ও তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটতে লাগল। আড্ডার চার যুগের এটিই তিন যুগ। নিউ ব্লাড জিনিসটা কী সেদিন বুঝলাম। আমাদের বাংলার যুবক যুবতীদের আমরা যা ভাবি তারা কিন্তু একেবারেই তা নয়। তাদের প্রকৃত রূপ দেখে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশাহত হবার কোনও কারণই নেই। আজকের সাংবাদিকতার নানান মাধ্যমে যারা তরুণ সাংবাদিক নামে বিখ্যাত তাঁদের মধ্যে অমিতাভ চক্রবর্তী,

গৌতম গুপ্ত, শ্যামল সান্যাল, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, নীলমণি দাশ এবং আরও যে কত চেনা নাম— এরা সবাই যুববাণীতে অনুষ্ঠান করেছেন। যোগব্রত চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ করে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অজয় সেন, ধূর্জটি চন্দ, রণজিৎ দাশ, নিশীথ ভড় প্রমুখ আজকের তরুণ সব কবি যুববাণীতে কবিতা পড়েছেন। অনেক ভবঘুরে ছেলে, অনেক ভ্রমণপাগল যুবা যুববাণীতে অনুষ্ঠান করেছেন। অনেক তরুণ নতুন নতুন পেশার ছেলেমেয়ে। মেয়েদের মধ্যেও সাংবাদিকতা, সাহিত্য প্রভৃতিতে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই অংশ নিয়েছেন। এদের নতুন চিন্তাধারায় আমি উপকৃত হয়েছি। আকাশবাণীর ভিতরে রয়েছে মুক্তির সুবাতাস। যুববাণী চার বছর দেখার পর পদোন্নতির জন্য ফিরে আসি স্বক্ষেত্রে। এবং সেখান থেকে কেন্দ্র অধিকর্তা হয়ে চলে যাই আকাশবাণী দ্বারভাঙায়। সেখানেও আড্ডা বসত, আসলে আড্ডার ভূত যার ঘাড়ে চাপে তার ঘাড় থেকে তা কখনওই নামে না।

আড্ডার অন্যরকম

বুদ্ধদেব গুহ

ছেলেবেলা থেকেই বাড়ির শাসন খুব কড়া ছিল বলে 'আড্ডা' বলতে যা বোঝায়, বিশেষ করে প্রাত্যহিক বা সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ জায়গায় আড্ডা দেওয়ার অবকাশ আমার বিশেষ হয়ইনি বলতে গেলে। আমার আড্ডা মুখ্যত ছিল নিজেরই সঙ্গে, নিজের ঘরে, নানা বিষয়ের বই-পত্র, গানের রেকর্ডের সঙ্গে।

বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়া বাবা পছন্দ করতেন না। বাড়িতে বসে খেলাধুলো করাও নয়। বলতেন, পুরুষমানুষ খেলতে হলে বাইরে গিয়ে খেলো। সত্যি কথাই বলছি যে, এই কারণেই আমি তাস চিনি না পর্যন্ত। একবার কলেজে পড়ার সময়ে সপ্তমীর দিনে রং-মিলানো শিখেছিলাম। তার পরই তাও ভুলে গেছি। যাঁরা তাস খেলেন তাঁরা আমাকে চিরদিনই ছোট চোখে দেখেন এই কারণে। আমিও অপ্রতিভ যে হই না তাও নয়। তবে তাস বা দাবা-পাশা খেলতে জানি না বলে তেমন দুঃখবোধ করি না কারণ আউট-ডোর গেমস বলতে যা বোঝায় তার প্রায় সবেতেই আমার কমবেশি অংশ ছিল। কৃতিত্ব ছিল না যদিও কোথাওই।

বুদ্ধিজীবীদের আড্ডা প্রায়শই যেখানে গড়ে ওঠে আমার আড্ডা সে রকম চায়ের দোকান বা কফি-হাউস বা পানশালাতে গড়ে ওঠেনি। সে কারণে কিছু ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়েছে বলে মনে করি। আড্ডা থেকে শুধু আনন্দই পাওয়া যায় না শেখাও যায় অনেক কিছু। তর্কশাস্ত্রে হাতেখড়িও অনেকের সেখানেই হয়। যাঁরা নামকরা ডিবেটার এবং উকিল-ব্যারিস্টারও হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের জিভের ধার আড্ডাতেই শানিয়ে তুলেছিলেন যে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

আমার আড্ডা বলতে টেনিস খেলার বন্ধুদের সঙ্গে পঞ্চাশের দশকে দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ এবং ষাটের দশকে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের আড্ডা। 'দক্ষিণী'র গানের এবং নাটকের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। পঞ্চাশের দশকের শেষে

'দক্ষিণী'র নাট্যবিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলাম আমি এবং তখন মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছোট গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে তা বিভিন্ন জায়গায় এবং রেডিওতে আমরা মঞ্চস্থ করেছি। সেই সময়কার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও রবীন্দ্রনাট্যের অভিনেতাদের সঙ্গে জোর আড্ডা মেরেছি নিজের পড়াশুনোর অশেষ ক্ষতি করে।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের বন্ধুদের সঙ্গেও আড্ডা মেরেছি অনেক। সপ্তাহে দু'দিন ময়দানে, বিশেষ করে রবিবারে। এবং বাৎসরিক ক্যাম্পে।

রাঁচির বাগাইচাটোলিতে একবার ক্যাম্প পড়েছিল। সেই দিনগুলির কথা ভোলবার নয়। সেই আড্ডায় আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল গৌতম মিত্র, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সহপাঠী যে এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল। তার জন্যে আমরা সকলেই গর্বিত। গৌতম বিয়ে করেছে নাট্যরসিকা দীপান্বিতা রায়ের সুন্দরী ছোট বোন উষসীকে।

রাইফেল ভালই ছুড়তাম বলে আমাদের একটি ছোট্ট দলকে বেছে নিয়েছিলেন কলকাতার কম্যান্ড্যান্ট। ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরের ফায়ারিং রেঞ্জে আমাদের নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হত পয়েন্ট টু টু রাইফেলে। রবিবারে রবিবারে সেনাবাহিনীর গাড়ি করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হত ব্যারাকপুরের রেঞ্জে। সেখানে সারা দিন পয়েন্ট থ্রি ও থ্রি রাইফেলে প্রায় দেড়শো রাউন্ড করে গুলি ছুড়তে হত, টার্গেট শুটিং, র‍্যাপিড শুটিং এবং কার্ড শুটিংয়ে। ন্যাশনাল রাইফেল শুটিং কমপিটিশন এবং ইন্টারন্যাশনাল কমপিটিশন আর্ল রবার্ট ক্যাডেট ট্রফিতে অংশগ্রহণের জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছিল আমাদের। শেষ পর্যন্ত যদিও আমার যাওয়া হয়নি। পরীক্ষা সামনে তাই যেতে দেননি বাবা। ফায়ারিংয়ের মধ্যে বিরতির সময় সেখানেও জোর আড্ডা হত। মাথার উপরে ব্যারাকপুর ফ্লাইং ক্লাবের বনাঞ্জা প্লেন উড়ত গুড়গুড় শব্দ করে।

তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের আর্টস, সায়ান্স এবং কমার্সের ভার্নাকুলার ক্লাস হত একই সঙ্গে। সেই সূত্রে অন্যান্য স্ট্রিমের বহু বন্ধু হয়েছিল। আমাদের সকলেরই কমন বন্ধু ছিল প্রেসিডেন্সির অনেকে। বিকেলবেলা লেকের পাশের একটি বিশেষ বেঞ্চে আমরা সমবেত হতাম কলেজ থেকে ফিরে। সাইকেল নিয়ে যেতাম এবং সন্ধের আগেই ফিরে আসতাম। যে সব বন্ধুরা রাত দশটা অবধি আড্ডা মারত এবং সদ্য কলেজে ভর্তি হয়ে সেই সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার অন্যতম প্রতীক সস্তার কাঁচি বা মেপোল বা ডোবি-স্কোয়ার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তাদের সাবালক হওয়ার ধ্বজা উড়িয়ে তা সেলিব্রেট করত তাদের মধ্যে অনেকেই রাত জেগে পড়ে অথবা অতি অল্প সময় পড়ে ক্লাসের পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট

করত। যে সব ছেলে প্রচণ্ড আড্ডাবাজ তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অত্যন্ত মেধাবী ছিল। আড্ডাবাজদের মধ্যে স্বল্প ক'জনকে আড্ডাই খেত। তাদের মধ্যে বেশিই পরবর্তী জীবনে হারিয়ে গেছে অথচ তারা প্রত্যেকেই চমৎকার স্বভাবের দারুণ বন্ধু ছিল আমাদের। আড্ডার যেমন অনেক গুণ, তেমন কখনও কখনও চোরাবালিরই মতো তা মানুষকে টেনেও নেয়। আর ফিরিয়ে দেয় না।

পার্ক স্ট্রিট আর ওয়েলেসলি স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি, সেকেন্ডারি বোর্ডের অফিসের পরে যে নতুন (উনিশশো বাহান্নতে নতুন) বিল্ডিং কমপ্লেক্স হয়েছিল তাতে একটি রেস্তোরাঁ ছিল। দোতলাতে। ক্লাসের ফাঁকে আমরা ক'জন সেখানে আড্ডা মারতে যেতাম। কারণ কলেজ ক্যান্টিনে ফাদার স্কেফার্স-এর বড়ই দৌরাত্ম্য ছিল। সময় পেরিয়ে গেলেই উনি এসে দু'হাতে তালি বাজিয়ে ছেলেদের নাম ধরে ধরে বলতেন 'ওয়েল, এনাফ ইজ এনাফ। নাউ গো ট্যু ইওর ক্লাসেস।'

সেই চমৎকার ছিমছাম রেস্তোরাঁটিতে আড্ডা অনেকদিনই চলতে পারত যদি না গৌতম (মিত্র) আর রজত (রায়চৌধুরী) সে রেস্তোরাঁ তুলে না দিত। আমরা সকলেই খেতাম এক কাপ করে চা আর একটা করে শিঙারা। বেয়ারা আমাদের চা শিঙারা দিয়ে একতলাতে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্জন রেস্তোরাঁয় টম্যাটো কেচাপ-এর শিশিটির ছিপি খুলে রজত কোকাকোলা খাবার মতো ঢকঢক করে বোতল খালি করে দিত। আর গৌতম, সুগার-পট থেকে চামচে করে চিনি তুলে তুলে চরণামৃত খাওয়ার মতো কায়দায় সমস্ত চিনি খেয়ে ফেলত। বার বার বলত 'এনার্জি দেয়। চিনিই এনার্জি।'

তখন যদি জানতাম যে গৌতম পরে আর্মির জেনারেল হবে তবে আমরা অনেকেই চিনি খেয়ে এনার্জি বাড়াতাম।

আমাদের আর একটা আড্ডা ছিল 'ম্যাগনোলিয়া'তে পার্ক স্ট্রিটে। তখন আমরা কমার্স স্ট্রিমের ছেলেরা সকালে ক্লাস করছি। বি-কম-এ উঠেছি। আমাদের সময়ই প্রথম সকালের কোর্স চালু হয়েছিল বোধহয়— সেন্ট জেভিয়ার্সে। উনিশশো চুয়ান্নতে। হয়তো তার এক বছর আগেও হয়ে থাকতে পারে। ঠিক মনে নেই। ম্যাগনোলিয়ার আড্ডায় অন্য স্ট্রিমের ছেলেরাও ক্লাস কেটে আসত। আমাদের ক্লাস যখন শেষ হত ওদের ক্লাস তার কিছু পরে বা সমসময়ে আরম্ভ হত। ম্যাগনোলিয়াতে খেতাম আমরা শুধুমাত্র এক কাপ করে কফি।

একদিন দাম দেওয়ার সময়ে দেখা গেল যে সেদিন থেকেই কফির দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সকলের ট্যাঁকের পয়সা, (ট্রামভাড়া বাদ দিয়ে) একত্রিত করলেও সব-কাপ কফির দাম দেওয়ার মতো যথেষ্ট পয়সা হচ্ছে না। তখন ঠিক

হল সেদিন সকলেই বরং ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে করেই ফিরব। সকলেই দক্ষিণের বাসিন্দা। একই দিকে যাবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি করে বেঁকে বসল আমাদের বন্ধু শম্পু। ক্রিকেটার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান পি সেনের (খোকন সেনের) ছোট ভাই। ওরা প্রচণ্ড বড়লোক। আলিপুরের নিউ রোডে বাড়ি। শম্পুর ইন্টারমিডিয়েট পাস করা (এবং তার খুড়তুতো বোনেরও) সেলিব্রেট করতে ওদের বাড়িতে যে পার্টি হয়েছিল তাতে শ্যাম্পেনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। এবং মেয়েদের সিগারেট খেতে জীবনে সেই প্রথমবার দেখেছিলাম। উনিশশো চুয়ান্নতে বেশি বাঙালি বা ভারতীয় মহিলা সিগারেট খেতেন না। শ' দেড়েক গাড়ি এসেছিল। এবং তখনকার কলকাতায় যার তার গাড়িও ছিল না। যাকে বলে, 'ঝিং-চ্যাক' ব্যাপার। যদিও আমরা কেউই মদ্যপান করতাম না। এমনকী বিয়ারও নয়, তাই আমাদের চোখে মহিলাদের মদ্যপান এবং সিগারেট খাওয়াটা অনির্বচনীয় দৃশ্য বলে মনে হয়েছিল। সিগারেট খাওয়াটাই আমাদের নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট সাহসিক কর্ম বলে গণ্য হত। তার মধ্যে আমার মতো দু-একজন অসমসাহসিক হয়ে পাইপ খেতে শুরু করলাম। গুরুজনদের দূর থেকে দেখে ফেললে আগুন সুদ্ধু পাইপ পকেটে ঢুকিয়ে দিতাম। ফলে, একবার বাম উরু এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে তিন মাস লেগেছিল সেই ক্ষত শুকোতে।

শম্পুর কথাতে ফিরে আসা যাক। 'ম্যাগনোলিয়া'র পয়সা মিটিয়ে বেরোনোর পর শম্পু নাক কুঁচকে বলল, 'ট্রাভেলিং সেকেন্ড ক্লাস! আনথিংকেবল। হোয়াট ডু উ্য থিংক অফ মি?'

শম্পু কিন্তু খুব ভাল ছেলে ছিল। আমাদের খুব ভাল বন্ধুও। কিন্তু এ রকম কিছু কিছু ছেলেমানুষি ছিল ওর মধ্যে।

অতএব আমরা শম্পুকে ট্রামের ফার্স্ট-ক্লাসে চড়িয়ে দিয়ে হাত নেড়ে, কারণ শম্পু একা ফার্স্ট ক্লাসে চড়ায় আমাদের মধ্যে একজনের সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়াও কম পড়ে গেল, সকালে আড্ডা মারতে মারতে হেঁটে হেঁটে এলাম কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। এলগিন রোডের মোড়ে। ওঁর শ্যালক অমিতাভ ব্যানার্জি আমাদের সহপাঠী ছিল। সে এখন বার্নপুরে। তার সুন্দরী স্ত্রী ঋতা ছবি আঁকে।

অমিতাভ টাকা ধার করে নিয়ে এল জামাইবাবুর কাছ থেকে। আমরা সবাই এলগিন রোডের মোড় থেকে আবার ট্রাম চড়ে যে যার গন্তব্যে গেলাম। আমি চৌরঙ্গির দিকে, অফিসে। ওরা দক্ষিণে। পার্ক স্ট্রিট থেকে এলগিন রোড অবধি না হেঁটে উত্তরে হাঁটলে ততক্ষণে অফিসেই পৌঁছে যেতাম। কিন্তু আড্ডার মায়া কি ছাড়া যায়!

পরদিন শম্পু এসে প্রফ্যুস অ্যাপোলজি চাইল। আমাদের প্রত্যেকের কাছে বলল, 'আই অ্যাক্টেড লাইক আ সিলি ফুল। মা কাল আমাকে দুপুরে না খাইয়ে রেখেছিলেন সব শুনে। বলেছিলেন, 'ইউ আর আ শেম টু দ্যা ফ্যামিলি।'

গাড়ি চালানো সবে শিখেছি। তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। বাবার লেফ্‌ট-হ্যান্ড ড্রাইভ ওপেল কাপিতান সাদা গাড়িটি নিয়ে কলেজে এসেছি। ওই বয়সে একটু কাপ্তানি করতে কারই না শখ যায়।

এসেছিলাম ভালয় ভালয়। কলেজ ছুটির পর গাড়ি ভর্তি বন্ধুদের নিয়ে গড়ের মাঠে যাব বলে কলেজ থেকে ডাঁটের মাথায় বেরিয়ে যেই পার্ক স্ট্রিটে নামতে যাব দেখি ঝড়ের বেগে একটি প্রকাণ্ড স্টুডিবেকার কম্যান্ডার গাড়ি বাঁ দিক থেকে আসছে। ভয়ের চোটে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঁ দিকে না মোড় নিয়ে আমি ডান দিকে স্টিয়ারিং কাটিয়ে দিলাম। গাড়িতে সঞ্জয় ছিল। সঞ্জয় ভট্টাচার্যি। এখন সে কানাডাতে। ও খুব ভাল গাড়ি চালাত। ও বলল 'সকলের প্রাণ বিপন্ন কোরো না খোকা। দাঁড় করাও গাড়ি বাঁ দিক ঘেঁষে। তুমি না হয় একটি ফালতু। আমার জীবনে কিছু অ্যাম্বিশান আছে।' দাঁড় করালাম গাড়ি। সঞ্জয় স্টিয়ারিংয়ে বসে গাড়ি ঘুরিয়ে দারুণ স্পিডে গড়ের মাঠে এল। আমরা সবাই সেখানে নামতেই সঞ্জয় বলল, বেড়ে গাড়িখানা রে। বাবার ঢাউস ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে মোটে সুখ নেই। জার্মান জাতের ব্যাপারই আলাদা। আমি চললাম বাড়ি এই গাড়ি নিয়ে।

বলেই, সত্যি সত্যিই জোরে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। আমি কিছুটা পথ ওর অথবা আমার বাবার অকৃতজ্ঞ গাড়ির পিছনে দৌড়লাম। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে আড্ডায় বসলাম।

গৌতম বলল, কি রে। তুই কি কেঁদে ফেলবি নাকি? দেখিস ও ময়দানের পাশে দু-চার চক্কর মেরেই ফিরে আসবে। কিন্তু আমরা দু-ঘন্টা আড্ডা মারলাম। অনেক চিনাবাদাম ও ঝালমুড়ি খেলাম। সন্ধেও হয়ে এল কিন্তু সঞ্জয় ফিরল না।

সঞ্জয় থাকত হাওড়াতে। একবারই নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। ওর বাবা বার্ন কোম্পানির খুব বড় সাহেব ছিলেন। লেখিকা লীলা মজুমদার সঞ্জয়ের পিসি হতেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে সঞ্জয়দের পুরো বাড়িটাই প্রায় এয়ার-কন্ডিশান্ড ছিল। আজকের কথা নয়। কিন্তু তাতে আমার লাভ কি। আমার কিছুই যায় আসে না তাতে। এখন না পারছি বাড়ি ফিরতে গাড়ি ছাড়া, না কোনও বুদ্ধি আসছে মাথায়।

বাড়িতে ফিরতেই হল। বন্ধুরা ডোন্ট ওয়ারি টোয়ারি বলে তো সি অফ করল আমাকে। বাড়ি ফিরেই সঞ্জয়ের ফোন পেলাম। বলল, পনেরো মিনিটের মধ্যেই তোর বাড়ি আসছি। মেসোমশায়কে বলবি গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তোর

তালেবর বন্ধু ঠিকঠাক করে নিয়ে আসছে। তুই গুডি গুডি ছেলে আগে এসেছিস পাছে মা-বাবা চিন্তা করেন।

বাবা তখনও ফেরেননি ভাগ্যিস। সঞ্জয় এল। পেছনে পেছনে একটি শোফার-ড্রিভন ফোর্ড। গাড়ি গারাজ করেই বলল, কেটে পড়ি। মেসোমশাই এসে গেলে কেলো হবে।

বন্ধুত্ব বা আড্ডার মূল উপাদান হল সময়। যেহেতু আমাকে বি কম-এর ক্লাস করতে করতেই অফিস করতে হত আর্টিকেল্‌ড-ক্লার্ক হিসেবে এবং বি কম পাস করার পর ল'ক্লাস করতে হত ইউনিভার্সিটিতে, উদ্বৃত্ত সময় আমার একেবারেই ছিল না। পুরোপুরি অফিসে ঢোকার পর তো সপ্তাহে ছ' দিন সকাল ন'টা থেকে রাত আটটা-নটা অবধি কাজ করতে হত। যে ক'জন বন্ধু বা ছিল তারা সকলেই একে একে সরে গেল। অনেকেই অভিমান করে। বাকিরা ভুল বুঝে। তবে বন্ধুত্ব একমাত্র বজায় ছিল দীপকের সঙ্গে। দীপক চক্রবর্তী। ও আর্টসের ছাত্র ছিল। শিলচর কলেজে ইংরেজির লেকচারার হয়ে চলে গিয়েছিল। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে কিছু দিন এখানে ওখানে কাজ করে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়।

দীপকের সঙ্গেই একমাত্র যোগাযোগ ছিল এবং মাসে এক-দু'দিন দুজনে মিলে কত আড্ডাই যে মেরেছি তা বলার নয়। দীপক যত দিন অবিবাহিত ছিল তত দিন আড্ডায় কোনও ঘাটতি পড়েনি। মাঝে মাঝেই গাড়ি নিয়ে দীপককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম কয়েক দিনের জন্যে পুরোপুরি নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কখনও বিহার, কখনও ওড়িশায়। এবং যে ক'দিন থাকতাম শুধুমাত্র ঘুমোনোর সময় ছাড়া আড্ডায় কোনও যতি ছিল না। দীপকও পরে সংসারের ঝামেলাতে পড়ল। বাইরে বাইরেও থাকল অনেক দিন বদলি হয়ে।

কয়েক বছর হল লেখার চাপের কারণে দীপকের সঙ্গেও আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। সত্যিই আর আমার জীবনে কোনও সময় নেই অফিসের কাজ আর লেখার কাজের পর কাউকেই দেবার মতো। সংসারে প্রত্যেকটি জিনিসেরই গায়ে একটি বিশেষ মূল্য বাঁধা থাকে। লেখক হতে গিয়ে আমাকে যে অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছে তা আমিই জানি আর ঈশ্বরই জানেন। লেখক হয়েছি কি না তাও অবশ্য জানি না। লেখালেখি করলেই তো আর লেখক হওয়া যায় না।

তবে যতটুকু আড্ডা আমি মেরেছি তার বেশিটুকুই শিকারের বন্ধুদের সঙ্গে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। হাজারিবাগে (শহরে) আমার বন্ধু মিহির সেনদের (গোপাল সেন) ছবির মতো সুন্দর বাড়ি ছিল অতি নির্জন পরিবেশে গয়া রোডের উপরে। তখন সে রাস্তার নাম বড়হি রোড। মিহিরের বাড়িতে তখন বছরে

তিন-চারবার যেতাম। মিহির ছিল বহু গুণের অধিকারী। অমন রসিক মানুষ কমই হয়। অমন সৌন্দর্যজ্ঞানী, অমন সঙ্গীতরসিক, অমন বাগান-বিলাসী, রন্ধন-পটু, ভাল শিকারি ও মার্কসম্যান এক শরীরে কমই দেখা যায়; তাছাড়া মিহির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টও বটে।

হাজারিবাগ বাজারের মধ্যে জুতো আর বন্দুকের দোকান ছিল মহম্মদ নাজিমের—'বেঙ্গল ফ্যান্সি স্টোরস'। নাজিম সাহেবের সেই দোকানে বসে আমাদের যে কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষার দুপুর রাত বে-হোঁশ আড্ডায় কেটেছে তা বলার নয়।

হাজারিবাগেরই ছেলে সুব্রত চ্যাটার্জিও শিকার উপলক্ষেই আমার বন্ধু হয়ে ওঠে। সুব্রতর বাবা ছিলেন হাজারিবাগ জেলার এস পি। পরে রিটায়ার করে ওখানেই ক্যানারি হিল রোডে বাড়ি কিনে থাকতেন। সুব্রত এখন কলকাতাতেই আছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস-এর একজন বড় সাহেব।

নাজিম সাহেবের দোকানে এক মৌলবী সাহেব আসতেন। মোরগার যম। শামীম মিঞা, টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক এবং আরও কত লোক যে আসতেন মিছিল করে। কেউ সাইকেলে, কেউ সাইকেল রিকশায় কেউ বা গাড়িতে।

মাঝে মাঝে মিহিরের বন্ধু এবং সেই সূত্রে আমারও বন্ধু সেতারি দেবু চৌধুরীও আসত হাজারিবাগে। এখন দেবু দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিভাগের মাথা। মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিল দেবু। বড় ভক্তি ছিল গুরুর প্রতি। বর্ষার রাতে খিচুড়ি খেয়ে সারা রাত দেবুর দরবারি কানাড়া এবং অন্যান্য রাগ শুনতাম শুধু আমি আর মিহির।

বাইরের মোরব্বা বনে ফিস ফিস ফিস করে বৃষ্টি পড়ত। জোরে শব্দ করে ভেজা-পথে টায়ারের প্যাচ প্যাচ আওয়াজ তুলে ঝোড়ো হাওয়ারই মতো চলে যেত দূরপথের যাত্রী কোনও ট্রাক। তখন সর্বত্রই মানুষ কম ছিল, যানবাহন কম ছিল, নির্জনতা, এবং প্রকৃতি নির্বিঘ্ন ছিল।

নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা মারার সেই সব দিনগুলি আর ফিরে আসবে না এ জীবনে। এই বয়সের নানাবিধ বিপদের মুখে 'জান-কবুল' করা, উষ্ণ, আন্তরিক, নিঃস্বার্থ, স্নিগ্ধ বন্ধুত্বও আর পাব না এ জীবনে। নাজিম সাহেব নেই, ইজাহার আগেই গেছে, আমরাও অত্যধিক পরিশ্রম আর টেনশনে ক্ষয়ে যাচ্ছি দ্রুত। আড্ডা এখন থাকবে শুধুমাত্র স্মৃতিতেই। যতদিন স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়।

শিকারের আড্ডাতে আমার বাবা, কাকা, বাবার বিভিন্ন বন্ধুরাও শামিল থাকতেন। বাবা বলতেন 'শিকারের সবই ভাল, শুধু মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া।' মদ ও মেয়েমানুষের সঙ্গে শিকারকে আমরা কখনওই মিশিয়ে ফেলিনি। শিকার করতাম

বলেই আমরা দেশকে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যন্ত ও দুর্গম প্রদেশের অতি সাধারণ মানুষজনকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁদের প্রতি মমত্ববোধ, সহমর্মিতা, যা কিছুই জাগার শিকারের 'বাহানাতে' তাদের কাছে যেতে পেরে তা গড়ে উঠেছিল তিল তিল করে।

সুন্দরবনে দিনের পর দিন মোটারাইজড বোটের উপরে বাবার বন্ধুস্থানীয় গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী মহাশয়, শিলিগুড়ির দুর্গা রায় মহাশয়, ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস কোম্পানির প্রশান্ত বিশ্বাস এবং অনন্ত বিশ্বাস মহাশয়দের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের কত রাজা-মহারাজা সাহেব-সুবোদের সঙ্গে মেশবার ও আড্ডা মারার যে অখণ্ড অবসর হয়েছিল তা মনে করলেও মন দ্রব হয়ে ওঠে।

গোপেনবাবু এবং প্রশান্তকাকু চলে গেছেন। চলে গেছেন জনসন সাহেব (কেনেথ এডওয়ার্ড জনসন) ক্রিসমাসের রাতে 'টু দ্যা হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ডস'। তবু স্মৃতি রয়ে গেছে। বাবা এখন অশক্ত, অসুস্থ, দুর্গা রায় মহাশয়ের শরীরও ভাল নেই।

শিকারের চেয়ে, বন-জঙ্গলের মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রার রকম ও প্রকৃতি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা চিরদিনই আমার কাছে বড় ছিল। শিকারের সার মর্ম ও সার কথা অনেকেই জানেন না, এবং কেন যে সব রকম বন্যপ্রাণী ও বনসংরক্ষণের প্রয়োজন হঠাৎ এমন জরুরি ও তীব্র হয়ে উঠল তার কারণের শব ব্যবচ্ছেদও কম লোকেই করেছেন। এক ধরনের আর্মচেয়ার কনসার্ভেশনিস্টদের মধ্যে উৎসাহের আধিক্য ও সর্বজ্ঞভাবের যে প্রাচুর্য দেখি তাতে আমার এমার্সনের সেই পঙ্‌ক্তি ক'টির কথাই বার বার মনে পড়ে যায়।

"Bold as the Engineer who feels the wood/love not the flower they pluck and know it not/and all their Botany is latin names."

নানা অগম্য বনের অগণ্য মানুষের সঙ্গে না মিশলে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অসংখ্য শিকারিদের সঙ্গে না মিশলে যেটুকু সামান্য জেনেছি তাও হয়তো জানা হত না।

কনসার্ভেশানের সঙ্গে শিকারের কোনও দিনই কোনও বিরোধ ছিল না। ইংরেজদের সময়ে তো এই অবস্থা হয়নি? তাই অধুনা যাঁরা কনসার্ভেশানের উপরে নিজেদের 'অথরিটি' বলে মনে করছেন তাঁদের স্থির হয়ে বসে একটু ভাবতে বলি। ঘৃণা করার আগে ভালবাসতেও বলি।

আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক প্রফেসার পি লাল (উনি আমাদের ক্লাস নিয়েই তাঁর অধ্যাপনার জীবন শুরু করেন) একবার বলেছিলেন: **"It is always better to hide your ignorance than to show your knowledge".**

আমি অতি অল্পই জানি তাই সব সময়ে সভয়ে সচেতন নিজের অজ্ঞতাকে লুকিয়ে রাখি সর্বজ্ঞ হলে নিশ্চয়ই সদম্ভে নিজের বক্তব্যকেই একমাত্র এবং সন্দেহাতীত বক্তব্য বলে মনে করতাম।

শিকারের আড্ডার আর একটি জায়গা ছিল আমাদের ডালটনগঞ্জের মুকুন্দলাল বিশ্বাসের বাড়ি— উনি ছিলেন বিখ্যাত মোহন বিশ্বাসের বাবা। আমরা যখন পালামৌ বনে-পাহাড়ে পারমিট নিয়েই শিকার করেছি তখনকার পালামৌ এখনকার পালামৌর মতো ছিল না। বেতলা ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। একটি ফরেস্ট বাংলো ছিল। রাস্তা ডালটনগঞ্জের আগে এগারো মাইল থেকে পুরোটাই কাঁচা ছিল। বারোয়াডিতে রেললাইন বসছিল তখন। বেতলা থেকে চিপাদোহর যেতেই মনে হত, 'মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ'। গাড়ু, মারুমার, মহুয়াডাঁর, রুদ, কুমান্ডি— ওই সমস্ত ব্লকেই যেতে হত গ্রীষ্মে-শীতে ধূলিধূসরিত জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পথ বেয়ে। মোহনদের বাড়িতে যে কে যাননি কলকাতার তার হিসেব করতে বসলে মুশকিলে পড়তে হবে। দুই পুরুষের অমন আতিথেয়তা, অমন সহৃদয়তা, অমন প্রাণখোলা হাসি কোনও আড্ডাতেই মেলা কঠিন। আর তেমনই ছিলেন মুকুন্দবাবু এবং মোহনের সঙ্গী-সাথিরা। তাঁদের একজনকে নিয়েই তিন খণ্ড উপন্যাস লেখা যায়। এমন সব ইন্টারেস্টিং মানুষ নইলে আড্ডা মেরে মজাই বা কি!

সুন্দরবনে বা হাজারিবাগের নাজিম সাহেবের দোকান অথবা বাড়িতে কী মিহিরের বাড়িতে কী ডালটনগঞ্জে মোহনের বাড়িতে আড্ডার অন্য নাম ছিল 'Moveable Feast'। কত রকমের বিরিয়ানি, কত রকমের কাবাব, বাখরখানি রোটি, হালুয়া, অগণ্য জাতের বন্য জন্তু এবং বনের ও জলের নানা রকম পাখির দিলচিসপি পদ, শীতের রাতে ছাতুর লিট্টি, গরমের দিনে ল্যাংড়া ও নানা রকম মনপসন্দ আম, রূহ্-অফজা শরবত, ইত্বরদান ভর্তি জৌনপুর আর গাজিয়াবাদ আর শ্রীনগরের ইত্বর। সেই সব দিনের প্রাচুর্য, উচ্ছ্বাস, মালিন্যহীন প্রীতি এবং অনাবিল হাসির ফোয়ারা স্মৃতিতে চিরদিনই অম্লান থাকবে।

ওড়িশাতেও আমার আড্ডার মস্ত এক '*ঠেক*' ছিল। শিকারকে ঘিরেই। তা হল মৃগাঙ্কমোহন সুরের সহোদর নরেন্দ্রনাথ সুরের বাড়ি। কটকের কটক-চণ্ডী রোডে। নরেনবাবুর দুই পুত্র ফুটুদা (প্রভাত) এবং হোঁদল (অশোক) এবং তাঁদের বন্ধু চাঁদুবাবু (সমরেন্দ্র দে)। এঁদের সঙ্গে এবং নরেনবাবুর জামাই (ওড়িয়াতে জুঁইবাবু) ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মসের অনন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে ওড়িশার কোন প্রান্তে যে যাইনি এবং থাকিনি গিয়ে তা মনে করাই মুশকিল।

ফুটুদা স্বল্পবাক। কিন্তু যে কোনও জবরদস্ত আড্ডাতেই এমন একজন মানুষের খুবই প্রয়োজন। যিনি রসিক। হাসেন বেশি। কথা বলেন কম। চাঁদুবাবু শুধু ভাল শিকারিই ছিলেন না, বন-জঙ্গল বন্যপ্রাণী ও পশু সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং মমতা এবং কৌতূহল ছিল অসীম। ওঁর বাবা ছিলেন ওড়িশার বিখ্যাত করদ রাজ্য বামরার দেওয়ান সাহেব— অমরবল্লভ দে। চাঁদুবাবুর মতো প্রকৃতার্থে এমন বুনো মানুষও খুব কম দেখা যায়। যেখানে চাঁদুবাবু সেখানেই আড্ডা সরগরম এবং হাসতে হাসতে পেটে খিল।

পেশার জগতেও আড্ডা মেরেছি কিছু। আয়কর অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে আপিলের ডাক পড়ার অপেক্ষায় বসে কলকাতার বাঘা বাঘা উকিল ব্যারিস্টারদের গল্প শোনা এবং তাতে যোগ দেওয়া এক আশ্চর্য মনোরম ও রসের অভিজ্ঞতা। ড. রাধাবিনোদ পাল, অশোক সেন, সিদ্ধার্থশংকর রায়, জে এস ব্যানার্জি, কল্যাণকুমার রায়, পি কে চ্যাটার্জি, সুকুমার ভট্টাচার্যি, আর এন বাজোরিয়া, দেবীপ্রসাদ পাল, কিরণ দাস, চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি এবং আরও অগণ্য মানুষের সঙ্গে যে অগণ্য প্রহর কেটেছে আয়কর আইন এবং আইন-বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ও আড্ডায় তাও স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকবে। উকিলমাত্রই বোধ হয় রসিক। তাই বার লাইব্রেরির আড্ডা সম্বন্ধে বলতে গেলে আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হয়।

শুধু ট্রাইব্যুনালেরই নয় আয়কর ভবনের বার লাইব্রেরি এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট লাইব্রেরিব আড্ডাও জমজমাট। তবে অ্যাকাউন্ট্যান্টরা বেশিই অফিস আওয়ার্সের মতো অফিস করেন বলে দুপুরে আড্ডা বড় একটা মারতে পারেন না। উকিল ব্যারিস্টারদের কাজের ঢংটাই অন্য। তাই বাড়ি গিয়ে রাতে আবার চেম্বার আরম্ভ করবার আগে ওঁরা বার লাইব্রেরিতে একবার বসে আড্ডা মেরেই যান। কাজও কিছু করতে হয়। মক্কেলরা দেখাও কবেন। জুনিয়ররা কেস ডিসকাস করেন। কেউ কেউ তাসও খেলেন।

অনেক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টেরও, আমারই মতো, অবারিত দ্বার সেখানে। চা ও পানের সদাই নেমন্তন্ন। এই আড্ডায় নানাবিধ রসের আলোচনাও হয়। মধ্যমণি হন সি আর ব্যানার্জি (চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি), মেঘনাদ ব্যানার্জি, এস পি চৌধুরী, মানস ব্যানার্জি, অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিভাস রায়চৌধুরী (নন-কমিটাল, পান-খাওয়া, মিটি-মিটি-হাসির মানুষ), গিরিশ সিং, মহাবীর থার্ড ইত্যাদি।

আড্ডা আরও এক জায়গাতে হত। শনিবার শনিবার আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় বিভাগে। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী সে আড্ডার মধ্যমণি হতেন। তাঁর ঘরে যত অগ্রজ ও অনুজ সাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধকারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং

ঘনিষ্ঠ হয়েছি তেমনটি আর কোথাওই নয়। যে-কোনও আড্ডা জমাতে হলে মধ্যমণিকে ভাল শ্রোতা হতে হয়। রমাপদবাবু নিজে কথা খুব কমই বলেন কিন্তু তিনি ওই আড্ডার প্রাণ। ইদানীং 'দেশ'-এও জোর আড্ডা হয। সেখানে রমাপদবাবুব ভূমিকা সুনীলের।

প্রথাগত আড্ডা বা বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাতে যে মানুষ অংশ নেননি এবং এখনও নিতে পারেন না এবং হয়তো তেমন আড্ডায় উপস্থিত থাকার যোগ্যতাও যে মানুষেব নেই তার পক্ষে 'আড্ডা'র উপরে কিছু বলা সত্যি কঠিন। আরও কিছু বলা তো সম্ভবই নয়।

সেকাল-একালের শিল্পীদের আড্ডা

শোভন সোম

আর্টিস্টরা আড্ডাবাজ নন, এমন কথা দুর্জনেও বলবেন না। আর্টিস্টরা অবশ্যই আড্ডাবাজ এবং ফূর্তিবাজ, আমুদে ততদিনই যতদিন তাঁরা বিক্রয়যোগ্য নাম হন না। বিক্রয়যোগ্য নামী হবার পর তাঁদের মধ্যে এক ধরনের বৃত্তিগত রেষারেষি আর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তাঁদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে এবং সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই ধরুন না, বিধান নগরে একদল আর্টিস্ট শিল্পী-আবাসন গড়বেন বলে সরকারি জমি পেলেন। যত দিনে আবাসন তৈরি হল, তত দিনে ওঁদের কারও কারও ছবি বিক্রয়যোগ্য হল, বাজারে চাহিদা হল, কারও চাহিদা কম হল, কারও বা হলই না। যাঁদের ছবি খুব বেশি রকমের বিক্রয়যোগ্য হল, তাঁর ফ্ল্যাটে দামি কাঠের দরজা জানালা বসতে লাগল, দামি ফিটিংস বসল, আর তখন তিনি ওখানে অন্যদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে চাইলেন না। শেষতক শিল্পী-আবাসন মাথায় উঠল। কেউ কেউ ফ্ল্যাট অশিল্পী কারও কাছে হস্তান্তরিত করলেন। কে বিশ্বাস করবে যে পরস্পরের কষ্টের দিনে ওঁরা ছিলেন একে অপরের সাথি! আর্টিস্টরা আড্ডা দিতে দিতে সঙ্ঘ গড়েন, সোসাইটি গড়েন, তারপর কেউ কেউ যখন কোনও গ্যালারির সঙ্গে আঁতাতে বা চুক্তিতে চলে যান অর্থাৎ যা আঁকবেন তা অমুক বা তমুক গ্যালারির মাধ্যমেই বিক্রি করবেন এবং যা-ই আঁকবেন তা অমুক বা তমুক গ্যালারি এই শর্তে নিয়ে নেবে যে ওই আর্টিস্ট সরাসরি কোনও ছবি কাউকে বিক্রি করবেন না, তখন স্বাভাবিকভাবেই ওই আর্টিস্ট সঙ্ঘ থেকে চলে যান, কারণ গ্যালারিঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার ফলে তিনি অন্য কোথাও কোনও প্রদর্শনীতে অংশই নিতে পারেন না। এই বাধ্যবাধকতার কারণে তখন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

হালফিল আর্টিস্টদের আড্ডা দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে কোনও কোনও বড় গ্যালারির প্রদর্শনীর উদ্বোধনে কিংবা উদ্বোধন উপলক্ষে দেওয়া ডিনার পার্টিতে।

দেখবেন তরল পানীয়ের সঙ্গে দিব্যি আড্ডা জমেছে! কিন্তু সেই সব আড্ডায় কেউ কারও নিজের বা পরস্পরের ছবি নিয়ে রা কাড়বেন না। ওঁরা অতীত দিনের কথা বলবেন। ইদানীং কোনও কোনও গ্যালারি একদল বিক্রয়যোগ্য আর্টিস্টকে বিদেশে নিয়ে যায়। ওঁরা দেশভ্রমণ করে ফিরে গ্যালারিকে একটা বা দুটো ছবি দিয়ে দেন আর কিঞ্চিৎ প্রণামীও পান। প্রদর্শনী উদ্বোধনের আড্ডায় ওই সব বিদেশভ্রমণের কথা হয়, প্রপার্টি নিয়ে সমস্যার কথা হয়, আর্ট স্কুলের দিনগুলোতে কী কী ফুর্তি হত, সে সব কথা হয়, কিন্তু কেউ কারও ছবি সম্পর্কে একটিও ভালমন্দ কথা প্রকাশ্যে বলবেন না। দুঃখের দিনের সাথিসঙ্গীরা সুখের দিনে কেন আড্ডা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তার কারণ, শিল্প এখন বিক্রয়যোগ্য পণ্য এবং পণ্যের বাজারে শিল্পীরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

যখন বাঁউন কায়েতের ব্যাটারা শৌখিন ছবি আঁকাআঁকি করলেও শিল্পকে পেট খোরাকির উপায় মনে করতেন না তখন বারমহলে নানা প্রসঙ্গে শিল্পকলার কথাও হত। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ বৈঠকখানায় বসে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীর ক্যাটালগ দেখেছিল এবং সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে আর্ট ও আর্টিস্ট নিয়ে কথা হয়েছিল। বড় ঘরে কফি টেবিল বুক হিসেবে ও-রকম ক্যাটালগ বা বই যে থাকত আব ও-সব নিয়ে দু'চার কথা হত এই তথ্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় পরোক্ষভাবে এসেছে।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী, অন্নদাপ্রসাদ বাগচি, নবকুমার বিশ্বাস, ফণিভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র পাল সম্ভবত আর্ট ইস্কুল পাশ করা প্রথম দিকের বাঁউন কায়েতের ব্যাটা যাঁরা শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে নেবার কথা ভেবেছিলেন। আঠারোশো চুয়াত্তরে শ্যামাচরণ বাংলায় প্রথম শিল্পকলা বিষয়ক বই 'সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্য জাতির শিল্পচাতুরি' লিখেছিলেন। তখনও চারুকলা শব্দটির প্রয়োগ হয়নি, ইংরেজি ফাইন আর্ট শব্দের সরাসরি আক্ষরিক অনুবাদ শ্যামাচরণ করেছিলেন সূক্ষ্মশিল্প। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও অক্লেশে ফাইন আর্ট-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সূক্ষ্মশিল্প শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তখনও ভারতীয় শব্দটির পরিবর্তে আর্য জাতি শব্দটিই অধিক গ্রহণীয় ছিল এবং শিল্পচাতুরি শব্দটি শিল্পচর্চা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। এই শিল্পীরা প্রতিকৃতি আঁকতেন, বইয়ের ছবি আঁকতেন এবং দুঃখের সাথি হিসেবে একসঙ্গে আড্ডাও দিতেন বলে জানা যায়। তবে কী আড্ডা দিতেন তা জানা না গেলেও অনুমান করে নিতে বাধা নেই যে এঁরা ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক শিল্পকলার অনুরাগী হিসেবে রাফায়েল, তিশান প্রমুখ শিল্পীর গুণকীর্তন করতেন। কারণ তখন বাঙালির দৌড় ছিল ওই অবধি। বাঙালি

রবি বর্মাকে বলত ভারতের রাফায়েল, বঙ্কিমচন্দ্রকে বলত বাংলার স্কট। রাফায়েল আর স্কট ছিলেন বাঙালির কাছে ছবির আর উপন্যাসের শেষ কথা। আঠারোশো উনষাটে আর্ট ইস্কুলের ইংরেজ অধ্যক্ষ প্রথম ভারতীয় শিক্ষক হিসেবে শ্যামাচরণ ও অন্নদাপ্রসাদকে পরীক্ষামূলক ভাবে নিয়োগ করেন। বছর আট পরে অন্নদাপ্রসাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ওড়িশাব শিল্পকলাবিষয়ক বইয়ের ছবি আঁকতে ওড়িশা যান। এক বছর বাদে কলকাতায় ফিরে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে বউবাজারে লিথোপ্রেস বসিয়ে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো খোলেন। এখান থেকেই বাংলায় রঙিন ক্যালেন্ডার ছাপা শুরু হয়। আঠারোশো আশিতে অন্নদাপ্রসাদ স্থায়ী ভাবে আর্ট ইস্কুলে যোগ দেন। বন্ধুসঙ্গ ত্যাগ না-করলেও বন্ধুদের সঙ্গে স্টুডিয়োর ব্যবসায় তিনি রইলেন না। উনিশশো পাঁচে মৃত্যু অবধি অন্নদাচরণ একজন আড্ডাধারী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের দক্ষিণের বারান্দার আড্ডায়ও তিনি যেতেন। অবনীন্দ্রনাথের থেকে বাইশ বছরেব বড় হলেও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, আড্ডাও হত। অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সংগঠিত বঙ্গীয় কলা সংসদের তিনি ছিলেন সভাপতি। আঠারোশো পঁচাশিতে প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পবিষয়ক পত্রিকা 'শিল্প পুষ্পাঞ্জলি'-র তিনি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। এই পত্রিকায় ইয়োরোপীয় অ্যাকাডেমিক আর্টকেই পৃথিবীতে আর্টের চরমোৎকর্ষ জ্ঞান করা হত। অ্যাং চ্যাং ব্যাং সাহেবদের সকলের নামের আগেই মহাত্মা বিশেষণ বসানো হত। অন্নদাপ্রসাদ যে বহু আড্ডার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আড্ডা থেকে সংগঠন গড়ে তুলতে পারঙ্গম ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর জীবনী কেউ লেখেননি।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে পার্ক স্ট্রিটে বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন বা জমিদার সভার ঘরে ওঁরা আড্ডা দিতেন, ছবির প্রদর্শনী করতেন, তাতে জমিদারদের বড্ড অসুবিধে হত। আসলে ওটা ছিল একটা ক্লাব। ফলে ওঁরা ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট উনিশশো সাতে গড়ে তুললেন। তবে ওই সোসাইটির প্রথম কমিটিতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, তাঁদের বন্ধু ও আত্মীয়সহ আটজন ভারতীয় সদস্য থাকলেও ইয়োরোপীয় আমলা ও ব্যবসায়ী ছিলেন আরও বেশি। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাপ্রধান এবং কমিটিতে ছিলেন সে-সময়ের তাবড় বহু ইয়োরোপীয়। তাঁদের স্বাদেশিকতায় কোনও খাদ ছিল না কিন্তু পেশাগত জমিদার হিসেবে সরকারি নজরে অবনীন্দ্রনাথদের ভাল থাকতেই হত। সোসাইটি ছিল সরকারি পদস্থ মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগের একটা বড় উপায় ও উপলক্ষ। উনিশশো উনিশে একদিকে রবীন্দ্রনাথ যখন কলাভবন স্থাপন করছেন শান্তিনিকেতনে, তখন কলকাতায় লাটসাহেবের অর্থানুকূল্যে সমবায় ম্যানসন/বর্তমান ফুটনানি চেম্বার্স

ভাড়া নিয়ে সোসাইটির দপ্তর ও স্কুল খোলা হলে সেটা ঠাকুরবাড়ির নিষ্কর্মা ছেলেদের সান্ধ্য আড্ডার ঠেক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু প্রায় সমসময়ে তিনটি উল্লেখযোগ্য আড্ডার কথা জানা যায়। তার একটি হল অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দার আড্ডা, আর একটি হল নন্দলাল বসুর হাতিবাগানের বাড়ির আড্ডা আর এই দুটির অংশত পরিণাম হিসেবে দেখা দিল বিচিত্রাসভার পোশাকি আড্ডা।

বঙ্গীয় কলা সংসদের আড্ডা বসত অবনীন্দ্রনাথদের বৈঠকখানায়। অন্নদাপ্রসাদ ছাড়াও ওখানে আসতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সে সময়ের প্রায় সকল শিল্পীই। ওখানে কী আলোচনা হত, তা কেউ লিখে যাননি। তবে ধরে নেওয়া যায় যে, ইংরেজের প্রবল আত্মগরিমার একটা জাতীয় জবাব নিয়ে ভাবনাচিন্তাই হত, কারণ সে সময়ে নিবেদিতা, অরবিন্দ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের শিল্পবিষয়ে লেখালিখির তোড়জোড় ও উদ্যম দেখে এমনই একটি ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। তখন সারা ভারতে নামজাদা এদেশি আঁকিয়ে হিসেবে রাজা রবি বর্মাই ছিলেন একমাত্র মানুষ। চৈতন্য লাইব্রেরিতে, জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথদের বৈঠকখানায় বঙ্গীয় কলা সংসদের বৈঠক বসত মূলত অবনীন্দ্রনাথদেরই উদ্যোগে। মাত্র কয়েক মাস জীবদ্দশার পর এই আড্ডা বন্ধ হয়ে যায় অবনীন্দ্রনাথের আগ্রহের অভাবের দরুণ। বঙ্গীয় কলা সংসদ স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যেই কাকিমা জ্ঞানদানন্দিনীর সৌজন্যে ই বি হ্যাভেলের সুপারিশে অবনীন্দ্রনাথ সরকারি আর্ট ইস্কুলে উপাধ্যক্ষ হন। তিনি সাহেবসুবোদের সঙ্গে ওঠবোস করতে শুরু করেন ও সাহেবদের সহায়তায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট সংগঠনেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

দশ বছর বাদে সাহেব অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সঙ্গে অবনিবনায় অবনীন্দ্রনাথ উনিশশো পনেরোতে সরকারি আর্ট ইস্কুলের উপাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রিয় ছাত্রেরাও আর্ট ইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন; কেউ টিউশনি করছেন, কেউ এটা ওটা করছেন। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ির আড্ডা ছিল বিখ্যাত। এই আড্ডার কোনও সময় ছিল না। ওঁরা তিন ভাই বিছানায়, আরাম কেদারায় শুয়ে-আধ শুয়ে থাকতেন। কখনও মর্জি হলে ছবি আঁকার ডেস্কে গিয়ে বসতেন। তিন ভাই গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী আছেন; তাঁদের পদপ্রান্তে বসে নন্দলাল বসু কুমারস্বামীর নির্দেশে ছবি আঁকছেন— এমন একটি রেখাচিত্র নন্দলাল এঁকেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথদের আড্ডায় নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যার বিবরণ উপেক্ষা করা হয়েছে। রবীন্দ্র জীবনীকারেরাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা খুব চতুরভাবে পাশ কাটিয়ে গেছেন। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিদেশিদের পরিচয় হয়েছে অনেক সময় অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের মাধ্যমে। শিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ বৈঠকখানা বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় এই তথ্য আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি।" আসল ঘটনাটি মেরি লাগো সম্পাদিত ইমপার্ফেক্ট এনকাউন্টার বইতে ও রোটেনস্টাইনের চিঠিতে, স্মৃতিচারণে আছে। বিশ শতকের গোড়ার বছর থেকেই অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ বিশ্বের শিল্পী ও বিদ্বজ্জনমহলে সুপরিচিত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পবিষয়ক পত্রিকায় ছাপা হত। তখনও রবীন্দ্রনাথের নাম ভারতের বাইরে প্রচারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনুবাদ নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ইংল্যান্ডে পাঠানো হলে তা পত্রপত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত হয়। যে ক'জন ভারতসুহৃদ ইংল্যান্ডে উনিশশো দশে ইন্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিল্পী রোটেনস্টাইন। ইংল্যান্ডের বিদ্বৎমহলে তাঁর ছিল প্রবল প্রভাব। উনিশশো এগারোর শেষে তিনি বেনারসে আসেন। তাঁর কলকাতায় আসার ইচ্ছে ছিল না। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে বেনারসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, নিদেনপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ যেন তাঁর কোনও ছাত্রকে পাঠান— এও তিনি লেখেন। জবাবে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে এই হতভাগা/wretched শহর কলকাতায় আসার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন। কলকাতা থেকে অবনীন্দ্রনাথের দুই সাহেব বন্ধু হাইকোর্টের বিচারপতি ও তন্ত্রসাধক স্যার জন উডরোফ ও স্যার হেনরি স্টিফেন বেনারসে গিয়ে তাঁকে কলকাতায় আসতে অনুরোধও করেন। রোটেনস্টাইন কলকাতায় আসেন। ঘরকুনো অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে বড় একটা কোথাও যেতেন না। তাঁর দৌড় ছিল পুরী আর দার্জিলিং। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিক্রমা করেছেন আর অবনীন্দ্রনাথকে বিশ্বই পরিক্রমা করেছিল। কলকাতায় আসতে অনিচ্ছুক রোটেনস্টাইন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ মোলাকাতের টানেই জোড়াসাঁকোর আড্ডায় এসেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথদের বাড়িতে আড্ডায় যখন তাবড় কোনও সাহেবসুবো আসতেন, তখন অবনীন্দ্রনাথের রবিকা ধুতি চাদর পরে তাঁর সৌম্য চেহারা নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে পেছনে বসে থাকতেন। যে আড্ডায় রোটেনস্টাইন প্রথম এসেছিলেন, সে আড্ডায়ও রবীন্দ্রনাথ তেমনি বসেছিলেন। তাঁর সৌম্য মূর্তি রোটেনস্টাইনকে আকর্ষিত করে। রবীন্দ্রনাথ যে একজন কবি, সে কথাও তখন তিনি জানতে পারেন। রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ জানান যে তিনি

তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদ করছেন। শুনে রোটেনস্টাইন বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর কোনও সহায়তা এ ব্যাপারে চান তাহলে তিনি যেন অকপটে জানান। রোটেনস্টাইন কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এ গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসতে অনুরোধ করেন। রোটেনস্টাইন সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। পরের বছরই রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ নিয়ে লন্ডনে যান। ইন্ডিয়া সোসাইটি রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে 'গীতাঞ্জলি' ছাপে। সেলিব্রিটিদের ডেকে রোটেনস্টাইন 'গীতাঞ্জলি' পাঠের ব্যবস্থা করেন। উনিশশো তেরোতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে নোবেল প্রাইজ পান এবং বিশ্বখ্যাত হন। ভাইপো অবনের আড্ডার মাধ্যমে সেদিন যদি রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত না হতেন তাহলে ইতিহাস অন্য রকম হত। রোটেনস্টাইন লিখেছিলেন "Should I not have stayed a while longer to continue my painting, and given up my plan of going to Calcutta, Darjeeling and Puri? Had I done so, I should never have met Tagore". রোটেনস্টাইন কলকাতায় থাকার দিনগুলিতে একাধিকবার জোড়াসাঁকোর আড্ডায় গেছেন। ধরে নিতে পারি যে, লাট-বড়লাটদের মতো ও-বাড়িতে তিনিও ঝালমুড়ি খেয়েছেন, নাড়ু-মোয়া খেয়েছেন, পাত পেড়ে বাঙালি খানা খেয়েছেন। তিনি লিখেছেন "I was attracted each time I went to Jorasanko, by their uncle, a strikingly handsome figure, dressed in a white dhoti and chadar, who sat silently listening as we talked… That this uncle was one of the remarkable man of his time no one gave me a hint." ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর গিরীন্দ্রনাথের বাড়ির নাতিদের এই আড্ডা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছিল। তারপর ওই বাড়ি বেহাত হয়। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে যান শান্তিনিকেতনে। কিন্তু সেখানেও তাঁর পক্ষে বেশি দিন থাকা সম্ভব হয়নি। ওই লেখাপড়া গান নাচের রুটিনে আড্ডার অবকাশ তিনি আর পাননি। তিনি চলে আসেন বেলঘরিয়ায় গুপ্তনিবাসে। সেখানে রূপযানীর সদস্যেরা মাঝে মধ্যে যেতেন। তখন ডানলপ ব্রিজের ওপার ছিল শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে। উনিশশো এগারোর পর রবীন্দ্রনাথও অবনীন্দ্রনাথের বাড়ির আড্ডায় গেছেন কিনা তা জানা যায় না। তারপর নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পরিসর ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়ে গেলেন। তিনিই হয়ে উঠলেন বিচিত্রাসভা থেকে যাবতীয় আড্ডার মধ্যমণি।

উনিশশো এগারোতে নন্দলাল বসু আর্ট ইস্কুলের পাঠ শেষ করেন। তখনও তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথ আর্ট ইস্কুলের মাস্টারমশাই। সাহেব অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন নন্দলালকেও মাস্টারমশাই হবার জন্যে ডেকেছিলেন। নন্দলাল ছিলেন অন্য ধাতের

মানুষ। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কংগ্রেসি করতেন। কংগ্রেসি করার অর্থ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করা। অবনীন্দ্রনাথ কংগ্রেসিদের বলতেন ছেলেধরা আর নন্দলাল কায়মনোবাক্যে ছিলেন কংগ্রেসি, স্বদেশি। তাঁর পণ ছিল সরকারি চাকরি করবেন না। যদিও তাঁর চাকরির খুবই দরকার ছিল। কিন্তু সরকারি চাকরি করবেন না বলে তিনি আর্ট ইস্কুলে চাকরিতে যোগ দিলেন না। রবীন্দ্রনাথের ছেলের বউ প্রতিমা দেবীকে ছবি আঁকা শিখিয়ে, এটা ওটা করে তাঁর সংসার চালানো ছিল দায়। তখন ছেলেরা ছাত্র বয়সেই বিয়ে করত, বাপ হত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সুরেন্দ্রনাথ কর আর নন্দলাল আড্ডায় জড়ো হতেন নন্দলালের হাতিবাগানের বাড়িতে। কারওই চাকরি নেই তাই সময় অঢেল। হা অন্ন হা অন্ন চিন্তায় দিন কাটলেও করে খাবার উপায়ও তখন ছিল না। হাতিবাগানের বাড়ির ছাদের আড্ডার সকলেই তখন পরস্পরের দুঃখের সাথি। ওই আড্ডায় কী কী কথাবার্তা হত তার বিবরণ কেউ লিখে যাননি। নন্দলালের ইন্টারভিউ থেকে জানা যায় যে নানা পন্থা আলোচনা করে তাঁরা শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন যে তাঁরা সকলে কলকাতায় একটা বাড়ি ভাড়া করে কমিউন করে একসঙ্গে থাকবেন একান্নবর্তী পরিবার হয়ে। রাঁধাবাড়া হবে একসঙ্গে। ছবি আঁকবেন, বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করবেন, এটা ওটা করে যা আয় হবে তা সকলেই যৌথ সংসারের জন্যে খরচ করবেন। উনিশশো এগারো থেকে উনিশশো চোদ্দো অবধি তিন বছর প্রায় রোজ নিয়মিত আড্ডা মেরে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন। কথাটা তাঁদের গুরুর কানে কেউ তুলে দিয়েছিল। গুরু অবনীন্দ্রনাথ পেশায় জমিদার। তাঁদের দরবারে অনেক পুষ্যি। আরও দু'চারটে ছেলেও যদি থাকে, তাতে ক্ষতি কি। বরং তাঁর ছাত্ররা তাঁর কাছাকাছিই থাকবে ভেবে তিনি ওঁদের বললেন, তোমরা চলে এসো আমাদের বাড়িতে। যথা আদেশ তথা কাজ। নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ আসন পাতলেন অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে কী কারণে এলেন না, তা জানা যায় না।

এই দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বললেন, তোমরা চলে এসো আমার বিচিত্রা বাড়িতে। ও বাড়িতে ছবি আঁকার ইস্কুল হবে, আড্ডা বসবে, আসর হবে। তখন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির ব্যবসাতে নেমে পড়েছেন ঠাকুরবাড়ির আরও কয়েকজনের সঙ্গে। পুত্র কলকাতায় থাকবে, তার বিনোদনের জন্যে পরিবেশ চাই, তাই বিচিত্রা বাড়িতে বিচিত্রাসভা আয়োজনের চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মাথায় আসে। বিচিত্রা বাড়ির নীচের তলায় গড়ে উঠল লাইব্রেরি, রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহের বই নিয়ে। রবীন্দ্রজীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হলেন গ্রন্থাগারিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী লেখার কাজে নিযুক্ত হলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

দোতলায় হল আর্ট ইস্কুল। ওই বিনি মাইনের ইস্কুলে দুপুরে ছবি আঁকা শিখতে আসতেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা, বাড়ির ছেলেমেয়েরা, ঠাকুরবাড়ির বন্ধুদের ছেলেমেয়েরা। ইস্কুলের জন্যে নানা নিয়ম তৈরি হল। অবনীন্দ্রনাথ খাতায় কলমে হলেন ফার্স্ট মাস্টার। অবনীন্দ্রনাথের ইংরেজ বন্ধুরাও হলেন অবৈতনিক কর্মকর্তা। ছবি আঁকা শেখাবার ফাঁকে ফাঁকে মাস্টারমশাইরাও ছবি আঁকতেন। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথের সেরেস্তার বেতনভোগী কর্মচারী। ওখানে আর্টিস্টদের কোনও সমস্যা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন লেখা পড়ে শোনাতেন। সে সময় অনেকেই ঠাকুরবাড়ির এই সুভদ্র সুশীল আসরে আসতেন। আসরে হত পোশাকি আড্ডা। বাকি সময় আর্টিস্টেরা আড্ডা দিতেন প্রাণ খুলে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই খোলামেলা ইস্কুলের জন্যে অনেক নিয়ম তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সে সব পছন্দ ছিল না। তাঁর ইচ্ছে ছিল, এখানে তরুণ আর্টিস্টেরা স্বাধীনভাবে শিল্পচিন্তা করবেন গুরুর অভিভাবন থেকে মুক্ত হয়ে। কিন্তু গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে তা সম্ভব ছিল না। বিচিত্রাতে কয়েকজন জাপানি শিল্পী এসেছিলেন। তাঁরাও ছবি আঁকতেন, আড্ডা দিতেন। এখন যাকে কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বলে, তার সূত্রপাত ওই ভাবে। কিন্তু উনিশশো ষোলোতে জাপানে গিয়ে মেয়ে মীরা দেবীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রাসভা বন্ধ করে দেবার কথা জানান। দেশে ফিরেই তিনি বিচিত্রার আর্ট ইস্কুল বন্ধ করে দেন। তবে বিচিত্রার পোশাকি আসর চলেছিল আরও কয়েক বছর। বিচিত্রাসভার আয়োজনে রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু ওখানে আর্টিস্টদের সভাভঙ্গ হল উনিশশো ষোলো থেকেই।

উনিশশো উনিশে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারকে কেন্দ্র করে তাঁর বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে শিল্পীদের একটি আড্ডা গড়ে ওঠে। এই আড্ডাধারীরা একত্রিত হয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ গুপ্তর জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমির প্রেরণায়। ই বি হ্যাভেল ঘোষণা করেছিলেন যে সরকারি আর্ট ইস্কুলে ইয়োরোপীয় কেতায় শেখানোর পরিবর্তে শিক্ষা দেওয়া হবে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশিক্ষার আদর্শ ধরে, যাতে প্রতিকৃতি আঁকা, চাক্ষুষ বস্তুর হুবহু নকল করাকে আদৌ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে না। ওই সময় প্রতিকৃতি আঁকার, তেলরঙে ছবি আঁকার, সাদৃশ্য মিলিয়ে আঁকার একটু চাহিদা ছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা হ্যাভেলের ঘোষণা শুনে 'প্রতিবাদ' করেন। তাঁদের ভয় হয় যে বিলিতি কেতায় ছবি আঁকতে না-পারলে ওঁরা কাজ পাবেন না। ওই ঘোষণা শুনে অনেকে আর্ট ইস্কুল ছেড়ে চলে আসেন। ইয়োরোপীয় কেতায় ছেলেদের সড়গড় দড় করে তোলার জন্যে রণদাপ্রসাদ জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি স্থাপন করেন। রণদাপ্রসাদের অনুরাগী

ও ছাত্র হিসেবে তাঁরাই জোটবদ্ধ হন যাঁরা অ্যাকাডেমিক সাদৃশ্যবাদকেই ছবির শেষ কথা মনে করতেন। যখন ইয়োরোপে কিউবিজম এসে গেছে তখনও অতুল বসু, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভবানীচরণ লাহা, আর হ্যাঁ তখনও যামিনী রায় প্রমুখ একদল শিল্পীর ধারণায় অ্যাকাডেমিক সাদৃশ্যবাদী ছবিই আন্তর্জাতিক ছবি, তখনও ওঁরা পার্সপেকটিভের ভুলকে ছবির ভুল মনে করছেন। পিকাসো, মাতিস প্রমুখ শিল্পী যে পার্সপেকটিভ তত্ত্বকেই খারিজ করে দিয়েছেন, সে খবরও ওঁরা রাখতেন না। রণদাপ্রসাদ বলতেন, হ্যাভেল সাহেব ভারতীয়দের বাস্তববিমুখ করবার জন্যেই ইয়োরোপীয় ঢঙের তালিম ছেড়ে ভারতীয় শিল্পের শিক্ষাধারা গ্রহণ করতে বলছেন। অবনীন্দ্রনাথের আত্মীয় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের ইন্ধন জোগাতেন। যামিনীপ্রকাশের ধারণা ছিল, সাহেবরা অবনীন্দ্রনাথকে তোল্লা দিচ্ছে আর তাঁর মতো 'বাস্তববাদী' অর্থাৎ সাদৃশ্যবাদী চিত্রকরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে না। যামিনীপ্রকাশের অবনীন্দ্রবিরোধিতার কারণ ছিল জ্ঞাতিশত্রুতা। উনিশশো একত্রিশে কাশ্মীরের মহারাজার প্রতিকৃতি আঁকতে হেমেন্দ্রনাথ শ্রীনগরে চলে যান। ওই বছরই তিনি পাটিয়ালার রাজশিল্পী হন। তাঁর বাড়ির আড্ডা ছত্রভঙ্গ হয়।

উনিশশো চল্লিশে ঠাকুর পরিবারের সুভোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশ্মীর থেকে কলকাতায় ফেরেন। ইংল্যান্ডে ছবি আঁকা শিখতে গিয়ে তিনি অল্পকাল পরেই ফিরে এসে কাশ্মীরে একটা ইস্কুলে আঁকার মাস্টার হন। জাত বোহেমিয়ান এই মানুষটি ছিলেন যেন রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' গল্পের অভয়াচরণ ওরফে অভীককুমার। নিজের বড়সড়ো নামটি ছেঁটে করেছিলেন সুভো। ছবি আঁকতেন, কবিতা লিখতেন, গল্প লিখতেন আর ছিলেন আড্ডাবাজ সুজন। চাকরি, লেখাপড়া এমনকী ছবি আঁকাও তিনি নিরবচ্ছিন্ন করতেন না। কলকাতায় তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর কাশ্মীরি চ্যালা বংশী চন্দ্রগুপ্তকে। এই বংশীই তাঁর তালিমে হয়ে উঠেছিলেন একজন বড় মাপের আর্ট ডাইরেক্টর, 'পথের পাঁচালি'র শিল্পনির্দেশক। পাঁচ এস আর দাস রোডে তিনি রথীন মৈত্রদের বাড়ি ভাড়া করে স্টুডিয়ো খুললেন। ওখানে আসতেন রথীন, আসতেন প্রাণকৃষ্ণ পাল। ওই বাড়িতে ওঁদের আড্ডা হত; যা কিছু চলতি, যা কিছু সাবেক তা ভেঙে নতুন কিছু করবার কল্পনা হত। প্রথমে কোনও আর্ট গ্রুপ করার চিন্তা তাঁরা করেননি। ছবি আঁকবেন, সাহিত্যচর্চা করবেন, ব্যস। এই ভেবে সুভো আর রথীন পত্রিকা বের করলেন 'অতিক্রমা'। কিন্তু কোনও কিছুতে লেগে থাকার ধাত সুভোর ছিল না। যুদ্ধের ঠেলায় প্রদোষকুসুম দাশগুপ্ত বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় এককালে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে রয়েড স্ট্রিট অবধি এলাকায় বেশ ক'জন বিদেশি ভাস্কর ও চিত্রকর ছিলেন। কলকাতায় থাকতেন কয়েক

হাজার সাহেব। ওঁদের মধ্যে কবরের মূর্তির আর তেলরঙে প্রতিকৃতি আঁকানোর চাহিদা ছিল। এই চাহিদা ওই সব বিদেশি ভাস্কর আর চিত্রকরেরা মেটাতেন। অবনীন্দ্রনাথের ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সাহেব মাস্টারমশাইরাও এমনই ছিলেন। আহেলবিলিতি প্রদোষ দাশগুপ্তও কলকাতায় ফিরে এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঘর ভাড়া করে স্টুডিয়ো খুললেন। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে তখন প্রতিকৃতি করাবে কে? তাই ওঁর স্টুডিয়োতে কাজের চেয়ে আড্ডাই হত বেশি। লন্ডনের আধুনিক ভাস্কর্যের একেলেপনার হাওয়া লেগেছিল প্রদোষের গায়ে। তিনি তাঁর স্টুডিয়োতে বসে নতুন শৈলীতে মূর্তি গড়তেন। স্টুডিয়োতে আড্ডা দিতে আসতেন মাদ্রাজ আর্ট ইস্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা। এঁদের মধ্যে ছিলেন পরিতোষ সেন, গোপাল ঘোষ। কারওরই চাকরি নেই, তাই সময় অঢেল। ওঁরা বসে বসে বেঙ্গল স্কুলের মৌরসিপাট্টা হটিয়ে ইউরোপীয় আধুনিকিয়ানার স্রোত এ দেশের শিল্পে বইয়ে দেবার ভাবনা ভাঁজতেন। প্রদোষ তখন বিবাহ করেছেন টি সি কমলা-কে। রামকিঙ্কর ও দেবীপ্রসাদের কাছে কমলা দাশগুপ্ত ভাস্কর্যের পাঠ নিয়েছিলেন। তখন ফ্যাশি বিরোধী আন্দোলন ও গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলনে বহু তরুণ শামিল হয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুভো আর রথীনকে জানালেন যে প্রদোষও তাঁর বন্ধুদের নিয়ে এদেশে আধুনিক শিল্পের আন্দোলন করার কথা ভাবছেন। নীরদ মজুমদারদের ত্রিকোণ পার্কের বাড়িতে প্রদোষ আসতেন। সেখানে সুভো ও রথীনের সঙ্গে প্রদোষ ও তাঁর বন্ধুদের মোলাকাত হল। প্রদোষের পরামর্শে তাঁরা লন্ডন গ্রুপের আদলে গড়লেন ক্যালকাটা গ্রুপ। গ্রুপের ঠিকানা হল পাঁচ, এস আর দাস রোড। তেতাল্লিশ থেকে এই ঠিকানায় প্রথমে গোপাল ঘোষের ও পরে নীরদ ও সুভোর ছবির একক প্রদর্শনী হল। আট জন শিল্পী ছাড়াও ওই বাড়ির আড্ডায় থাকতেন শাহেদ সুহরাবর্দি, জন আকুয়িন, বিষ্ণু দে, বিনয় সরকার, নীহাররঞ্জন রায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। ওই সময় কলকাতায় বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় বহু তরুণ ইংরেজ ও আমেরিকান ছাত্রেরা এসেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ ছবিও আঁকতেন। এঁদেরই জন্যে ইংরেজ সরকার সরকারি আর্ট স্কুল অধিগ্রহণ করে ওখানে সার্ভিসেস আর্ট ক্লাব খোলে। পঁয়তাল্লিশের চব্বিশে ফেব্রুয়ারি সে-সময়ের লাটসাহেব কেসি-র স্ত্রী এসে হাজির হলেন পাঁচ, এস আর দাস রোডে। পরদিন স্টেটসম্যানে সে-খবর সাড়ম্বরে বেরোল। মিসেস কেসি ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে গেলেন সার্ভিসেস আর্ট ক্লাবে। ব্যস, সার্ভিসেস আর্ট ক্লাবের ইচ্ছেয় ক্যালকাটা গ্রুপের প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনী হল ওই ক্লাবে, অর্থাৎ জবরদখল করা সরকারি আর্ট ইস্কুলে। এর পর গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে মুম্বইতে ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদর্শনী হল। রথীন, নীরদ লেগে গেলেন ফ্যাশি বিরোধী

আন্দোলনের আর কমিউনিস্ট পার্টির নানান সভাসমিতির মঞ্চ সাজাবার কাজে। পার্টি শিল্পীদের তখন থেকেই এই সব কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। ডেকরেটর, পোস্টার, পেইন্টার ছাড়া আর কোনও কাজে পার্টি আর্টিস্টদের লাগিয়েছে কি না তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। প্রগতি শব্দটি তখন পার্টির হাতেগরম শব্দ হয়ে উঠেছে। রাতারাতি পার্টির কাগজপত্রে ক্যালকাটা গ্রুপকে প্রগতিশীল আন্দোলন বলে ঘোষণা করা হল। পঁয়তাল্লিশে কলকাতায় ও মুম্বইতে প্রদর্শনীর পরেই গ্রুপ থেকে সরে যান এর প্রাণপুরুষ সুভো ঠাকুর ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত। তেপ্পান্নতে এই গ্রুপ ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয় যে, একজন আর একজনের মুখ দেখতেন না। আড্ডা থেকে গ্রুপ হতেই দলাদলি শুরু হয়। জোড়াতালি দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। এমনকী পরে কাগজে কলমে এঁরা কেউ কেউ পরস্পরকে দোষারোপ করেন। রথীনও অনেকদিন আগে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসেন। গ্রুপ বাঁচাতে প্রদোষ নতুন সদস্য নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিতোষ সেন লিখেছিলেন যে প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের সঙ্গে নতুন সদস্যদের মানসিক ঐকাত্ম্য কখনও ঘটেনি। পরে সুভো আর রথীন গ্রুপ সম্পর্কে কোনও মন্তব্যই করতেন না। কী আলোচনা হত এঁদের আড্ডায়। তার কিছুটা পাওয়া যায় প্রদোষ দাশগুপ্তর আত্মস্মৃতিতে, পরিতোষ সেনের লেখায় ও নীরদ মজুমদারের লেখায়। কিছুটা মেলে বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ ও সমকালীন পত্রপত্রিকার আলোচনায়। এঁদের মধ্যে সুভো আর প্রদোষ ছিলেন বিলেত ফেরত। তখনকার দিনে বিলেত ফেরত বলতে কী বোঝাত তা এখনকার দিনে অনুমান করা কঠিন। সুভো বিলেত থেকে ফিরে কিছুটা কিউবিস্ট ঢঙে চৌকো খোপে ছবি আঁকছেন, যেমন এখন বড় করে দেওয়া পিক্‌সেলে দেখা যায়। তিনি ভাস্কর্যও গড়ছিলেন। প্রদোষের রচনায় হেনরি মুরের প্রভাব ছিল। এঁদের ধারণা ইউরোপীয় আধুনিকতার লক্ষণগুলিই ছিল আধুনিকতার শেষ কথা। ইউরোপের তৌলে আধুনিক হয়ে ওঠাই তখন তাঁদের মোক্ষ ছিল। তাঁরা কিউবিজম, ইম্প্রেশনিজম, ফভিজম, ফিউচারিজম, এক্সপ্রেশনিজমের নেশায় ছিলেন বুঁদ। দেশের শিল্পের উপর এঁদের মনে এমন এক ধরনের অনাস্থার বোধ জেগেছিল যে, তাঁরা মনে করতেন, তাঁরা দেশে ঠিকমতো শিক্ষা পাননি। তাই তাঁরা ফ্রান্সে মানসভ্রমণ করতেন। নীরদ ও পরিতোষ ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। এই সেদিন অবধি কলকাতার ছেলেরা মনে করত যে ফ্রান্সে না-গেলে বুঝি আর্টিস্ট হওয়া যায় না। বিনয় সরকার লিখেছিলেন "এ কালের একোল দ্য কালকুত্তা বলতে পারি এই ক্যালকাটা গ্রুপকে। ঘরে ঢুকবামাত্র মনে হল যেন বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পী আর ভাস্কর্য শিল্পীদের বাজারে প্রবেশ করেছি।" তাঁর মনে হয়েছিল কলকাতার এই সালোঁ ফরাসি সালোঁর মাসতুতো ভাই। পরিতোষ সেন জানিয়েছেন

যে, সার্ভিসেস আর্ট ক্লাবে ইংরেজ ও আমেরিকান যে সব তরুণ সৈনিক ছবি আঁকতেন, তাঁদের কাছে অনেক ছবির বই ছিল। পরিতোষরা মুগ্ধ হয়ে সেই সব ছবি দেখতেন। প্রদোষ, পরিতোষ জানিয়েছেন যে, কী করে তাঁরা বেঙ্গল স্কুলের আবেশ থেকে মুক্ত হবেন, এই নিয়েই তাঁরা আলোচনা করতেন। তাঁরা জানতেনই না যে, যখন তাঁরা ইউরোপীয় মডার্নিজমকে শিল্পকলার আধুনিকতা বলে ধরে নিয়েছিলেন, তত দিনে ইউরোপীয় মডার্নিজম ইউরোপেই সেকেলে হয়ে উঠেছিল এবং প্যারিসকে হীনবল করে শিল্পীরা দলে দলে চলে যাচ্ছিলেন মার্কিন মুলুকে।

ষাটে মার্কাস স্কোয়ারে ঘটা করে বঙ্গ সম্মিলন হত। ষাটের সম্মিলনে জনৈক শিল্পসমালোচকের উদ্যোগে তখনকার তরুণ শিল্পী যশোপ্রার্থীদের একটি প্রদর্শনী হয়। ওই প্রদর্শনীটি মুম্বইতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সূত্রে ধর্মতলা স্ট্রিটের সোডা ফাউন্টেনে ও দেশপ্রিয় পার্কের সুতৃপ্তিতে এবং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বসন্ত কেবিনে সন্ধেবেলা যে সব আর্টিস্ট তাঁদের চাকরি খোঁজাব ও আত্মপ্রকাশের দুর্দিনে পরস্পরের সমব্যথী ছিলেন তাঁরা জড়ো হতেন। সেই থেকেই শিল্পীদের দুটো দল সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস ও ক্যালকাটা পেইন্টার্স গড়ে ওঠে। সোসাইটির প্রথম প্রদর্শনী হয় মাইসোর রোডে অনিলবরণ সাহার বাড়িতে। তখন প্রায়ই এই দল থেকে ওই দলে যাতায়াত হত। কে যে কবে কোন দলে আছেন তা বোঝা যেত না। কারও ছবি দু'শো টাকায় বিক্রি হলেও তাঁরা খুশি হয়ে ফিস্টি দিতেন। তার পরে এক একজন সদস্যের নাম হতেই তাঁরা সোসাইটি থেকে সরে পড়তে লাগলেন। কোনও গ্যালারির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে গ্যালারিই তাঁর সব কাজ কিনে নেয় ও বিক্রির ব্যবস্থা করে। ফলে সেই শিল্পী নিজেদের দলের প্রদর্শনীতেও যোগ দিতে পারেন না। এ দেশেও সত্তর আশি থেকে ছবির দাম বাড়তে থাকায় সেটাই ঘটেছে। একালে পণ্য হয়ে ওঠাই শিল্পের ভবিতব্য। ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই তত্ত্বে শিল্পী যখন বাঁধা পড়েন তখন তাঁর আর অবকাশ থাকে না। অবকাশ ছাড়া আড্ডাও হয় না। বর্তমান শিল্পের বাজারে শিল্পীর দম ফেলবার ফুরসৎ নেই।

হ্যাঁ, আড্ডা হয় বটে। তবে তা হয় নামীদামি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত গ্যালারিতে কোনও প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে ঘড়ি ধরে। তখন পানপাত্র হাতে দামি টিটবিট্‌স সহযোগে অতীত চারণা হয়। তারপর ঠিক সময় মতো টা টা করে যে যার গাড়িতে চেপে বাড়ি চলে যান। বাসে ট্রামে যাওয়া আর্টিস্টের স্ট্যাটাস বিরোধী। আর্টের মার্কেট গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যা হারিয়েছি, তা ওই নিঃস্বার্থ অথচ সমব্যথী শিল্পীদের আড্ডা।

থিয়েটারের আড্ডা

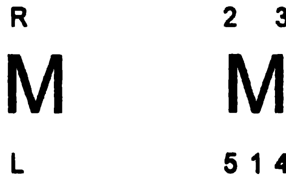
রবি ঘোষ

পঞ্চাশ দশকে, ঠিক ঠিক তারিখটা মনে নেই— কমলদাকে প্রথম দেখি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। আমাদের সম্পাদক শ্রীরবি সেনগুপ্ত কমলদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতীব সাধারণ এমনিতে— কিন্তু ক্রমশ কথা বলার ধরনে বুঝলাম ভদ্রলোক সাধারণ নন। আমার বয়স তখন বেশ কম এবং সবে অভিনয় শেখবার জন্য এলটিজি-তে ঢুকেছি— উৎপল দত্তর পরিচালনায়। জানলাম কমলদা সাউথ পয়েন্ট স্কুলেরই একজন শিক্ষক। এই হচ্ছে প্রথম কমলদাকে দেখা এবং আলাপের সূত্রপাত। উৎপল দত্তও তখন সাউথ পয়েন্টের শিক্ষক। আমাদের মহড়া হত ম্যানডেভিল গার্ডেনস-এর একটা ঘরে (বর্তমানে সেখানে বিরাট বাড়ি)। শ্রীসতীকান্ত গুহ ছিলেন আমাদের সভাপতি এবং সে কারণেই আমাদের এমন একটি সুন্দর জায়গা পাওয়া। হয়তো এমন একটা মহড়ার জায়গা না হলে কমলদার সঙ্গে দেখাই হত না। তখন মহড়ার আগে এবং পরে একটা খুব ভাল আড্ডা জমত গড়িয়াহাটার মোড়ে 'পানীয়ন' বলে একটা রেস্টুরেন্টে। বিকেলে যে আড্ডাটা হত সেটা বেশিরভাগই সাউথ পয়েন্টের শিক্ষকদের। এবং এই আড্ডায় কমলদা ছিলেন মধ্যমণি। উৎপল দত্ত— এন বিশ্বনাথন— শেখর চ্যাটার্জি এবং বাইরের মধ্যে আমি এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে রবিদাও এসে পড়তেন। দেখতাম সবাই কথা বলে— কিন্তু কমলদা বলতে শুরু করলে সবাই থেমে যেতেন। কমলদার এক বিশেষ বাচনভঙ্গি ছিল এবং সেটা প্রচণ্ড ভাবে আকর্ষণ করত সবাইকে। ধরুন এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে যেটা আমাদের বোঝার বাইরে— তবুও শুনতে বড়ই ভাল লাগত। বোধহয় এটা এক ধরনের আকর্ষণী শক্তি। কমলদা স্বভাবতই বলতেন— শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-ভূগোল এবং আরও কত কী। কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে কখনই কোনও কথা বলতে শুনিনি। বরং রাজনীতি ব্যাপারটাকে খুব একটা দাম দিতেন

না। এই ভাবেই দেখতে দেখতে— শুনতে শুনতে কবে একদিন কমলদার গভীর ভক্ত হয়ে গেলাম জানি না। আমাদের থিয়েটার-নাটক করাটাকে কমলদা খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। নাটক এবং নাট্যরস ব্যাপারে কমলদা যে গভীরে বিচরণ করতেন সেখানে পৌঁছনো আমাদের পক্ষে একটু মুশকিল ছিল। কমলদার মাত্র তিনটে নাট্য-প্রযোজনা দেখেছিলাম এই সময়। সবটাই বাচ্চাদের নিয়ে। 'দানসাফকির', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' এবং 'আলমগীর'-এর কিছু অংশ। ঠিক আমার বিদ্যেতে কুলোবে না তার পর্যালোচনা বা সমালোচনা করার। কখনও মনে হয়েছে— একটা Painting দেখছি— কখনও মনে হয়েছে এমন উচ্চারণ তো আমরা করতে পারি না,— কখনও মনে হয়েছে এ কি অসাধারণ কোরিওগ্রাফি। কিন্তু সবটার মধ্যে একটা আদি দেশজ ভাব রয়েছে। পোশাকের এবং রঙের এমন ব্যবহার হয়তো সমস্ত নাট্য আন্দোলনের কর্তাদের মাথাতেই আসত না। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' দেখতে দেখতে ভোলা দত্ত বলেছিল 'বল না কমলদাকে আমাদের নিয়ে একটা নাটক করতে'। কমলদাকে বলেছিলাম। কমলদা বেশ মিষ্টি করে বললেন,— 'তোমাদের হাড় পেকে গেছে, দোমড়ানো মোচড়ানো যাবে না।' কথাটা সত্যি। ফ্লেক্সিবিলিটি বাচ্চাদের দিয়ে যতখানি হবে ততখানি আমাদের দিয়ে কখনওই হবে না। বিশেষ করে, তখনকার আমাদের অভিনয়কে কমলদা আখ্যা দিয়েছিলেন— 'চিৎকৃত অভিনয়'। উপায় নেই। আমাদের পরিচালক ছিলেন উৎপল দত্ত— এবং তাঁর ধরনই ছিল এটা। মহড়া শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হয়তো কমলদার সঙ্গে গল্পগুজব হচ্ছে,— কিন্তু মহড়া শুরু হলেই কমলদা সরে পড়তেন। বোধহয় আমাদের মহড়ার ধরন দেখলে কমলদার কষ্ট হত। আমি বহুবার কমলদার মহড়া দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।·সে এক সত্যিই অভিজ্ঞতা। প্রতিটি কথাকে ভেঙে চুরমার করে আবার সেটাকে সুন্দর করে বলার যে পদ্ধতি বোধহয় সেটা অনেকেরই জানা ছিল না আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে। বায়োস্কোপে নিয়মিত অভিনয় করা কালীন একবার মানিকদাকে (সত্যজিৎ রায়) জিজ্ঞাসা করেছিলাম থিয়েটার প্রসঙ্গে। অর্থাৎ বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চে কাদেরকে খুব ক্ষমতাশালী বলে মনে হয়? মানিকদা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন,— 'কমলবাবু কিছু করলে তাঁর ধারে কাছে কেউ আসবে না।' বহু বহু এমন ঘটনা কমলদা সম্পর্কে জানি— যেগুলোর স্মৃতিচর্বণ করে আজও আনন্দ পাই প্রচুর। একবার জোর করে কমলদাকে আমরা আমাদের এল.টি.জি.-র প্রোডাকশান— 'নীচের মহল' দেখাই। 'নীচের মহল' হল গোর্কির Lower Depth-এর ভাবানুবাদ। রচনা ছিল উমানাথ ভট্টাচার্যের। অভিনয় হচ্ছিল বালিগঞ্জের সিংহী পার্কে। পুরো অভিনয়টা কমলদা দেখলেন। অভিনয় শেষে উৎপলদা খুব বিনয় করে কমলদার মতামত জানতে

চাইলেন। কমলদা সেই বিচিত্র মুখে হাসি নিয়ে বললেন,— 'বাবু, ভদ্‌কা না খেলে এমন নাটক লেখা যায় না।' বাস্‌। আমরাও বুঝে নিলাম কমলদার কতখানি ভাল লেগেছে। কি জানি তবুও আমার একমাত্র নড়া-চড়া ভাব-ভঙ্গি বোধহয় কমলদার একটু ভাল লাগত এবং তাই আমিই একমাত্র কমলদার খুব স্নেহের পাত্র হয়ে গিয়েছিলাম।

একজন বিরাট মানুষকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখলেও সবটা বোঝা সম্ভব নয় আমাদের মতন লোকের পক্ষে। কমলদা এমনই একজন বিরাট মানুষ ছিলেন। বুঝতে সবটা না পারলেও অনুভব করতে পারতাম। কমলদাকে নিয়ে আজ বিদগ্ধ মহলে দারুণভাবে মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। 'কমলপুরাণ'-এ (রফিক কায়সার) এক জায়গায় মানিকদার উক্তি আছে, 'একমাত্র আমরা কয়েক-জনাইতো কমলবাবুকে বুঝতাম।' সত্যি কথা, কমলদাকে বুঝতে হলে প্রচুর গভীরে যেতে হবে। কিন্তু প্রচুর গভীরে না গিয়েও কমলদাকে বোঝা সম্ভব, কেবলমাত্র তাঁর ভক্ত হয়ে যাওয়া যায় যদি। আমি ছিলাম কেবলই ভক্ত। গভীরে গিয়ে অভিনয় ছাড়া অন্য ভাবে ফাঁকি দিয়ে কিছু করাকে কমলদা বরদাস্তই করতেন না। কমলদা ছিলেন শিক্ষক— গুরু। একবার সৌমিত্র এবং আমি কমলদার শরণাপন্ন হয়েছিলাম 'আলিবাবা' নাটকটি করবার বাসনায়। নাটকটি হয়নি, কিন্তু তার সামান্য Preliminary কাজের ধাঁচ দেখে আমরা দু-জনেই মুগ্ধ। Costume design— Set design তো ছেড়েই দিলাম (Gordon Craig-এর চাইতে কোনও অংশে কম নয়), শুধু অভিনয় অনুশীলনের যে একটা তালিকা করেছিলেন তাতে আমরা দুজনাই কাৎ। নীচে একটা ফিগার দিচ্ছি যেটা কমলদার তৈরি ফুটওয়ার্ক প্র্যাকটিস করার জন্য।



অর্থাৎ দাঁড়াতে হবে ডান পা-টা R-এর জায়গায় এবং বাঁ পা-টা L-এর জায়গায় রেখে। তারপর টো-এর উপর ভর দিয়ে, 1-2-3-4-5 বিপরীত ভাবে আবার 1-2-3-4-5 ভাবে হাঁটতে বা movement করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ রপ্ত হলে দেখা যাবে upper part of the body স্থির থাকবে, কিন্তু lower part-এর movement চলতেই থাকবে। এটা খানিকটা নাচের পদ্ধতির মতন। কমলদা বলতেন, অভিনেতার ফুট-ওয়ার্কই আসল। নাটক— 'আলিবাবা' অবশেষে হয়নি আমার এবং সৌমিত্রর

সময়াভাবে। কারণ মাঝে মধ্যে rehearsal দিয়ে কমলদার কাছাকাছিও পৌঁছনো সম্ভব নয়।

বহুকাল আগে, বোধহয় ১৯৬২ কি ১৯৬৩ হবে রিঙ্কু (শর্মিলা ঠাকুর) খুব আড্ডা দিতে আসত আমার বাড়িতে। আমার বাড়িটা একটা ছোটখাটো আড্ডার বাজার ছিল। সর্বস্তরের লোকই আসত আড্ডা দিতে— শুধু অরসিকরা ছাড়া। স্বভাবতই— অভিনয় ইত্যাদি নিয়েই বেশি আলোচনা হত। সেখানে অনবরতই কমলদার reference আসত। একদিন রিঙ্কু বলল যে সে অভিনয় শিখতে চায়। আমি বা আমরা খুব আড্ডা দিতে পারি— কিন্তু শেখাবার ক্ষমতা কোথায় আমাদের। নিয়ে গেলাম রিঙ্কুকে সোজা কমলদার কাছে। গোড়ায় কমলদা একটু গররাজি হলেও অবশেষে আমাদের বিশেষ অনুরোধে রাজি হলেন। শুরু হল রিঙ্কুর অনুশীলন— 'আলমগীরে' উদিপুরির ভূমিকায়। প্রতিদিন rehearsal শুরু হত বেলা তিনটে নাগাদ, এবং শেষ হত রাত আটটায়। Rehearsal হত শুধু হাঁটার। সম্রাজ্ঞী কিভাবে হাঁটবেন এটা দেখাতে গিয়ে কমলদা সর্বস্তরের নারী জাতির হাঁটার অনুশীলন করাতে শুরু করলেন রিঙ্কুকে নিয়ে। এক একদিন রিঙ্কু rehearsal-এর পর আমার বাড়িতে আসত,— কিন্তু তখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত ওই প্রচণ্ড rehearsal-এর দরুন। কমলদা অবশ্য একদিন বলেছিলেন যে 'নাঃ— মেয়েটির নিষ্ঠা আছে।' সে নাটকটি মঞ্চস্থ হল না,— কিন্তু রিঙ্কুর লাভ হল অনেক। আজও দেখা হলে রিঙ্কু কমলদার কথা বলে। এই ছিলেন কমলদা থিয়েটার এবং অভিনয়ের ব্যাপারে।

একটা কথা কমলদার মুখে প্রায়ই শুনতাম,— 'বাবু ধর্মের কী হবে গা!' সত্যিই ধর্মের প্রতি এমন নিষ্ঠা খুব কম দেখেছি। সব কিছুর মধ্যেই যে একটা ধর্ম আছে সেটা কমলদার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি। ইদানীং কালের বহু লেখক-শিল্পী-গুণিজনের গুরুস্থানীয় ছিলেন কমলদা। যেদিন কমলদা চলে গেলেন সেদিন মানিকদার কাছে খবরটা পৌঁছই আমি। শ্মশানে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন মানিকদা, আর পি গুপ্ত (সাঁটুলদা)— নীরদ মজুমদার এবং আরও বহু গুণিজন। কিন্তু কমলদার খাটটিকে ঘিরে বসেছিল তার ছেলেরা— ভক্তরা। কেমন যেন লাগছিল সেদিন।

শেষ এক-দু বছর ধরে কমলদার সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন— 'রবি তুমি আমাকে টানা দুটো মাস সময় দেবে। তোমাকে দিয়ে "তারতুফ" করাব। সব সময়ই আমি বলতাম— 'কমলদা আপনি বললেই আমি সময় বের করে নেব।' সেই সুযোগটা আর হল না। হঠাৎই কমলদা বিদায় নিলেন। এটা আমার জীবনে একটা বিরাট আঘাত। শ্মশান থেকে বাড়ি ফেরার সময় এই সব নানা ঘটনা মনে পড়ছিল আর যেন শুনতে পাচ্ছিলাম কমলদার সেই কথা— 'বাবু ধর্মের কী হবে গা!'

আড্ডা কোনও দিন বন্ধ হওয়ার নয়

মুকুল গুহ

পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্পটি লিখেছিলেন, কিংবা মিশরীয় চিত্রলিপিতে এঁকেছিলেন ফারাও-এর এক লিপিকার আন্নালা। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। কবিতা নয়, ওরাল ট্রান্সক্রিপশন নয়, গল্প হিসেবে এই প্যাপিরাসটির চাইতে প্রাচীনতম নিদর্শন এখনও কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। এই গল্পটির এক জায়গায় ন'জন দেবতার উল্লেখ আছে। একজনের নাম 'চুম'। এই 'চুম' নামধারী দেবতাটি গল্পের নায়ক নিঃসঙ্গ যুবক বাতাও-এর জন্য একজন নারীর ব্যবস্থা করতে আদেশপ্রাপ্ত হন সূর্যদেবতার কাছ থেকে। নারীসঙ্গের গভীরতম বিস্তার তাঁর জানা ছিল। এই 'চুম' নাম থেকেই 'চুমু'-র উদ্ভব কি না এমন সব অসংলগ্ন তর্কে চায়ের কাপে তুফান উঠত আমাদের প্রথম যৌবনে, তত দিন, যত দিন না চায়ের কাপের বদলে কফির কাপে আমরা চুমুক দিতে শিখেছিলাম। আর সেটা ঘটেছিল অনেক পরে, পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে, কলকাতায়।

বালজাকের কফির নেশার কথা আমরা তখন সবে পড়ে উঠছি, ইংরেজি ছায়াছবিতে ডিনারের পরে কফির আয়োজনও প্রথম দেখছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ১৯৪৭ সালে পালিয়ে আসার পর, দ্বিতীয়বার উৎখাত হয়েছি কলকাতা থেকে। কলকাতার শরীরে তত দিনে ভাল মতন মেদ জমতে শুরু করেছে, আমাদের মতন উদ্বাস্তু বিত্তহীনদের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৬ সালে অনুগ্রহ করে আমাদের একটি গৃহদান করে, কলকাতা থেকে ২৬ মাইল দূরে একদা মিলিটারিদের রানওয়ে করা, পরে আধা শহরে রূপান্তরিত, অশোকনগরে। সবাই সেখানে চলে যাওয়ার ফলে আমি রয়ে গেলাম একা, কলকাতায়। ডেলি প্যাসেঞ্জারি আমার পোষায়নি একেবারেই। আমার আশ্রয় জুটেছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিম

কোণে 'সাকী' মেসে। সেখানেই শুরু হয়েছিল আড্ডার তাণ্ডবনৃত্য। সেখানে থাকত শিল্পী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ভাষ্যকার শরদিন্দু দত্ত, খেলোয়াড় অজয় দাশগুপ্ত ও আরও অনেকেই। শিকড় ছেঁড়া উদ্বাস্তু আর চাকরিবাকরি যাই করি না কেন, সব ছাপিয়ে ওই সময়েই ধাঁ করে জীবনের দ্বিতীয় প্রেমে পড়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় হলেও এটাই ছিল বোধহয় সাচ্চা প্রেম, নাহলে এত বছর ধরে সেটাতেই বা ডুবে আছি কী ভাবে? কলকাতা, কবিতা এবং আমি এই 'ট্রিনিটি'-র প্রতিবিম্ব বিচ্ছুরিত ছিল আমার এই দ্বিতীয় প্রেম— তার প্রত্যেকটির হাজারো প্রতিসরণ ঘটে গেছে এত বছর ধরে, কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিদিনের জীবন চালনায় সেই প্রতিবিম্বের মুখচ্ছবি ম্লান হয়নি এতটুকুও।

'সাকী' মেসের ছন্নছাড়া, অথচ অতি আন্তরিক আড্ডায় একে একে জমতে শুরু করল আরও অনেকেই— প্রসূন মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ। প্রসূন, দেবদুলাল আর শঙ্কর তখন আকাশবাণীতে সবে কাজ শুরু করেছে। সাহিত্য, চিত্রকলা আর ভারতীয় দর্শনের আড্ডায় রাত ভোর হয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমাদের সেই আরও অনেকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জর্জদা, দেবব্রত বিশ্বাস। প্রসূন ছিল জাত বোহেমিয়ান, কোথা কোথা থেকে হঠাৎই এসে হাজির হত আমাদের মেসে, এসেই বডি থ্রো করত আমাদের বিছানায়। কখনও সখনও এমনও হয়েছে যে আড্ডা দিতে দিতে রাত প্রায় কাবার করে আমরা একটা সিঙ্গল চৌকিতে তিনজন এমনকী চারজনও ঘুমোনোর চেষ্টা করেছি।

প্রসূনের ছিল গান বাজনার ভারী শখ। ওই আমাদের টেনে টেনে নিয়ে যেত সদারঙ্গ কিংবা তানসেন কিংবা ডোভার লেন, এন্টালির মিউজিক কনফারেন্সে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দবীর খাঁ, ওস্তাদ আলি আকবর, মুনাব্বর খাঁ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাছাড়া ওই সময়েই কয়েক বছর আমরা আমীর খাঁয়ের খুবই কাছে চলে যেতে পেরেছিলাম, তাও ওই প্রসূনের দৌলতে। আমীর খাঁ সাহেব কলকাতায় এসে বালীতে যে বাড়িতে উঠতেন, কিংবা পার্ক সার্কাস, ডোভার লেনে— আমরা চিমটের মতন লেপ্টে থাকতাম। প্রসূনের দরজা ওদের কাছে ছিল সব সময়েই অবারিত। প্রসূনের বন্ধু, সঙ্গী হওয়ার কারণে আমাদেরও। তত দিনে প্রসুন পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অখিলবন্ধু ঘোষ এবং হঠাৎই একবার উদয়শঙ্করের সঙ্গে। তখনও কিন্তু আমরা কেউই ষাটের দশকে পা রাখিনি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের আড্ডা গতি পেতে পেতে এমন নাচিয়ে তুলেছে যে আমরা হঠাৎ রাতারাতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আড্ডা আমাদের তখন ভাগ ভাগ করে পাঁচ-ছয় জায়গায় থিতু হয়েছে। কখনও গানের আসরে, কখনও

সাহিত্যের, কখনও মিউজিয়মে, কখনও সিলি ফক্স ক্যান্টিনের শিল্পীমহলে, কখনও কফি হাউসে, কখনও সুতৃপ্তি, শ্যামলী, অমৃতায়নে, কখনও কেবারিট কেবিনে আবার কখনও খালাসিতলায়। সে সব ছাড়াও বাড়িতে বাড়িতে, কমলালয়ের রেস্তোরাঁয়। হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনের রেস্তোরাঁয়, আর আরও কাঁহা কাঁহা সব মনে করতেও সময় লাগবে।

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, মিউজিয়ম আর সেখানকার সিলিফক্স ক্যান্টিনের আড্ডায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার কলেজের এক সহপাঠী অজয় ঘোষ। অজয় বিজ্ঞানের পাঠ ছেড়ে গভর্নমেন্ট কলেজে পড়তে গিয়েছিল। সেখানেই ধীরে ধীরে প্রায় প্রতিদিনের আড্ডায় জমিয়ে বসেছিলাম আমরা অনেকেই। মিলন মুখোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন দে, অজয় ঘোষ, সান্ত্বনা কুমার গোস্বামী, মনোরঞ্জন সাহা, নিখিল দাস, গণেশ হালুই, সেলিম মুন্সী, মিলু ব্যানার্জি এবং আরও অনেকেই। আমরা যারা ওই কলেজের ছাত্র নই, অথচ আড্ডা মারি, তাঁরাও তখন ছবির চর্চায় মশগুল। গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, চিন্তামণি করের সঙ্গে ছবির বিষয়ে আলোচনা করি। ছবি দেখি, প্রায় একটা একজিবিশনও বাদ যায় না। গোগ্রাসে, ওদের কাছ থেকে শুনে শুনে, পড়ে ফেলছি ভ্যান গগ, পল গঁগা, লাত্রেকের জীবনী। সে সব শিল্পীদের আপসহীন জীবনচর্চা আমাদের সামনে তখন আদর্শ। ওই সময়েই কোনও একটা দিনে তৈরি হয়েছিল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট। পরিচয় হয়েছিল শিল্পমাতা রাণু মুখার্জির সঙ্গে। এ সবের মধ্যেই সালভাদর দালি, পিকাসোর নগ্ন জীবন যেমন আমাদের আকর্ষণ করেছে, তেমনি করেছে, শান্তি আন্দোলনে পিকাসোর ভূমিকা, সমাজবাদ বিষয়ে সার্ত্রের স্পষ্ট কথন, বারট্রান্ড রাসেলের 'আন আর্মড় ভিক্টরি', অস্ত্রভস্কির 'হাউ দা স্টিল ওয়াজ টেমপারড', ইত্যাদি।

ষাটের দশকে আমরা পা দিলাম। আরও দুটো আড্ডার জায়গা বাড়ল, 'পরিচয়' অফিস আর 'চতুষ্কোণ' কাগজে। তখন কলকাতায় কফি হাউস ছিল বস্তুত চারটে। কলেজ স্ট্রিট, শ্যামবাজারের কফি হাউস ছাড়াও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ছিল দুটি। এই দুটির নাম, সময়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছে— হাউস অব কমন্‌স, আর হাউস অব লর্ডস। আমাদের আড্ডা ছিল হাউস অব লর্ডস-এ। এই কফি হাউসে মূলত ব্যবসায়ী আর রেসুরেরা ভিড় করত। তাছাড়াও অবশ্য বিশেষ বিশেষ কয়েকজন আসা-যাওয়া করতেন। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, অম্লান দত্ত ছাড়াও এখানে আড্ডা দিতেন হামদি বে, গৌরকিশোর ঘোষ ছাড়াও রবি সেন, সমর সেন, অশোক মিত্র, শেখর চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রমুখ অনেকেই। কখনও এরা আলাদা ভাবে আড্ডা দিয়েছেন। কখনও বা আমাদের সঙ্গে মিশে যেত তাঁদের বসার টেবিল।

শ্যামবাজার কফি হাউসে আড্ডা দিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আরও অনেকেই। সব নাম মনে পড়ে না, সেটা ছিল রোববারের সকালের আড্ডা। তত দিনে পাড়ার আড্ডা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি আমরা, পারিবারিক আড্ডা থেকেও।

তখন আমাদের অনেকেরই প্রথম লেখালেখি, কারও বা ছবি আঁকার কসরত। কিন্তু সেই সঙ্গে সে সব দিনের আড্ডায় উত্তেজনা ছিল। সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়ে গভীর আলোচনার অবকাশ তখনও শেষ হয়ে যায়নি। আড্ডাখানার আড্ডার ইতিহাস খোঁজার বিড়ম্বনা অনেক। কে যে কখন কার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, না কি নিজেরাই পরিচিতি হয়েছিলাম, সে সব কথা আজ আর তেমন ভাবে মনে নেই, মনে থাকার কথাও নয়। ধীরে ধীরে মাস কয়েকের মধ্যেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম আমরা। বিকেল ৬টা থেকে ১১টা তো বটেই, ছুটির দিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অঘোরে চলত আমাদের আড্ডা, এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। বড় আনন্দময় হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের দিনগুলো। আমরা ক্রমাগত পরস্পর জড়িয়ে গেলাম।

ষাটের দশকের প্রথম দিকের আড্ডার কথা বলতে গেলে যে কথাটা না বললেই নয়, সেটা হল 'চতুষ্কোণ' কাগজের আড্ডা। এটা লিখতে গেলেই, এমনকী কখনও সখনও মনে পড়লেও, আমার বড় কষ্ট হয়। কারণ সেই আড্ডার মধ্যমণি যিনি ছিলেন, সেই অরুণ রায় আজ আর নেই। কলেজ স্ট্রিটের একটা এঁদো বিশাল বাড়ির এক কোণের একটা চিলতে ঘরে ছিল চতুষ্কোণের অফিস। দেয়ালের দিকে দুটো ছোট্ট ছোট্ট টেবিল, দুটো চেয়ার, আর তার সামনে গোটা আটেক চেয়ার। এখানে আমাদের জমত অবিস্মরণীয় আড্ডা। অরুণদা বসতেন একটা টেবিলে। তাঁর সামনে আমরা। তখন লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে কুলীন চতুষ্কোণে আমরা কবিতা লেখা শুরু করেছি। পত্রিকাটির কবিতা সম্পাদক ছিল অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। চতুষ্কোণ ছিল অত্যন্ত সিরিয়াস ধরনের কাগজ। আড্ডার আলোচনাও হত অত্যন্ত সিরিয়াস। সেই আড্ডাতে নিয়মিত আসত পল্লব সেনগুপ্ত, নেপাল মজুমদার, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল করগুপ্ত ছাড়াও আরও অনেকেই। অরুণদা ছিলেন মনেপ্রাণে একজন সম্পাদক। কত ধরনের বিষয় ভাবতেন, পড়াশুনা করতেন, ভাবতেও অবাক হতে হয়। চারমিনার ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। একটার পর একটা সিগারেট খেতেন অরুণদা। কতই বা রোজগার করতেন ওই ছোট্ট কাগজ থেকে। কিন্তু সব সময়েই মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে। আজ এত বছর পরেও আমি অরুণদাকে মিস করি। মনে হয় অরুণদা আজ থাকলে, কাগজ করার বিষয় নিয়ে যথাযোগ্য একজন আন্তরিক মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা যেত।

পবিচয় পত্রিকার আড্ডাও দারুণ ছিল। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত তখন পরিচয়ের সম্পাদক। আমরা নিয়মিত লিখছি। আড্ডাও জমেছে মন্দ নয়। অমিতাভ দাশগুপ্ত, দেবেশ রায় তখন জলপাইগুড়িতে, মাঝে মাঝেই পরিচয়ের আড্ডায় হাজির হয়ে যেত। আসতেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, মণীন্দ্র রায় ছাড়াও আর অনেকে। তবে অনেক জ্ঞানতপস্বীর মধ্যে যিনি অন্যতম তিনি ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। গানের সুরে গল্পে মাতাল করে রাখতেন বটুকদা— জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আর হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

পঞ্চাশের দশকের শেষ ধাপে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে প্রথম পা দিয়েছিলাম। কার্শিয়াং-এ থাকার সময়েই আমি কীভাবে, কার কাছে আজ আর মনে নেই, এই আড্ডার কথা জেনেছিলাম। কলকাতায় আসার কয়েক বছর পর সেই স্বপ্নের কফি হাউসে যেদিন প্রথম গেলাম, সেদিনের কথা ভোলা সম্ভব নয়। বেশ কয়েক দিন মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে, বহু কষ্টে কয়েকটা টাকা জোগাড় করে, তারও চেয়ে বেশি কষ্ট করে জামাকাপড় একটু ভদ্রস্থ করে, একদিন আমি আর আমার এক বন্ধু ভীরু পায়ে কফি হাউসে ঢুকে পড়ে সন্তর্পণে একটা টেবিলে বসে পড়েছিলাম। আমরা দুজনে, সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু খুব জোরে কথা বলতে সাহস পাইনি সেদিন, কারণ ভয় ছিল, কে জানে পাশের টেবিলেই বসে আছেন কি না সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হিরণ সান্যাল কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'চার দিনের মধ্যেই নেশা ধরল। নিয়মিত যাতায়াতের ফলেই বোধহয় পরিচয় হয়ে গেল অনেকের সঙ্গে। ষাটের দশকে তখন সবে পা দিচ্ছি আমরা সকলেই।

কফি হাউসের আড্ডারও বেশ কয়েকটি সময়ভেদ ছিল। কাজের দিনে আমরা কদাচিৎ সকালে বা দুপুরে কফি হাউসে যেতাম। যেতাম বিকেলে। সেই আড্ডায় প্রায় প্রত্যেকটি টেবিলেই ঝড় উঠত। তখন কফি হাউস জমিয়ে রাখত শংকর চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর দে। শংকর চট্টোপাধ্যায়ের মতন বন্ধুবৎসল খুব কমই দেখেছি। খোলা জামার মতনই খোলা মন ছিল এই পরিচ্ছন্ন কবির। তাঁকে ঘিরে হয়তো কোনও দিন থাকতেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, দীপক মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কখনও সখনও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিমল রায়চৌধুরী, বেলাল চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কিংবা অরবিন্দ গুহ। হঠাৎ হঠাৎই এসে হাজির হত মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মোহিত তখন বোধহয় জঙ্গিপুরে পড়াত। চুপচাপ একা কোনও টেবিলে বসে বিড়বিড় করত বিনয় মজুমদার। হয়তো অন্য টেবিলে তখন কথার ঝড় চলছে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের মধ্যেই; কিংবা শেখর বসু,

রমানাথ রায়দেব টেবিলে, কিংবা শঙ্কর দেকে ঘিরে তরুণতর লেখক কবিদের। আরও দুই এক বছর পরে কফি হাউস সরগরম করেছিল 'সখী সংবাদ' কাগজের সম্পাদিকারাও, অর্থাৎ কৃষ্ণা মিত্র, মীনাক্ষী সরকার, সন্ধ্যা বসু, প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রুচিরা শ্যাম সহ আরও অনেকে। আমাদের সেই সময়ের আড্ডায় উপস্থিত থাকত বশির আল হালাল, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মুস্তাফা সিরাজ, রবি সেন, নিখিলচন্দ্র সরকার, তুলসী সেনগুপ্ত, করুণাসিন্ধু দে। দীপেনদা নিয়মিত আসতেন, অনিয়মিত হাজিরায় সুভাষদা, সিদ্ধেশ্বর সেন, বটুকদা। ওই আড্ডায় নিয়মিত আসত সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, কখনও মধ্য পথে কমলকুমার মজুমদারও। এ রকম আরও অনেকেই আসতেন কফি হাউসে, সব নাম একসঙ্গে মনে করা অসম্ভব। যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ল না, তাঁদের কাছে সবিনয়ে ক্ষমা চাইছি। স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এটা ঘটছে, ইচ্ছাকৃত বিস্মরণ নয়, একেবারেই নয়।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় আমি নবীন পাল লেনের মেস বাড়ি ছেড়ে পূর্ণদাস রোডে কয়েকজন মিলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেস করেছিলাম। উত্তরের সঙ্গে গতায়ত তাই কমে গেল। কফি হাউসের আড্ডার শেষে, একেবারে কাছে নবীন পাল লেনের মেস বাড়িতে আড্ডার তলানিটুকু এসে পৌঁছত। সেই আড্ডাও চলত অনেক রাত অবধি। সেখানে মাঝে মাঝে হাজিব হত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অমিয় চৌধুরী ও আরও অনেকেই।

উত্তর কলকাতার এই সব আড্ডার মধ্যে আরও দুটো জায়গার আড্ডাও মাঝে মাঝে খুব জমে উঠত। একটা বসন্ত কেবিন আর অন্যটা ফেবারিট কেবিনে। বসন্ত কেবিনের আড্ডায় নিয়ম করে হাজির থাকত গণেশ পাইন। ফেবারিট কেবিনে পরিচিত অধ্যাপকদের দল। আর বাড়ির আড্ডার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল পাইকপাড়া অঞ্চলের সমাবেশ। গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছিল প্রত্যেক রোববারে বিশাল আড্ডা। ছিল বেলগাছিয়ার চিত্ত সিংহের বাড়িতেও বন্ধুদের জমায়েত। মাঝে মাঝে দক্ষিণারঞ্জন বসুর বাড়িতে, দক্ষিণে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে, পণ্ডিতিয়া রোডে তারাপদ রায়ের বাড়িতে, সুভাষদার বাড়িতে মাঝে মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্তী দশকটি নানা কারণে টালমাটাল। আড্ডা অবশ্য কখনই বন্ধ হয়নি। তবে স্থানবদল ঘটল অনেক কিছুরই। এখন আমাদের আড্ডা সুতৃপ্তিতে বেশ ভাল রকমই জমে। এখনও প্রায় সবাই নিয়মিত অনিয়মিত ভাবে সেখানে আমরা বসি। শুধু একজন থাকে না। সে হল শংকর। তাঁর মৃত্যু আমাদের দুর্বল করে দিয়েছিল, এখনও করে।

এখনও একই রকম আড্ডা বসে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর হাউস অব লর্ডস কফি হাউসে। প্রত্যেকদিন দুপুরে, লাঞ্চের সময়। আড্ডা বসে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। তাছাড়া আড্ডাগুলো ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু দেখা হয়। তবু বসে দু-দণ্ড গল্প করা যায়। আমরা যারা এক সময় আড্ডার পোকা ছিলাম, তাঁদের অনেকেরই আড্ডার সময় বা মেজাজ শেষ হয়ে যায়নি। বয়স তাঁদের বয়সি করতে ব্যর্থ হয়েছে, পারবে না বোধ হয় সেই মেজাজটা কেড়ে নিতে।

একটা কথা না বলে শেষ করা যায় না এই লেখা। আড্ডার এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরের ইতিহাসে মুক্ত চিন্তার অবকাশই ছিল বেশি। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, গান নিয়ে আলোচনা হত খুব বেশি। সে সময়ে আড্ডার বিষয় ছিল মুখ্য, হালকা মেজাজ ছিল গৌণ। এখন ইদানীং সে মেজাজ কিছুটা বদলেছে। এখন হালকা মেজাজের যুগ, সবাই যেন সন্তর্পণে গভীর বিষয়ের আলোচনা থেকে দূরে সরে থাকতে চায়।

আমার মনে আছে কার্শিয়াং-এ থাকার সময়েই, ওই কম বয়সে, লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার পড়েছিলাম, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে। তখন আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র, শুধু লরেন্স নয়, সে সময় গোগ্রাসে পড়তাম আরও অনেক বই, ন্যুট হামস্যুনের ভ্যাগাবণ্ড, সোলোকভের অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন, কিংবা দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন, গোর্কির 'মা'— এই সব আরও কত কি।

কলকাতার আড্ডায় নতুন পুরনো বই নিয়ে আলোচনা হত বেশি। মেয়েদের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে আলোচনা হত না তা নয়। ভাল ছবির খবর পেলে আলোচনা হত, আলোচনা হত ভাল বইয়ের খবর থাকলে। এখনও হয়। নারী, সাহিত্য আর জীবন নিয়ে কথা কোনও দিন শেষ হওয়ার নয়। বন্ধুত্ব নিয়েও নয়।

শতায়ুর ছায়ায় চিত্র-সাংবাদিকদের আড্ডা

শ্যামল বসু

লেন্সম্যানদের আড্ডা বা আড্ডার লেন্সম্যানরা। লেন্সম্যান শব্দটা ইদানীং ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু সংবাদ-চিত্রগ্রাহকদের চিত্র-সাংবাদিক বলাই বোধ হয় সঠিক। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি এদের প্রেস ফোটোগ্রাফার বলেই জনসাধারণ বেশি চিনতেন। আর এদের ছবি তৈরির প্রাণকেন্দ্র ছিল ধর্মতলার হসপিটাল স্ট্রিটের ক্যালকাটা ক্যামেরা স্টোর্সে। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯৮৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘ ১০৪ বছর অর্থাৎ শতবর্ষ পার করে আজ এই দোকানের অবলুপ্তি ঘটেছে। দোকানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দননগরের রামচন্দ্র ভড়। আমরা যখন প্রথম এখানে ছবি তৈরি করতে আসি তখন মালিকের চেয়ারে রামবাবুর দুই ছেলে গিরিশচন্দ্র ভড় ও আমাদের অতি প্রিয় ডার্করুমম্যান ভুদোদা (যদিও ডাকনাম কিন্তু এই নামেই উনি বেশি পরিচিত ছিলেন) এবং পরেশ চ্যাটার্জি।

কলকাতার প্রায় সব ফ্রি-ল্যান্স ফোটোগ্রাফাররা এবং কলকাতার বাইরের সংবাদপত্র বা এজেন্সিকে যাঁরা ছবি পাঠাতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এখানে ছবি তৈরি করতে আসতেন। কারণ এদের তিনটি ডার্করুমের দৌলতে সার্ভিস ছিল খুব দ্রুত। ফলে চিত্র সাংবাদিকদের ভিড় এখানেই বেশি হত। যদিও ওই অঞ্চলে আরও কয়েকটি ফোটো তৈরির দোকান ছিল। তখন শহরের তিনটি খ্যাতনামা দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া আর কারও ডার্করুম ছিল না। সেখানে এই মুক্ত-চিত্র-সাংবাদিকদের প্রবেশ অবাধ ছিল না।

সংবাদচিত্র কভার করেই আমরা দৌড়তাম ওখানে ছবি তৈরি করতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই সব ছবি নিয়ে কোনও খবরের কাগজে যেতাম। কিন্তু এরই ফাঁকে কিছু সময় পাওয়া যেত আড্ডা দেওয়ার। অনেকটা কলেজ স্ট্রিটের লেখকদের আড্ডার মতো।

স্মৃতির পাতা থেকে ছেঁড়া কিছু কিছু অংশ দেবার চেষ্টা করব। কখনও এ আড্ডায় ফোটোগ্রাফি নিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনা হত। নতুন কী ক্যামেরা বা ফিল্ম বাজারে এল তা নিয়েও আলোচনা বাদ থাকত না। সিনিয়ারদের আলোচনায় শুনতে পেতাম কে কোন রাজনৈতিক নেতার কাছের লোক। বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ কিংবা জ্যোতি বসু কাকে কী বলেছেন। এই নিয়ে মশগুল। এমনকী জওহরলাল নেহরু যে তারকবাবুকে চিনতে পেরে "তারক ক্যায়সা হ্যায়?" বলেছিলেন আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন "ল্যান্ড মার্ক অব ক্যালকাটা"। তা কি কম আত্মতৃপ্তির কারণ! আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু চিনতেন শম্ভুদাস চ্যাটার্জিকে। এসবই আমার ওঁদের কাছে শোনা কথা।

আমাদের আড্ডায় দেশি বিদেশি সব চিত্র-সাংবাদিকই আসতেন এবং জমিয়ে আসর গুলজার করতেন। এর মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্রেঞ্চ প্রেসের চিত্র সাংবাদিক ও সংবাদদাতা জেমস শেফার্ডকে মনে পড়ে। পরে ইনি টাইমলাইফের ভারত ও দূর প্রাচ্যের দায়িত্ব নিয়ে দিল্লি যান। ইনি ছবি তুলে এসেই ক্যামেরা থেকে এক্সপোসড ফিল্মটা খুলে কোনও রকমে ডার্করুমম্যান ভুদোদার হাতে দিয়েই বলতেন "জলদি ধোলাই করিয়ে।" ডার্করুম সহকর্মী খোকাকে দুটো টাকা দিয়ে বলতেন "মুড়ি-সেওভাজা আর বোন্দিয়া লে আও।" ভীষণ প্রিয় ছিল তাঁর এই খাওয়া। খাবার এলে আমরা সকলে মিলে কমিউনিটি সিস্টেমে হাত ও মুখ চালাতাম।

আর এক জন বিদেশি যুবক ছিলেন 'মি. উু'। কলকাতার একটি চিনা দৈনিকের চিত্র-সাংবাদিক। সপ্রতিভ, আনন্দোচ্ছল এই যুবককে আমার খুবই ভাল লাগত। হয়তো বয়সের জন্য। কারণ আমিও তখন ছিলাম এই আড্ডার একজন কনিষ্ঠ শিষ্য। ভারত-চিন যুদ্ধের সময় 'উু' হঠাৎ একদিন কোথায় হারিয়ে গেল। পরে অবশ্য শুনেছিলাম ও দেশে চলে গেছে। ও মাঝে মাঝে টেবিল বাজিয়ে হিন্দি গান গাইত আর আমরা উপভোগ করতাম। মজা পেতাম। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এখানে কয়েকজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ চিত্র-সাংবাদিক আড্ডা দিতে আসতেন। আজ তাঁরা প্রয়াত। আনন্দবাজারে ফ্রি-ল্যান্স করতেন কাঞ্চন মুখার্জি, অমৃতবাজার-যুগান্তরের তারক দাশ, আনন্দবাজারের শম্ভুদাস চ্যাটার্জি, স্টেটসম্যানের শ্যামাদাস বসু আর মহাকরণের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের নীরদ রায়। এঁদের শ্রদ্ধা জানাই। ওঁরা এসেই দোকানের মালিক গিরিশদাকে বলতেন "চা আনাও"। তারপর চায়ের পেয়ালা ঘিরে চলত জমিয়ে আড্ডা। সে আড্ডায় কনিষ্ঠরা অবাঞ্ছিত। আবার কোনও সময় একটি বিশেষ ছবির জন্য বাহবাও পেতাম। এরা সবাই যে ছোটদের পছন্দ করতেন তা নয়। কেউ কেউ তো কোথাও ছবি তোলার সময় সরকারি পরিচয়পত্র নেই বলে পুলিশের ভয়

দেখাতেন। বকাবকিও করতেন। কিন্তু এখানে এসে অন্য রকম। আবার ছবি মিস করলে এখানে এসে সংগ্রহও করতেন। এটা ছিল প্রায় নিত্যকার রুটিন। আর যারা আসতেন তার মধ্যে অজিত দাশ, শম্ভু ব্যানার্জি, অমিয় তরফদার, গণেশ সিংহ, রামচন্দ্র, মি. শর্মা, অঞ্জন গুপ্ত, মোনা চৌধুরী, রবি ঘোষ, রবিন সোম, অশোক বসু, বিভাস সোম এবং আমি। তখন আমরা সকলের সংবাদপত্রে মুক্ত-চিত্র-সাংবাদিকতা (ফ্রি-ল্যান্স) করি। কেউ আবার কিছু Photo Sale বা Industrial Photographyও করি। আজ এর মধ্যে সকলেই সংবাদপত্রে বা নিজ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত।

একদিনের মজার ঘটনা মনে পড়ে। বড়রা যখন খুব আড্ডায় মশগুল, আলোচনার বিষয় কার কত দামি ক্যামেরা এবং অ্যাসেসরিজ আছে। একজন ইয়া লম্বা ফর্দ দিচ্ছেন। যেন দামি ক্যামেরা আছে বলেই তিনি ভাল ফোটোগ্রাফার। এই আলোচনা শুনে রবি ঘোষ বলে ওঠে তা হলে তো কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানের কর্মীরাই বেশি পণ্ডিত। ওর কথা শুনে তো একজন রেগে লাল। 'খুব ডেঁপো তো ছোকরা— বড় বড় কথা'। খুব বেশি তর্ক করা রবি বা আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কারণ ওঁরা সবাই ছিলেন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠিত চিত্র-সাংবাদিক। তাছাড়া বয়স্কদের এটুকু সম্মান আমরা দিতাম। তবে রবির কথাটা খুবই সঠিক ছিল। আলোকচিত্র গ্রহণের প্রথম পাঠই তো বলে 'Man behind the camera' এবং সেটাই সব থেকে বড় ও শেষ কথা।

আর একদিন সন্ধ্যায় অ্যাসাইনমেন্ট থেকে এসে ভেতরের ডার্করুমের দিকে আসতেই দেখি ভীষণ গোলমাল— ঝগড়া। শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে গণেশবাবুর প্রায় হাতাহাতি। ব্যাপার কী? চিনা কনসুলেটের পার্টিতে দুজনেই ছবি তুলেছেন। কিন্তু শ্যামাদাসবাবু আগে গিয়ে পাঁচ টাকা করে ছবি বিক্রি করে এসেছেন। গণেশবাবু তাতে ক্ষুব্ধ কারণ উনি নাকি সাত টাকা করে পেতেন। যদিও চিনারা কাউকেই অ্যাসাইনমেন্ট দেয়নি। একটু পরেই সব ঠাণ্ডা। দুজনে হাত ধরাধরি করে সিনেমা দেখতে চলে গেলেন। পেশাগত কারণে ঝগড়াঝাঁটি হলেও একটু পরেই মিটমাট হয়ে যেত।

তখন ওই দোকানে সব থেকে বয়োঃবৃদ্ধ একজন ফোটো ফিনিস করার শিল্পী ছিলেন চিরকুমার রমেশদা। ডার্করুমের মাচার ওপরেই ছিল তার স্থায়ী আস্তানা। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অনেক ঘটনার সাক্ষী। মাঝে মাঝে তাঁর গলার আওয়াজ পেতাম, সন্ধে ৮টার পর দোকান বন্ধ হলে 'হচ্ছেটা কী?' তখন হয়তো কেউ একটু জলপান করে জলপথে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছেন। এতে বেসামাল হলে গোলমাল না করলে তার খুব আপত্তি নেই। মানুষ হিসাবে রমেশদা খুবই স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

পরেশদা ছিলেন আমাদের সকলের রিসেপশনিস্ট-কাম-ইনফরমেশন অফিসার। আমাদের কার ফোন এল? কে করল? বা কোন মন্ত্রী-সাংবাদিক-লেখক কিংবা আমাদের কোনও বন্ধু, কেউ আমাদের খোঁজ করলে— সবই উনি নোট করে রাখতেন। নিছক একটা দোকান কিন্তু ওটা যেন আমাদের নিজেদের অফিস। তিনিও আজ নেই। ক্যালকাটা ক্যামেরা স্টোর্সও নেই। আর নেই চিত্র-সাংবাদিকদের সেই আড্ডা। যা নাকি ছিল যৌবনের উপবন আর বার্ধক্যের বারাণসী।

শিল্পী জীবনের দুই আড্ডার ঠেক

শুভাপ্রসন্ন

আড্ডার কথা উঠলেই হারিয়ে যাওয়া কিছু ছবি ভেসে আসে। তার অস্তিত্ব এখন আর নেই— অথচ ধর্মতলার মোড়ে জি. সি. লাহার দোকানের প্রায় উলটো দিকে বেশ বড়সড় আকারের এক রেস্টুরেন্ট ছিল 'নিউইয়র্ক সোডা ফাউন্টেন'— ওটাই ছিল আমাদের আড্ডার ঠেক। কে শুরু করেছিলেন, কারা প্রথম জানি না— তবে, আমার যাতায়াত শুরু সেই উনিশশো সাতষট্টি-আটষট্টি থেকে। তখন কলকাতা উত্তাল, গরগরে। তারুণ্যের রমরমা। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই আমরা যেন নিধিরাম সর্দার— দুনিয়া পাল্টে দেব এসব আমাদের স্লোগান। সব ভাষাই যেন প্রতিবাদের ভাষা। নানান সংগঠনের সঙ্গে তখন সবাই যুক্ত। আমরা জড়ো হই কিছু না কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে। নিদেন পক্ষে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা হাতে লেখা লিটল ম্যাগাজিন। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা মা যা স্বপ্ন দেখেন আমি দেখি না। বাড়ি শুধু রাতের আশ্রয়। রাস্তা, বন্ধু, দাদারা বাকি সময়ের প্রশ্রয়, আশ্রয়ও।

আড্ডায় বন্ধুতা, সাহস, অহংকার, স্বপ্নের ইন্ধন, জ্ঞান সঞ্চয়, জ্ঞান বিতরণের আবহ থাকত। অকিঞ্চিৎকর কোনও প্রসঙ্গকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শনে পরিণত করা কিংবা কোনও শীর্ণ-দীর্ণ কাপুরুষকে কর্ণ কিম্বা অর্জুন ভাবা— এসবই হত। আমাদের সময়ই ঘনাদার যুগ। আমাদের একান্ত পীঠস্থান তখন আড্ডার স্থল। সেই আড্ডায় সমবয়সিদের চেয়ে দাদাদের প্রাধান্য ছিল বেশি। সেই সব দাদাবা আমাদের আইকন, ফিলসফার গাইড অ্যান্ড ফ্রেন্ড ছিলেন। তখন কলকাতার বহু আড্ডায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠেক পেয়েছি, শ্রোতা হয়েছি, বক্তা হয়েছি, মশগুল হয়েছি কিন্তু একাত্ম হতে পারিনি— নিজের কিছু অক্ষমতায়। সাধারণত আড্ডার প্রধান সঞ্জীবনী যার কোনও কিছুই ব্যক্তিগত অনীহার কারণে গ্রহণীয় ছিল না— চাপানে, ধূমপানে, মদ্যপানে অপারগ আমি, কাজেই কোনও স্বাভাবিক ছাড়পত্র জোটেনি আমার। তাই আড্ডার তেমন সদস্য তালিকাভুক্ত বিবেচিত হতে পারিনি।

সোডা ফাউন্টেনের আড্ডায় যেহেতু চিত্রী আর ভাস্করদের প্রাধান্য তাই এক ধরনের জাতের টান ছিল— হীনম্মন্যতার গ্লানি ছিল না। তবে যে সবসময় আমরা সংখ্যায় অল্প। চেয়ার দখল করে তিন কি চারজন তখন ড্যাবড্যাবে চোখে আমার শরীর নিরীক্ষণকার চৌধুরীবাবু যিনি খাবারের অর্ডার নিতেন আর পরিবেশন করতেন, তাঁর তাচ্ছিল্যভরা মুখ আমায় হতাশাগ্রস্ত করে দিত। গণেশদা থাকলে অবশ্য আমার ভয় থাকত না। কারণ উনি জানতেন আমি চা-পান করি না তাই অন্যের জন্য অর্ডার দিয়ে চৌধুরীকে পুষিয়ে দিতেন। সাধারণত আমাদের আড্ডায় কোও ব্যক্তিগত সমস্যা স্থান পেত না। আমাদের কোনও বাস্তব বেদনা যন্ত্রণা অভাব আছে মনেই হত না। আলোচনায় কল্পিত সমস্যাই ছিল মুখ্য বিষয়। তাও ব্যক্তিগত নয়— অন্য কারও। অন্তত যিনি তখন সেখানে উপস্থিত নেই— হয় বিদেশে কিংবা অন্য গ্রহে। এক এক দিন এক এক জন মধ্যমণি হয়ে উঠতেন। তাঁকেই সবাই ফোকাস করতাম। আমি কথোপকথনের চেয়ে বাচনভঙ্গি, শব্দ উচ্চারণ, লয়, এসবে মন দিতাম বেশি। সুশীলদা ছিলেন সোসাইটির সদস্য আর তালতলা স্কুলের ড্রইং টিচার। আড্ডার আজীবন সদস্য। গাঢ় কালো গায়ের রং— পরতেন সাদা ধবধবে শার্ট আর ধুতি। হাত গোটানো থাকত সব সময়। কথা কম বলতেন আর একটু শ্লেষ থাকত উচ্চারণে। আমাদের বন্ধু কার্তিক কোন বয়সি একেবারেই বোঝা যেত না। জলরং করত বিনোদ। আর নিয়ম করে আসতেন গণেশদা, গণেশ পাইন। ঢুকেই কয়েকটা টেবিল ছেড়ে ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বসতেন। এটা ঠিক পাতি রেস্টুরেন্ট ছিল না। বড় বড় কাপে চা, টোস্ট, ওমলেট, ব্রেস্ট কাটলেট, কবিরাজি, মাংসের চপ, ডিমের ডেভিল এসব পাওয়া যেত। অনেকেই লাঞ্চ-ডিনার সেরে নিতেন এভাবেই।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় টয়োটো গাড়ি থেকে নেমে এলেন মুস্তাফা মানোয়ার। এক সময় আর্ট কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন। তখন এ শহরে কামরুল হাসান থেকে তরুণ তুর্কি সাহাবুদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে এপার-ওপার বাংলার শিল্পীদের বিশাল প্রদর্শনীর তোড়জোড়। আড্ডাও এই ঠেকে চলত সমান তালে।

সোডা ফাউন্টেনের আড্ডায় কবি লেখকেরা তেমন একটা আসতেন না। তবে হ্যাঁ, টুঁ মারতেন মাঝে মাঝে। চেয়ার দখলে রাখত চিত্রীরা। ওই অঞ্চলটা তো মিশ্র মানুষের— তাই প্রায়ই দেখতাম বোরখা ঢাকা রমণীর সঙ্গে কেউ, কিংবা কোনও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা ধর্মতলার হিপি ভবঘুরে। রবীন মণ্ডল, সুহাস রায়, সুনীল দাস থেকে তরুণতর অনেকেই চলে আসতেন। সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারির সদস্যরা, ক্যালকাটা পেন্টার্সের প্রায় সব সদস্যরই আনাগোনা ছিল এই ঠেকে। আর্ট ফেয়ার

যখন শুরু হল, সে সময় অহিদা (অহিভূষণ মালিক) চলে আসতেন আনন্দবাজার থেকে, গৌরকিশোর এসেছেন চুরুট মুখে, শ্যামল দত্তরায় মাঝে মাঝে। ওই আড্ডার প্রথম দিকে বিকাশদার স্টুডিয়ো গ্রান্ট লেনে কিছু সময় কাটিয়ে চলে যেতাম কে. সি. দাস-এর দোকানে কচুরি খেতে। এ এক নিত্য ঘটনা ছিল বেশ কিছু দিন। তারপর সোডা ফাউন্টেনে আড্ডা। রাত গড়িয়ে এলে উলটোদিকের ট্রাম ধরে এসপ্ল্যানেড গুমটি ঘুরে সেই শ্যামবাজারগামী ট্রামে চেপে আমি আর বিকাশদা ফিরতাম নিজ নিজ কুলায়। সত্তর দশকের পুরো আর আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত আমাদের যাতাযাত আড্ডা আকর্ষণ সবই ছিল ধর্মতলার মোড়ের ওই রেস্তোরাঁর প্রতি। ইতিমধ্যে বিদেশ গেছি কয়েকবার। বড়বড় মিউজিয়ামে ঘুরেছি একা একা। সেই স্বর্ণখনি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে কখন কীভাবে আমি এই উপভোগেব অনুভূতি উদ্গার করব সোডা ফাউন্টেনের স্বজন আড্ডায়। গণেশদা বলবেন— শুভা এবাবে পল ক্লির কোন ছবিটা দেখলে। কিংবা মাতিস, শ্যাগল বা ম্যাক্স আর্নেস্ট?

প্রায় একই সময়ে দুপুবে চলে যেতাম সুবর্ণরেখায় ইন্দ্রদার হ্যারিসন রোডের দোকানে। স্তূপীকৃত অজস্র পুরনো বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকজন। একদিকে ছোট টেবিল নিয়ে বসে আছেন নির্মাল্যদা হয়তো পাশে বিমানবাবু। মধ্যমণি কমলকুমার মজুমদারকে ঘিরে বেলাল চৌধুরী, মতি নন্দী, সুনীলদা। কখনও চলে এসেছেন দিল্লি থেকে অশোক মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য। এছাড়াও বিভিন্ন পেশার নানান বর্ণময় ব্যক্তিত্বেরা আসতেন দুপুরের আড্ডায কমলদা আর পুরনো বইয়ের আকর্ষণে।

পৃথিবীর কোনও কিছুই বাদ যেত না সে আড্ডায়। রামপ্রসাদ থেকে ফুকো, মার্কস থেকে ফবিজম সবই আলোচ্য— আব ঢ্যাঙ্গা (মানিকবাবু) বেক্ষো থেকে বিভূতি বাঁড়ুজ্যে সবাই। বিকেল ফুরিযে গেলে সন্ধ্যার ঢল নামলেই সব চলে যেতেন মাতাল হতে। সেই খালাসিটোলায়। সেখানে বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, শ্রমিক, চোর-পুলিশ, ধার্মিক-অধার্মিক, ভণ্ড একাকার হযে যেত। আসল সাম্যবাদী করে তুলত একটি গরল নির্যাস। এক প্রায়ান্ধকার পরিত্যক্ত ছাউনির তলায় সে পানশালা হয়ে উঠত এক অনন্য সঙ্গমস্থল।

সব আড্ডাই যেন বুঁদ হয়ে যাওয়ার এক শিহরন চায়। অলৌকিক অন্তিমতায় পৌঁছে যেতে চায়। তাই এক তরল গরল পদার্থ বড়ই জরুরি কিংবা কেন্দ্রসার। আমি কোনও দিন আড্ডার অলৌকিক অন্তিমতার সঙ্গী হতে পারিনি। টিনড্রামের অস্কারের মতো সাক্ষীই রয়ে গেছি। দেখেছি, শুনেছি, বুঝেছি। সজ্ঞানে, সচেতনে। কোনও তুরীয় অবস্থানে নয়। কোনও নির্যাসেই আমি অভ্যস্ত হতে পারিনি। তাই অ-সভ্য। আড্ডায় ঠেক পেলেও কোনও দলভুক্ত হতে পারিনি— কোথাও আজ পর্যন্তও!

সিনেমার আড্ডা: অবসরের গান

রাজা মিত্র

বাংলার সিনেমার সমাজে আমাদের অনুপ্রবেশের উৎস আড্ডা। তখন আমরা সকাল সন্ধে আড্ডা মারতাম বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে একটা ফুটপাথের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে। এখন যে গৌতম ঘোষ, তাকে আমরা ডাকতাম 'গোদার ঘোষ' বলে। তখন থেকেই গৌতমের শয়নে-স্বপনে নিশিজাগরণে শুধু সিনেমা। বয়সে ছোট হলেও সে ছিল আমাদের গুরুপ্রতিম। সেই আমাদের সিনেমা তৈরির কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। তারই উদ্যোগে আমরা সরলা মেমোরিয়াল হল-এর বাইরে ফিল্ম সোসাইটির কোনও বিশেষ সিনেমা শো-তে উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতাম হা-পিত্যেশ করে, যদি কোনও পরিচিত সদস্য বা উদ্যোক্তা আমাদের করুণাবশত হলে ঢুকতে দেন। সোসাইটির মেম্বারশিপ নেওয়ার আর্থিক সঙ্গতি, বলা বাহুল্য, আমাদের ছিল না। এই প্রক্রিয়াতেই আমরা বিশ্বখ্যাত ছবিগুলি দেখে নিয়েছি। এক সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ধরাধরি করে আনিয়েছি প্রখ্যাত ব্রিটিশ তথ্যচিত্রগুলি। গ্রিয়ারসন, পল রটা, বেসিল রাইট, বার্ট হ্যানস্ট্রা— এঁদের তৈরি বিশ্ববিশ্রুত ছবিগুলি। লাইব্রেরির/কাউন্সিলের প্রায় ফাঁকা অডিটোরিয়ামে ছবি দেখার পরদিন সকালে ওই কাঠের বেঞ্চিতে বসে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা-আলোচনা চালাতাম।

একবার দুর্গাপুজোর সময় আমরা ভাবিত ছিলাম পুজোর তিন-চারদিন আমরা বান্ধবীবিহীন কয়েকজন হতভাগ্য কীভাবে কাটাব? গৌতমের সহজ সমাধান— 'কেন? আমরা চারদিন অহোরাত্র সিনেমা নিয়ে আলোচনা করে কাটাব। এর চেয়ে ভাল বিনোদন আর কী হতে পারে।' প্রাত্যহিকের এই আড্ডাতেই আমরা ঠিক করেছিলাম— চাকরি-বাকরি করা আমাদের পোষাবে না এবং আমরা শুধুমাত্র তথ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করব এবং পেশাদারি হব। যদিও পরবর্তী সময়ে আমাদের সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে হয়েছে।

রাসবিহারী মোড়ে অমৃতায়ন রেস্টুরেন্টে যে আড্ডা বসত সেখানে রাণা সরকারকে কেন্দ্র করে আমাদের একটা সিনেমার আড্ডা জমত। রাণা ছিল তাত্ত্বিক। সে ওই তরুণ বয়সেই 'আন্তর্জাতিক আঙ্গিক' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করত। ওই পত্রিকা এবং অমৃতায়নের আড্ডা ছিল আমাদের সিনেমাপ্রেমীদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। সেই রাণা এখনও আছে এবং রাসবিহারী মোড়ের কাছে গীতা এবং তার ভাইদের ফুটপাথের চায়ের দোকানে আমাদের মাঝে মধ্যে দেখা হয় এবং সিনেমা নিয়ে অল্পবিস্তর কথোপকথন চলে। আমাদের কারুরই আর আগের মতো ম্যারাথন আড্ডা দেওয়ার অবসর কোথায়?

যে সময়কে বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ বলা হয় সেই সময়ের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ আমাদের হয়নি। টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো চত্বরে আমাদের যখন আনাগোনা শুরু হল তখন বাংলা ছবি প্রায় হিমযুগের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য, হৃদয়গ্রাহী সুর, অভিনয় সৌকর্য এবং বাংলা ছবির একান্নবর্তী পরিবারের মতো কাজের পরিবেশ ক্ষীয়মাণ। চিত্রনাট্যকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রায় অবলুপ্ত, বড় মাপের অভিনেতাদের গৌরব এবং প্রবাদপ্রতিম ইমেজ ছায়াচ্ছন্ন। আমরা শুধু বিগত দিনের কাজের পরিবেশ এবং তার আনন্দঘন মুহূর্তগুলির কথা লোকমুখে শুনতাম।

কিন্তু ওই আনন্দঘন মুহূর্তগুলির মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগত কাজের ফাঁকে ফোকরে কিংবা কাজের শেষে মেকআপ রুমে স্টুডিয়োর নিরাপদ খোলা চত্বরে সমস্ত কলাকুশলী, অভিনেতাদের সান্নিধ্যে নানা ঠাট্টা তামাশা রসিকতার বর্ণনাগুলি শোনা। বাংলা ছবিতে যাঁরা বিশেষত কমেডি চরিত্রে অভিনয় করতেন ব্যক্তি জীবনেও তাঁরা ছিলেন অসামান্য রসবোধের অধিকারী। বাংলা ছবির ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের অনুপ্রবেশের ক্ষণে তাঁরাও সায়াহ্ন কালের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের কেন্দ্র করে যে উপভোগ্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠত তখন তাও ক্ষীয়মাণ। তবু তার মধ্যেই ওই সব নটনটী কলাকুশলীদের যে সান্নিধ্য আলাপচারিতার সুযোগ আমরা সেই তরুণ বয়সে পেয়েছি আমাদের মনের মণিকোঠায় তা আমরা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছি।

প্রসঙ্গত, অভিনেতা রবি ঘোষের কথা মনে পড়ছে। তখন তিনি আমার 'নয়নতারা'-তে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। ব্যতিক্রমী এই জন্যেই বললাম, তাঁকে আমি নিয়েছিলাম একটা সিরিয়াস ধরনের চরিত্রে। রবি ঘোষ-এর মতো বড় মাপের অভিনেতা এবং মানুষ আমি বাংলা ছবির ক্ষেত্রে খুব কমই দেখেছি। একদিন শ্যুটিং প্যাকআপ হয়ে গেল বেশ তাড়াতাড়ি। রবিদা বললেন, এখন আর বাড়ি গিয়ে করবটা কী। ভাল কথা, আমরা মেকআপ রুমে আড্ডা

জমালাম। সেদিন রবিদা তাঁর দেখা শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিচ্ছিলেন। শিশির ভাদুড়ীর বৈশিষ্ট্য কী, কেন তিনি বড় মাপের অভিনেতা তার টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ। এর সঙ্গে সঙ্গে রবিদা অভিনয় করেও দেখাচ্ছিলেন। একটা জায়গায় আলমগীর নাটকে শিশিরবাবুর মঞ্চের পাদচারণা এবং টপলাইট নেওয়ার ব্যাপারে তিনি কতখানি সচেতন থাকতেন তা বোঝাতে বোঝাতে কী ভাবে ভাদুড়ীমশাই আলখাল্লার ওপরে ফেলে রাখা শালটিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে টেনে অন্য কাঁধে ফেলতেন সেটা রবিদা দাঁড়িয়ে উঠে সংলাপ সহ অভিনয় করে দেখালেন। মেকআপ রুমের স্বল্পপরিসরে নাতিদীর্ঘ রবি ঘোষ যেভাবে ওই দৃশ্য করে দেখালেন তাতে আমরা স্তম্ভিত। তাঁকে তখন মনে হচ্ছিল মুঘল সম্রাট আলমগীরের মতো বিশাল একটি মানুষ।

আড্ডা দেওয়ার ব্যাপারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সাহিত্য, নাটক এবং সিনেমা এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি একজন কৃতীমান আড্ডাধারী। শুনেছি প্রায়শ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে এক্ষণ সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য, আইপিটি-র নির্মল ঘোষ, রবি ঘোষ প্রমুখের ম্যারাথন আড্ডা বসত। ডাবিং-এর পুরনো পদ্ধতি লুপ ডাবিং প্রথা যখন চালু ছিল অর্থাৎ ছবির একটি দৃশ্যকে চক্রাকারে প্রোজেক্টারে চালানো হত এবং অভিনেতা শ্যুটিং এর সময় উচ্চারিত সংলাপ পুনরায় স্টুডিয়োতে সেই সংলাপ উচ্চারণ করতেন এবং সেটাই রেকর্ডেড হত। এখন অবশ্য সেই প্রথা পালটে গিয়ে আরও আধুনিক সিস্টেমে ডাবিং করা হয়। যাই হোক, এই ডাবিং-এর ফাঁকে ফাঁকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের আড্ডা চলছে স্টুডিয়োর বাইরে গাছতলায়। সহকারী পরিচালক সৌমিত্রদাকে এসে ডাকল তাঁর ডাবিংয়ের জন্য। সৌমিত্রদার তখনও চা খাওয়া শেষ হয়নি। উনি বলে উঠলেন, এক মিনিট, তুমি মাধবীর লুপটা আপাতত লাগিয়ে দাও। আমরা সকলে মুখ টিপে হাসতে লাগলাম। তখন জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে লুপ লাগানোর প্রথা প্রবল ভাবে বিজ্ঞাপিত হত। আড্ডা দিতে দিতে একটি লাল রংয়ের খেরো খাতায় সৌমিত্রদাকে কবিতা লিখতেও দেখেছি। স্টুডিয়োর আড্ডায় সৌমিত্রদা বেশির ভাগ সময়ই হয় সিনেমা নয় মঞ্চ এবং মঞ্চাভিনয় নিয়েই কথা বলতেন। মঞ্চের প্রতি তাঁর অনিবারণীয় আগ্রহ আমাদের বিস্মিত করত। উনিও আমাদের জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়-এর অনবদ্য পাদচারণার কথা বলতেন এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় ক্ষমতার কথা বলতেন পঞ্চমুখে। নিজের সম্বন্ধে ক্বচিৎ কদাচিৎ।

এবার উত্তমকুমার প্রসঙ্গ। বাংলা ছবির প্রবাদপ্রতিম এই মানুষটি খুব খোলামেলা আড্ডাধারী এ কথা বলা যায় না। তাঁর সঙ্গে আমাদের কথোপকথন হত মেকআপ

ক্রমে মেকআপ চলাকালীন। আপাত দৃষ্টিতে উত্তমকুমার ছিলেন স্বল্পবাক এবং সংযত বাক। কিন্তু কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করার পর বুঝেছিলাম তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ। আমরা তখন সহকারী পরিচালক, উনি কথা বলার চাইতে কথা শুনতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আমাদের কাছে বিশেষত বিদেশি চলচ্চিত্র এবং অভিনেতা-পরিচালক এঁদের সম্বন্ধে জানতে চাইতেন। আমরাও প্রবল উৎসাহে গোদার, ত্রুফোঁ, ভিসকন্তি, কুরোসাওয়া, ডি-সিকা প্রমুখের বিষয়ে আমাদের ধ্যানধারণার কথা বলে যেতাম। এমনও হয়েছে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর গাড়িতে তাঁর ময়রা স্ট্রিটের বাড়ি পর্যন্ত আমরা গিয়েছি এবং বেশ রাত্রি করে পানাহার সাঙ্গ করে ফিরেছি। ওঁর বাড়িতে আমাদের ওই আলাপচারিতায় বিশেষ মন্তব্য না করেও খাদ্য সরবরাহ এবং সাধ্যমত সঙ্গ দিতেন বেণুদি বা সুপ্রিয়া চৌধুরী। উল্লেখযোগ্য এই যে উত্তমকুমার সব সময়ই আমাদের মতো তরুণদের আপনি সম্বোধন করতেন এবং বেণুদি সর্বদাই তুই।

সিনেমার আড্ডা সবচেয়ে ভাল জমে আউটডোর শ্যুটিংয়ে। আমি নিজে যে সামান্য কটি ছবি করেছি তাতে স্টুডিয়ো ফ্লোরে কোনও কাজ করিনি। আমি পছন্দ করি লোকেশন শ্যুটিং। অনেক আউটডোর শ্যুটিং-এ আমি অন্যান্য মালপত্তরের সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়াম নিয়ে যেতাম। শ্যুটিং-এর অবসরে অথবা শেষে আমরা গানবাজনার আসর জমাতাম। এ রকমই একটা অবসরে আমি আবিষ্কার করেছিলাম অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী চমৎকার পুরাতনী বাংলা গান গাইতে পারেন। উনি গান শিখেছেন চণ্ডীদাস মাল-এর কাছে। এছাড়া শকুন্তলা বড়ুয়া চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে। কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে ওঁর। শ্যুটিং-এর শেষে চমৎকার আড্ডা, গানবাজনার আসর বসত আমাদের বর্ধমান জেলার খন্যান কুণ্ডুবাড়ির আউটডোর শ্যুটিং-এর সময়। এমনও হয়েছে স্থানীয় গান জানা কাউকে খুঁজে বার করেছি আমি। সব মিলিয়ে আউটডোর শ্যুটিং-এ ভারী চমৎকার একটা আন্তরিক পরিবেশ গড়ে তোলা যেত। এতে কাজেরও সুবিধে হয়। স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতা পাওয়া যায় সহজেই।

আউটডোর শ্যুটিং-এ আর একটি আনন্দদায়ক ঘটনা হচ্ছে যাত্রাপথ। সবাই মিলে একটা বাসে করে লোকেশনে যাওয়ার দীর্ঘপথ অতিক্রমের সময়ে নানান গল্পগুজব, গান, আবৃত্তি, মন্তব্য এই সবের মধ্যে দিয়ে যাত্রাপথের সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি শুধু কেটে যায় তাই নয়— মনে হতে পারে যাত্রাপথ যত দীর্ঘ হয় ততই মঙ্গল। শিল্পী কলাকুশলীদের নিয়ে সমবেত এই লোকেশন যাত্রার আনন্দ অন্যরা হয়তো ভাবতেই পারবে না। দারুণ ছিল এর আনন্দ, এর উত্তেজনা। আবার শ্যুটিং পর্ব সেরে ফেরার পথে যাকে বলে হরিষে বিষাদ। সেও এক অনন্য অনুভূতি।

বাংলা সিনেমাকে কেন্দ্র করে আড্ডার সেই সুবর্ণযুগ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ভিডিয়োর অনুপ্রবেশের পর শিল্পী ও কলাকুশলীদের আর্থিক দুরবস্থা অনেকটাই কেটে গেছে ঠিকই কিন্তু সেলুলয়েড সিনেমার সেই কঠিন পরিশ্রম, নির্মাণ কুশলতা, নির্দেশনা, শিল্প নির্দেশনা, সংগীতের চিন্তালব্ধ ব্যবহার, আলোকচিত্রীর বিশেষ ভূমিকা সব কিছুই পালটে গেছে। এখন শিল্পী কলাকুশলীদের অবসর কম। দিনে একাধিক শিফ্‌ট-এ কাজ করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। সেই কারণেই আড্ডা— যাকে আমি বলি অবসরের গান, তারও গৌরব অপস্রিয়মাণ।

কমেডি রোলে দুই মহাতারকা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়কে আমরা দেখেছি তাঁদের অভিনয় জীবনের শেষ পাদে। শুধু শ্যুটিং-এর সময় নয়, ওঁরা যতক্ষণ স্টুডিয়ো বা লোকেশনে থাকতেন ততক্ষণই সারা ইউনিটকে জমিয়ে রাখতেন। তাঁদের রসের ভাণ্ডার ছিল অফুরান। এ প্রসঙ্গে ভানুদার আড্ডায় কথিত দু-একটি উক্তির কথা বলি। ভানুদা সাধারণত মদটদ একেবারেই খেতেন না। একদিন বললেন, বুঝলে আমার মদ খাওয়া বড় দায়। এক পেগ মদ খাওয়ার খরচ দু-তিনশো টাকা! আমরা প্রশ্ন করলাম— কেন ভানুদা, এক পেগ মদের দাম তো বার-এ গেলেও বড়জোর বারো-তেরো টাকা। তখন ভানুদা বললেন, আমার এক বন্ধু একটা মদের ছোট্ট বোতল বিদেশ থেকে ফিরে আমায় উপহার দিল। আমিও সেটা আলমারির বইয়ের ফাঁকে লুকিয়ে রেখে দিলাম। তোদের বউদি জানতে পারলে অনর্থ বাধাবে। তারপর একদিন আর সহ্য হল না, ওই বস্তুর স্বাদ একবার নেওয়া দরকার। তোদের বউদিকে বললাম— যাও না তোমার কী সব শখের জিনিসপত্র কেনার কথা বলছিলে, যাও নিউ মার্কেটে গিয়ে কিনে নিয়ে এসো। দিয়ে দিলাম শ-তিনেক টাকা। আমি জানি আমার বাড়ি থেকে নিউ মার্কেট যাওয়া আসা কেনাকাটার অনেক সময় যাবে। তোদের বউদি আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যেতেই আমি আলমারি থেকে ওই বোতল বার করে আস্তে আস্তে গেলাসে এক পেগের মতো ঢেলে জল মিশিয়ে চুক চুক করে খেতে লাগলাম। খেতে মোটেই ভাল না। তোরা যে কী মুখে খাস! তারপর তো বসেই আছি নেশা আর হয় না। হবে কোত্থেকে, সারাক্ষণ টেনশন, ওই বুঝি তোদের বউদি এসে পড়ল। তারপর বুঝলি উনি যখন কেনাকাটা সেরে ফিরলেন তখনও আমার নেশা হয়নি, আর বুকের মধ্যে তিনশো টাকার দুঃখ উথলে উঠছে। তোরাই বল, এত দায় নিয়ে মদ খাওয়া যায়!

ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তর— আমি এসবে একেবারেই বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে ভাল লাগে জন্মান্তর বলে যদি কিছু থাকে তো তাহলে আমি আবার এই চলচ্চিত্র শিল্পের একজন শরিক হয়ে জন্মাতে চাইতাম। অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, শুধু ছবি নির্মাণের নানান স্মরণীয় কিংবা সামান্য মুহূর্তগুলোর সাক্ষী হওয়ার লোভে।

কলকাতার দক্ষিণ দরজায়

সুভাষ ঘোষাল

কবে থেকে যে আড্ডা দেওয়ার কাজটা শুরু হয় আমার জীবনে তা বলা সত্যিই দুরূহ। আড্ডার মতো নির্ভেজাল বস্তু পাওয়ার জন্য যৌবনের একেবারে শৈশব থেকে আমার মধ্যে যে আকুতি জন্মায় তার কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। বাড়ির সামনে চিরকাল লেক পেয়ে এসেছি। জানা-অজানা গাছের তলায় বসে, অথবা ঘাসের ওপর উপবিষ্ট থেকে বৃক্ষসমাজের দিকে চোখ রেখে একজন বা দুজনের মুখোমুখি হয়ে যেসব সকাল দুপুর বিকেল বা গোধূলিবেলা কাটাতে চেয়েছি, তার মধ্যে যে একেবারেই আড্ডার প্রাণভ্রমর ছিল না তা জোর দিয়ে বলা কঠিন আজ। বরং আজ মাঝে মাঝে মনে হয়, 'চাই, বেল ফুল চাই' বলে যে ডাক দিয়ে মিলিয়ে যেত, কিংবা যে কুলপিমালাই বিক্রি করত গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে, তাদের দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে চিনেবাদাম খাওয়ার যে মজা তার মধ্যেই লুকিয়েছিল প্রকৃত আড্ডার বীজ। সত্যি কথা বলতে কী, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে যে ছুটি পাওয়া যায় সেই ছুটি থেকেই আমি প্রথম বুঝতে পারি আড্ডা কাকে বলে, কী তার স্বরূপ। সেদিক থেকেও বাড়ির কাছের এই গাছগাছালি আর কৃত্রিম জলাশয়ে ঘেরা অকৃত্রিম ভূমগুলের অবদান অনেকখানি। আমরা আট-দশটি ছেলে জলধারার একেবারে পাশে বসতাম বিকেলবেলায় নিয়ম করে। মনে পড়ে এক আলোচ্য বিষয় থেকে আর এক আলোচ্য বিষয়ে চলে যাওয়ার অসম্ভব ক্ষমতায় পরিপূর্ণ সেই দলে আমাদের এক সদস্য কেবলই তার চুল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করত। অত অল্প বয়সে যার চুল পাতলা হতে শুরু করে তার পক্ষে কী করে সম্ভব ঘনভাবে জড়িয়ে পড়া পরিমণ্ডলে? তাই তার মধ্যে বয়সের অস্থিরতার সঙ্গে মিশেছিল একটা বাড়তি চাঞ্চল্য। মনে আছে, ঝুঁকে পড়ে অপরের মাথায় হাত দিয়ে চুল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার অভ্যেস ছিল তার। এইভাবে সে আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা ভয়ের সংক্রমণ

ঘটিয়েছিল। আমরা সেখানে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভাবতাম, স্নানের পর চিরুনি যতখানি চুল বিযুক্ত করে তার পরিমাণ তো কম নয় খুব একটা। এইভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দিকে কোনও মৃগনয়না বা মীনাক্ষীর থাকবে না কোনও কটাক্ষ। ফলে লেকের আড্ডায় আনন্দের পাশাপাশি বিরাজ করেছে আশঙ্কাও।

স্নাতক আর স্নাতকোত্তর পর্ব পার হতে হতে পাঁচ-ছ বছর লেগে গেছে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ এই কালখণ্ডে বড় আড্ডা আর ছোট আড্ডা দুই-ই ছিল প্রভূত পরিমাণে। বড় আড্ডা বসত কখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের প্রাঙ্গণে, কখনও বা যাদবপুরের কফি হাউসে। এই আড্ডার সবচেয়ে বড় পরিচয় লুকিয়ে থাকত ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের যে অকুণ্ঠ মেলামেশা তার স্নিগ্ধতার মধ্যে। আমার সতীর্থদের মধ্যে ভবিষ্যতের গায়ক ছিল, ছিল ভাবীকালের শিক্ষক আর সমালোচক, এমনকী কবি, এমনকী দূরদর্শনের মতো তখনও অনাগত একটা মাধ্যমের ভবিষ্যকর্ণধার। সুমন চট্টোপাধ্যায় শুধু গানই গাইত না, বুঝতে চাইত কবিতার যোগসূত্র। এখন শান্তিনিকেতন পাঠভবনের যোগ্য শিক্ষক গৌতম ভট্টাচার্য কলাভবনের ঘাসে বসেই তখন শ্রুতিছন্দের কথা বলত হাসতে হাসতে।— ছন্দ কিন্তু ভাই একটাই, শ্রুতিছন্দ। যতই তোমরা নানা নাম দিয়ে ভাগ করো না কেন। পঙ্কজদা, পঙ্কজ সাহা, হাতে ব্যাগ নিয়ে তখনও ব্যস্ত। তবে 'দর্শকের দরবার'-এ নয়, আমাদের মতো অনুজদের দরবারে। কফি হাউসের একটা টেবিল কয়েকটা চেয়ার এনে ঘিরে ফেলে আমরা একদিন ঠিক করেছিলাম সবাই চাঁদা দিয়ে এমন একটা কাগজ করব যাতে কেবল কবিতাই ঘরসংসার করবে, আর কেউ নয়, আর কিছু নয়। আমরা সবাই সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকব, সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবে পঙ্কজদা। বেরিয়েছিল 'পিপাসা পরিক্রমা' আড্ডা দিতে দিতে একাধিকবার। মনে আছে সংস্কৃতের ইন্দিরা সবার নামের আদ্যক্ষর জুড়ে জুড়ে একটাই কবিতা লেখার চেষ্টা করে এবং তা ছাপাও হয় অচিরাৎ।

ছোট আড্ডাটার সদস্য ছিল দুজন— আমি আর স্বপন। এখন ডা. স্বপন ভট্টাচার্য, রাঁচির 'ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'-এর কৃতী অধ্যাপক। কখনও কখনও বড় আড্ডার হাতছানি এড়িয়ে আমরা দুজন সোজা চলে আসতাম যাদবপুরের কোণে স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দোতলা বাসগুলোর একেবারে কাছে যে দোকান সেই 'কাফে দ্য কানাই'-তে। সেটা ছিল মিষ্টির দোকান এবং চায়ের দোকানও একই সঙ্গে। কানাইদা ক্যাশে বসে থাকতেন স্থির হয়ে। তিনি ছিলেন কালো। বছরের পর বছর নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে তিনি দোকানের অস্থিরতার দিকে তাকিয়ে

থাকতেন রোজ। তাঁর চোখের সামনেই চা আর কেক নিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমাদের কত দিন যে চলে গেছে। কিংবা আমরা বড় হয়ে উঠেছি একটা প্রায় অপলক দৃষ্টির পটভূমিকায়।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার মুখে একটা নতুন আড্ডার মাঝখানে এসে পড়ি। গড়িয়াহাটের মুখে একটা প্রবেশপথ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা চত্বর, হিন্দুস্তান মার্ট। তার ডানদিকে ছিল মন্টুদার জর্দার দোকান। বাঁদিকে রেস্তরাঁ। যারা কবিতা লিখতে চাইছি, গল্প লিখতে চাইছি তারা বসতাম রেস্তরাঁয় চায়ের কাপ হাতে করে। আর যাঁরা গান লিখে নাম করেছেন, নাম করেছেন ছবি পরিচালনা করে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন মন্টুদার সামনে। যেমন সুবীর হাজরা, যেমন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। আমি, শুভ মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, শচীন দাস, সমরেন্দ্র দাস কবিতা আর গল্প নিয়ে আলোচনা করতে করতে কতবার উঠে এসেছি মন্টুদার সামনে। সুবীরদা তখন আরতি মুখোপাধ্যায়ের স্বামী। একটা বিদেশি ছবির আলোচনায় নেমে তিনি বলে উঠেছিলেন— কান্না প্রায় গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। সমরেন্দ্র-শুভরা পঁচিশে বৈশাখে বের করত 'কবিতা পঁচিশে'। সেই বেশ লম্বা ভাঁজ করা পত্রিকা নিয়ে সাতসকালে রবীন্দ্রসদনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে হাত থেকে হাতে হাতে চলে যেতে সময় লাগত না আমাদের কবিতার। মানুষের কাছ থেকে পেতে পেতে জমে যেত খুচরো বিপুলভাবে। সেখান থেকে ফিরে হিন্দুস্তান মার্ট-এ। নিজেদের টেবিলে জড়ো হয়ে চায়ের কাপ হাতে খুচরোর হিসেব করতে করতে যে সময় কেটে যেত তার মধ্যে থাকত স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর অক্ষরবৃত্তের দাপট। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পৃথিবী তো তেইশ বছর' এই আড্ডায় প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়ার মুহূর্তটি ভুলিনি কিন্তু। প্রত্যেকেই হাতে নিয়ে পরম আগ্রহে পাতা ওলটাচ্ছে। এত প্রাচীন পৃথিবীতে দৃষ্টির সেই নবীনতা ভোলা যায় না কোনও মতেই।

হাজরার মোড়ে 'যোজনগন্ধা'য় আশুতোষ কলেজের অধ্যাপকরা আসতেন। আসতেন এমন সব মানুষ যাঁদের কানে পৌঁছেছে সেই অপরিসর দোকানের আভিজাত্যের কথা। আমরা দুই বন্ধু মিলে তখন সাহিত্যপত্র 'হীনযান' বের করছি। হাজরার দমকল অফিসের পাশেই প্রেস। প্রেসের মালিক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'যোজনগন্ধা'র মুখার্জিদার আতিথ্যপরায়ণতা। মুখার্জিদা এবং বৌদি দুজনেই স্বহস্তে রাঙিয়ে তুলতেন তাঁদের এই দোকানটিকে। নিজে বাজারে গিয়ে দাদা যে মাছ কিনে আনতেন তার ফ্রাই স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ দায়িত্বে একটা অন্য স্বাদে পৌঁছত। ভাল মাছ, ভাল তেল, ভাল চা, ভাল ব্যবহার। ফলে জিনিসপত্রের দাম বেশ বেশি হলেও ক্রেতার তরফ থেকে কোনও ক্ষোভ ছিল না। আমি আর দিলীপ

চক্রবর্তী প্রেস থেকে ফেরার পথে পকেটের টানাটানিতে কখনও এক কাপ দামি চা দু'ভাগ করে খেয়েছি। আমাদের এই আড্ডায় মুখার্জিদাও যোগ দিতেন। দোকানে লোক না থাকলে নেপথ্য থেকে বৌদিও পাঠাতেন তাঁর কণ্ঠস্বর। মাঝে মাঝে আসতেন ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের আনন্দ মহারাজ। অধ্যাত্ম রাজ্যের সঙ্গে খুব বেশি করে যুক্ত থেকেও খুব বেশি করে হাসতে পারার ক্ষমতা, কারণে অকারণে, তাঁর মধ্যে দেখেছি। আর আসতেন আমাদের আর এক বন্ধু কাজল চক্রবর্তী। 'সন্দীপন' নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যকার ও পরিচালক। কালেভদ্রে এসে পড়তেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তথ্যচিত্রের জগতে যাঁর স্বাক্ষর যথেষ্ট পরিচিত। 'যোজনগন্ধা' বেশি দিন গন্ধ ছড়াতে পারেনি। মুখার্জিদা যাত্রার স্বপনকুমারের কাছে বিক্রি করে দিলে তা ওষুধের দোকানে রূপান্তরিত হয়। এরপর দেশপ্রিয় পার্কের 'শেলি কাফে'-তে চুনিদার সান্নিধ্যে কেটেছে অনেক দিন। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দ পড়ে গেলে কুস্তিপ্রেমিক এই মানুষটি ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শেলি কাফেও আর বাঁচেনি। কিন্তু বেঁচে আছে আড্ডা। নানা রূপে, নানা ভাবে। এই যে জানলা খুলে বসে থাকি, এটাও তো এক রকমের আড্ডা। একান্তে, নিজের সঙ্গে, নীরবেই।

রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ

একটি অশ্রুত যুগলবন্দি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

Ah, did you once see Shelley plain,
And did he stop and speak to you
And did you speak to him again?
How strange it seems, and new!

—Memorabilia : Robert Browning

১

এক অর্থে যে-কোনও লেখাই একটা আড্ডা, আমরা কেউ-ই তো নিজের সঙ্গে গল্প করব বলে লিখি না, আর শুধু নিজেই পড়ব বলে লিখি না। আমরা লিখি একটা পাঠকসমাজের জন্য, তাদের সংখ্যা যত বড় হয় এবং নিজের মনোমত হয় ততই ভাল। অর্থাৎ আমরা লেখার মাধ্যমে একটা বৃহত্তর আড্ডায় পৌঁছে যাই। আর কিছু কিছু লেখা আছে, যার শুরুই হয় এক ধরনের আড্ডা দিয়ে। এই যে রবিশঙ্কর-বিলায়েৎ লেখাটা, এটা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিলাম এই কারণেই যে তারাও এই মহান শিল্পীদের কথাবার্তাগুলো প্রায় আড্ডায় বসে শুনে ফেলার মতো শুনে ফেলবেন।

বলতে নেই এই দুই মহান শিল্পীর যে বইগুলো লিখে উঠতে পেরেছি তা ওদের সঙ্গে কথা বলে বলেই এবং পোশাকি সাক্ষাৎকার দিয়ে যে এটা সম্ভব ছিল না, তা রবিশঙ্করের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বুঝে যাই। আমি 'রাগ অনুরাগ' বইয়ের ভূমিকায় লিখেও ছিলাম যে, প্রথম যে-দিন রবিশঙ্করের সঙ্গে কাজে বসি সে-দিন আমার প্রশ্নগুলো ছিল টু দ্য পয়েন্ট, তথ্য আহরণের জন্য। কিন্তু কথা বলতে বলতে টের

পেলাম যে, এই বই করতে গেলে শুধু প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে হবে না, মানুষটার সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাকে আড্ডায় মজিয়ে তার প্রাণের উচ্চারণ উদ্ধার করতে হবে। বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের সঙ্গেও একই ব্যাপার। এরা প্রাণের উচ্ছ্বাসে এত সব বলে দিতে পারেন, যা প্রশ্ন করে বার করা অসম্ভব। এই লেখা যারা পড়বেন তারা এইটুকু ঠাওর করতে পারবেন যে, এমনতর বড় গুণিদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা একটা লাইফস্টাইল আর্ট। যার সবচেয়ে মন্ময় দিকটা হল একটা স্ফূর্তির মেজাজ, যা উছলে আসে, সাধারণ ভাবে আমরা যাকে বলি আড্ডা, তা থেকে।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর (১৯২০) ও উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর (১৯২৭-১৯৭৭) সঙ্গে যথাক্রমে 'রাগ-অনুরাগ' ও 'কোমল গান্ধার' বইয়ে কাজ শুরু করার আগে আমার পরিস্থিতিটা প্রায় একই ছিল। ১৯৭৭-এ 'রাগ-অনুরাগ' বইয়ের কথা যখন হচ্ছে তখন রবিশঙ্করের মনে বেজায় অভিমান জমে আছে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর ব্যাপারে। এই গোষ্ঠীরই ইংরেজি সাপ্তাহিক 'সানডে'-তে তার কিছু দিন আগে প্রচ্ছদকাহিনি প্রকাশিত হয়েছিল 'হু ইজ আওয়ার টপ সিতারিস্ট?' শিরোনামে। তাতে নিবন্ধকার রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁর তৎকালের বাজনার তুলনা করে আড়েঠাবে প্রায় বুঝিয়েই দিয়েছিলেন যে তাঁর ভোটটা পড়বে দ্বিতীয় জনের পক্ষে। এছাড়া সেই সময়ে এই পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রকাশনায় তাঁর অনুষ্ঠানাদির আলোচনায়ও তিনি বেশ ক্ষুণ্ণ ছিলেন। তাই মাঝে মাঝেই আমার সঙ্গে বই করার কথা উঠলেও তিনি দেখি-দেখছি করছিলেন। শেষে আনন্দ পাবলিশার্সের প্রতিনিধি বাদল বসুকে নিয়ে কাজের দিনক্ষণ নিয়ে কথা বলতে গেলাম। তিনি বলেই ফেললেন, তোমরা তো আমাকে নিয়ে বেশ একটা hot and cold খেলা চালিয়েই যাচ্ছ। এই রিভিউ লিখে পেড়ে ফেলছ, তার পরেই বলছ বই করব। তা তোমরা চাওটা কী?

শেষে রাজি হলেন এবং জানতে চাইলেন, কাল তো আমি মাদ্রাজ যাচ্ছি, সেখান থেকে তিন দিন পর দিল্লি। তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে? আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলে দিয়েছিলাম, পারব। কে টাকা দেবে, কে ছুটি স্যাংশন করবে, কদ্দিনের ট্রিপ হবে কিছুই মাথায় আসেনি। তারপর যখন সব ব্যবস্থা করেই নির্দিষ্ট সময়ে দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছি উনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে কৌতুক মেশানো গলায় কিছুটা প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, সেই এলে শেষ অব্দি, খোকা? আর আমার জানতে বাকি রইল না যে কয়েক বছর ধরে নেমে আসা অভিমানের পর্দাটা সামান্য হলেও সরেছে। খানিক বাদে প্লেনের প্রথম সারি থেকে হেঁটে আমার পাশের সিটে বসে পড়ে বললেন, এই নাও 'টাইম' ম্যাগাজিন পড়ো। And now tell me about yourself.

বিলায়েৎ খাঁর সঙ্গে যখন 'কোমল গান্ধার'-এর কাজে বসছি তখন অফুরন্ত ক্ষোভ শিল্পীর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। তার ক'দিন আগে রবিশঙ্করকে ভারতরত্নে ভূষিত করেছে সরকার, এবং ঘটনাটিকে এক মস্ত ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে গণ্য করেছেন বিলায়েৎ খাঁ। তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেছেন এবং সে-বৈঠক থেকে ফেরার পথে আমার দু'জন বন্ধুকে বলেছেন, এই শেষ। এসব নিয়ে আমি আর মুখ খুলব না। নিজের কথা যা বলার এবার বইতেই বলব। শঙ্করবাবুকে খবর করো, ও আমাকে নিয়ে বই করতে চেয়েছিল। ভাবছি এবার করব।

এই ডেকে পাঠানোরও এক ছোট্ট ইতিহাস আছে। তার বছর পনেরো আগে কলকাতার কলামন্দিরে এক দুর্ধর্ষ বাজনা বাজিয়েছিলেন বিলায়েৎ খাঁ। তার পরদিন পার্ক হোটেলে ওঁর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিই আনন্দবাজারের জন্য। সাক্ষাৎকার শেষে স্টাইলের মাথায় বললেন, এই টুকরোটাকরা interview-এ আর কতটা কী বলতে পারি? আরও বড় করে কিছু ভাবুন।

জিজ্ঞেস করলাম, মানে বই?

উনি কিচ্ছু বললেন না, নীরবে হাসলেন।

খাঁ সাহেব তো চলে গেলেন দেহরাদুনের ঠিকানা দিয়ে। বলে গেলেন, এই interview আর আপনার proposal পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়।

আমি লেখাপত্তর সব পাঠালাম, বইয়ের একটা বড়সড় পরিকল্পনাও। কিছু দিন গেল, মাস গেল, বছরও ঘুরল কিন্তু উস্তাদের কোনও জবাব এল না। শেষে অন্য কী এক কাজে দিল্লি গিয়ে ঠুমরি-দাদরার মহান শিল্পী নয়না দেবীর বাড়িতে নেমন্তন্নয় গিয়ে ভদ্রমহিলার মুখে শুনলাম যে, ইচ্ছে থাকলেও আমার সঙ্গে বই করায় অসুবিধে আছে বিলায়েৎ খাঁর। কারণ? আমি যে রবিশঙ্করের লোক। আমি না তাঁর 'রাগ-অনুরাগ'-এ কাজ করেছি।

সেই বিলায়েৎ খাঁ দশ বছর পর আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন তাঁর স্মৃতিচারণ শোনাবেন বলে! আমি খবর পেয়েই ফোন করলাম। উনি কী রকম বিষণ্ণ কিন্তু মিষ্টি গলায় বললেন, তুমি আমার বায়োগ্রাফি করতে চেয়েছিলে অনেক দিন আগে। বললাম, এখনও চাই। উনি হাসলেন, বললেন, তাহলে চলে এসো কাল। বুকের মধ্যে অনেক কথা জমেছে। তোমাকে শোনাই।

মাদ্রাজে টেপ চালিয়ে কথা শুরু করতেই দেখেছিলাম রবিশঙ্করের সব অভিমান কোথায় উবে গেছে, he was just his usual self। ভাসা ভাসা চোখে হয় উপরে সিলিংয়ের দিকে নয়তো নীচে কার্পেটের দিকে চেয়ে, চিন্তা করে করে সেতারের ঘরানা আর ইতিহাস নিয়ে বলে যাচ্ছেন। রায়চকে ওঁর treetop বাংলোর বারান্দায়

বসে অদূরের গাছগাছালি আর আর একটু দূরের নদীর দিকে চেয়ে বিলায়েৎ খাঁ যখন কথা শুরু করলেন ওঁর মুখ তখনও ক্ষোভে, অভিমানে অন্ধকার। শুরু হল ওঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা দিয়ে ঠিকই, কিন্তু দেখতে না দেখতে প্রসঙ্গ বদলে গিয়ে চলে গেল রবিশঙ্কর আর ভারতরত্নে। ততক্ষণ কথার মধ্যে যে একটা রোম্যান্টিক ঝিম ছিল ওঁর সেটা সহসা কেটে গিয়ে ভীষণ চাঞ্চল্য আর রাগ ধরা দিতে শুরু করল কথায়। বললেন, আর তার পরও বলছি, আমার বেশি দুঃখটা তো গভর্নমেন্টের দিকে নেই, বেশি দুঃখটা ওদের দিকেই যারা মুখ বুজে অ্যাওয়ার্ডগুলো নিয়ে নিয়েছে। তুমি বলছ রবিশঙ্করজি নাকি ভারতরত্ন নেওয়ার পর বলেওছেন যে এই সম্মান বিলায়েৎ খাঁরও পাওয়া উচিত ছিল। তা হলে উনি খেতাবটা নিয়ে নিলেন কেন? আমার তো বেশি দুঃখ গভর্নমেন্টের থেকে রবিশঙ্করজির ব্যাপারে, আজ তো আমার বলার turn তাই মুখ খুলে, বুক খুলে বলে নিচ্ছি। আমার পাওয়া উচিত যদি মনে করেই থাকেন তা হলে ভারতরত্ন নিয়ে নিলেন কেন? ভেতরে ভেতরে উনি তো ঠিকই জানেন যে মিউজিশিয়ান হিসাবে আমি আরও senior artiste on stage, আর আমি একটু বেশি ভাল বাজাই ওনার থেকে... সেটা উনিও জানেন।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম ওঁর একটু আগের রোম্যান্টিক লিরিকাল কথার মেজাজ ভেদ করে রাগ আর অভিমানের স্বরগুলো ফুটে উঠছে। আমার মনে পড়ল পনেরো বছর আগের সেই সাক্ষাৎকারে বলা ওঁর কথাগুলো। জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁর চোখে বিংশ শতাব্দীর সেরা পাঁচ যন্ত্রী কারা। তাতে বলেছিলেন, পাঁচ জন হবে না, চার জনের কথাই বলব— বিসমিল্লা খাঁ, আলি আকবর খাঁ, রবিশঙ্করজি আর আমি। ওঁর মুখে তখন রবিশঙ্করের নাম শুনে একটু অবাকই হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম অত বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম কি মুখে আনবেন? উনি কিন্তু বলেই গেলেন, সেতারের ব্যাপারে রবিশঙ্করজির নাম না করে উপায় আছে? এই সেতার যন্ত্রটার জন্যে উনি একাই যা করেছেন তার কি তুলনা আছে?

আর আজ? পরক্ষণে মনে পড়ল যে এটাই বিলায়েৎ খাঁ। দুই মেরুর মিলন ওঁর মধ্যে সারাক্ষণ, আলো-আঁধারের মেলামেশা, হাসি-কান্নার তীব্র ওঠাপড়া। আমার মনে পড়ল রবিশঙ্করের কথাগুলোও 'রাগ-অনুরাগ' রচনার সময়কার সাক্ষাৎকারের। জিজ্ঞেস করেছিলাম, হঠাৎ যদি শোনেন যে বিলায়েৎ খাঁর হাত পড়ে গেছে, কী মনে হবে আপনার? বললেন, যদি শুনি বিলায়তের হাত আর নেই তাহলে তো নিজের বাজনা চালিয়ে যাওয়াও কঠিন হবে। চল্লিশ বছর ধরে একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে আজ আমরা এখানে পৌঁছেছি। কাজেই হঠাৎ করেও থেমে গেলে তো মনে হবেই— তাহলে আর কার জন্য বাজাব!

কথাগুলো যে আঁতের কথা, নিছক দাঁতের কথা নয় তা আমি তত দিনে বুঝতে শুরু করেছি। রবিশঙ্কর বানিয়ে বানিয়ে মন রাখা কথা একদমই বলেন না; ঠোঁট কাটা কথা বলার ধাত নয় ওঁর, তবে কী প্রশংসায়, কী সমালোচনায় ভীষণই সংযত ভাষা ওঁর। আর বিলায়েৎ সম্পর্কে একটা সমীহ ও প্রশ্রয়ের জায়গা আছে ওঁর মনের এক কোণে।

একদিন যেমন লন্ডনে আমার নকশাল বন্ধু সুভাষ গাঙ্গুলির ফ্ল্যাটে বসে আমরা লংপ্লে রেকর্ডে বিলায়েতের জয়জয়ন্তী বাজনাটা শুনলাম। খুব মন দিয়ে, তারিফ করে বাজনাটা শুনলেন আর কয়েকটা জায়গায় মন্তব্য করলেন, আমাদের বাজনায় আমরা এটা কখনওই করব না। মানে এই পর্দাটা...ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন শিল্পী। তবে ওই পর্যন্তই। তারপর বিলায়েতের টোনের প্রশংসায় ফিরে গেলেন।

ওঁদের বাজনার মতোই রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ দুই স্পষ্ট, স্বতন্ত্র ধারার মানুষ। রবিশঙ্করের চিন্তাভাবনা ও কথায় সুন্দর স্বচ্ছতা, ভারসাম্য ও অফুরন্ত রস। বিলায়েৎ খাঁর পুরো ব্যাপারটাই কবিসুলভ, মানে আউল বাউল কবিদের মতো। খুব রঙিন ভাষা ওঁর, হিন্দি উর্দু ইংরেজি মেশানো বাংলা; আর ভাষার সহজ টানে কথা যে কোত্থেকে কোথায় যায় তা উস্তাদের খেয়াল রাখার চেষ্টাও নেই। 'রাগ-অনুরাগ' ও 'কোমল গান্ধার' টেপ থেকে উদ্ধার করতে করতে আমি দু'জনের দু'ধরনের বাজনাও যেন শুনতে পেয়েছি। রবিশঙ্করের কথায় ধ্রুপদ থেকে লোকসুরের মধ্যে নিত্য যাতায়াত আছে, বিলায়েৎ খাঁর কথায় রং আর তুলির খেলা যেন, কিছু বলাটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, একটা ছবি এঁকে দাঁড় করাতে হবে। এই ছবিগুলো যে সব সময় বাস্তবের ছবি তা হয়তো নয়। রবিশঙ্করের কথাতেও ছবি তৈরি হয়, তবে সে ছবি ছোট্ট ছোট্ট ডিটেলে আঁকা স্মৃতির ছবি। তবে দু'জনের কথার মধ্যেই মস্ত এক মিল এক জায়গায়। দু'জনের কথা থেকেই একটা নিঃসঙ্গ মানুষ বেরিয়ে আসে এক সময়। দীর্ঘ সময় ধরে কথা শুনে শুনে এও টের পেয়েছি যে দু'জনাই ভেতরে ভেতরে বড্ড দুঃখী মানুষ। বিলায়েৎ খাঁ বার বার সে-কথা বলে দেন, রবিশঙ্কর সেটা করুণ ভাবে চাপা দেওয়ায় ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ। এত স্বচ্ছ, স্পষ্টবক্তা মানুষটির ওই এক আলো-আঁধার এলাকা। আর বিলায়েৎ খাঁ, যিনি রহস্যে ভরা, রঙিন কথার জাল বোনেন, ওই নিঃসঙ্গতা ও দুঃখের প্রসঙ্গে দেদার সাপাট তান টেনে নেন। একটা পর্যায়ে দু'জনেরই কিন্তু খুব গর্বের জায়গা ওই দুঃখের জীবনটা। যেটা বাজনায় ধরা দেয়।

২

'রাগ-অনুরাগ'-এর পরেও রবিশঙ্করের সঙ্গে ওঁর বাল্যস্মৃতি নিয়ে একটা কাজ করেছিলাম আনন্দবাজারের পূজাবার্ষিকীর জন্য। সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী যার শিরোনাম করেছিলেন 'বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে আইফেল টাওয়ার'। পরে 'স্মৃতি' নামের একটি বই হয় এই রচনা নিয়ে। তাতে শিল্পীর যে মুখের ভাষা ও স্মৃতির চেহারা ধরা পড়েছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। আমার পড়া ও জানা পাঁচটি সেরা শৈশবস্মৃতির মধ্যে তা অনায়াসে এসে যাবে। ১৯৮৫ কি ৮৬-র এক দ্বিপ্রহরে কেনিলওয়ার্থ হোটেলে এক সুইটে ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। এক ফরাসি চলচ্চিত্র দল কলকাতায় এসেছিল শিল্পীকে নিয়ে একটা ছবি তোলার জন্য। ওদের হাজারও প্রশ্ন ও শটের ফাঁকে ওই তিনটে নির্জন ঘণ্টা কী করে বেরিয়ে এল আমি নিজেও জানি না। পরে বুঝেছি কারণ ছিল তিনটেঃ এক, মা। দুই, বাবা। আর তিন, কাশী। এই ত্র্যহস্পর্শের সামনে এক উথালপাথাল চলছিল রবিশঙ্করের মধ্যে। সে রচনার কয়েকটা নমুনা দিলে পাঠক আঁচ পাবেন কী ওঠাপড়া চলছিল আমার মনের মধ্যে যখন সামনে বসে শুনছি মহান শিল্পীর সেই চোখের জলে ভাসা স্মৃতিচারণা।

প্রথমে কাশীর কথাটা তুলে দিই।

"প্রায় সাতষট্টি বছর আগেকার কথা দিয়ে শুরু করতে পারি। আমার জ্ঞান হওয়া থেকে প্যারিস যাওয়া পর্যন্ত আমি কাশীতেই ছিলাম। জন্মও আমার কাশীতেই। আমার বাবা কাজ করতেন ঝাড়োয়ার স্টেটে, রাজস্থানে। তারপর উনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান বিলেতে। আমি তখন মাতৃগর্ভে। মা আমার তিন ভাইকে, এবং অবশ্যই আমাকে নিয়ে কাশীতে চলে আসেন। আমার জন্ম হয় সাতই এপ্রিল। তিলভাণ্ডেশ্বরের ঠিক মুখে, একটা ছোট্ট বাড়িতে। শুনেছি, আমার জন্ম নাকি ভোরবেলায়। তারপর যা আমার খণ্ড খণ্ড মনে আছে— আলাদা আলাদা বাড়ি। বিশ্বাস জমিদার ছিলেন আমার বাবার খুব বন্ধু। বাবা তাঁকে আমাদের গার্জেন করে গিয়েছিলেন, ফ্যামিলি দেখাশোনা করবার জন্যে। প্রথমে তাঁর বাড়ি। বাড়িটা ভুতুড়ে ছিল। সে বাড়ির একটা স্পেশ্যালিটি ছিল। উঠোনে রাত্রিবেলায় আগুনের গোলা এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে দেখা যেত। আমি শুনতাম, দেখতে যেতে চাইতাম, কিন্তু বড়রা দেখতে দিত না, বলত, শুয়ে পড়। ও বাড়ির আর একটা বিশেষত্ব ছিল— ওখানে একটা আত্মা ছিল, সে বিভিন্ন রূপ ধরে আসত। মা হয়তো কোনও দিন অনেক রাত্রে গেছেন কলঘরের দিকে, দেখলেন আমার এক মামা কলঘরে আছেন। ঘরে এসে দেখলেন, মামা শুয়ে আছেন। এই রকম হত। ..এরপর এলাম তিন নম্বর বাড়িতে। তিন নম্বর বাড়িটার বারান্দা ছিল গলির মুখে— রাস্তার ধারে।

এই বারান্দা থেকে যত মিছিল যেতে দেখতাম। তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের পুরুতরা সব 'হর হর মহাদেও' করতে করতে যেত। কখনও বিশ্বনাথের মন্দির থেকে আসত মিছিল। নানা রকম। আমার পক্ষে তখন ওটা ছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

"আর তৃষিত নয়নে দেখতাম আমাদের বাড়ির সামনে একটা বাড়ির বিরাট গেট, তখনকার চোখে আমার কাছে সেটা ছিল একটা প্রাসাদ। সেই বাড়িটা ছিল শ্রীশ দে'র। খুব বড় জমিদার ছিলেন। এবং উনি বেনারসের মহারাজার খুব কেউকেটো একজন ছিলেন। বাড়িতে প্যাকার্ড গাড়ি ছিল, দু'তিনটে মোটর ছিল, জুড়িগাড়ি ছিল। আর আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতাম ওদের ওই বড়মানুষি ব্যাপার। আর আমাদের তখন খুব দুরবস্থা। দুরবস্থা কারণ, ঝাড়োয়ার স্টেট থেকে বাবা একটা পেনশনের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, দুশো টাকা করে মাসে আসবে। এবং সে যুগে দুশো টাকা was an astronomical figure। কিন্তু যা হয়, রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, টাকা মারতে মারতে, শেষে ষাট টাকা আসত খালি। ষাট টাকায় মা খুব কষ্ট করেই সংসার চালাতেন। বাবাকে জানানো হয়েছে, কিন্তু বাবাও খুব উদাসীন ছিলেন। আমরা অনেক অ্যাপিল করেছিলাম ঝাড়োয়ার স্টেটে, কিন্তু কিছু হয়নি।"

কাশীতে এই অভাবের সংসারেই মাকে খুব কাছ থেকে দেখা হয়েছে রবিশঙ্করের। বলছেন: "যখন টাকার ঘাটতি পড়ত— জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি দেখেছি— মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মাথায় সিল্কের চাদর-টাদর ঢেকে ওই দুঃখী তেলীর কাছে যেতেন। দুঃখী তেলী খুব বয়স্ক ছিলেন এবং আমার মাকে মা বলতেন। মা অবশ্য বলতেন, তুমি আমায় মা বলছ— কিন্তু তুমি আমার ভায়ের মতন। তা যা বলছিলাম, মা প্রত্যেকবার হয় একটা শাড়ি, নয় নাকের ফুল এই সব দুঃখী তেলীর কাছে বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এই করে উনি আমাদের মানুষ করেছেন— কাউকে জানতে দেননি। কী অদ্ভুত! আমি ভাবি— কী strength of character ছিল। আমার দাদারাও জানতে পারত না। কেবল আমিই কিছুটা বুঝতাম। আমিই দেখতাম।"

'স্মৃতি' রচনাটির সবটাই প্রায় মায়ে ছেয়ে আছে। তার শেষও বম্বেতে মা'র সঙ্গে শেষ দেখায়। বলছেন, "বোটে যখন উঠছে সবাই— মা, আমি আর বাবা এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম। বাবা তো মাকে মা মা করতেন। রত্নগর্ভা, আপনের গর্ভে শিবশঙ্কর আইসে। (কথা আর কী। মা'র হঠাৎ কী যে হল— premonition, perhaps she knew—) আমার হাতটা বাবার হাতে দিয়ে বললেন, উনিও বাবাই বলতেন, বাবা, আপনাকে একটা কথা বলব? 'বলেন, মা বলেন', বাবা তো একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন— আদেশ করেন— 'না, আপনি তো জানেন— এর বাবা মারা গেছেন— বড় দুরন্ত ছেলে, এখন তো কেউ নেই। আপনি একটু দেখবেন একে।

ভুলটুল মাপ করে দেবেন', কারণ মাও তো বাবার মূর্তি দেখেছিলেন, উনি চাইতেনও যে আমি বাবার কাছে শিখি, আমিও চাইতাম। কিন্তু সাহস হত না। বম্বেতে কোনও দিন বসিনি, মা বলার সঙ্গে সঙ্গে, বাপরে! বাবাও highly emotional! একেবারে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন— মা আপনে বললেন কী, আপনে রত্নগর্ভা— আজ থিক্যে আলি আকবর আমার ছোট ছেলে, রবু আমার বড় ছেলে। আপনায় কথা দেলাম। মা আর বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেন জানি না, ভেউ ভেউ করে কাঁদছি— বড় বিশ্রী পরিস্থিতি। কান্নার মধ্যেই মাকে আমি শেষ দেখছি। হাত নাড়ছি। মা দাঁড়িয়ে আছেন চশমা পরে। পরনে ঢাকাই, সেই শেষ দেখা।

"কয়েক মাস পরেই প্যারিসে খবর পেলাম— মা মারা গেছেন।"

মায়ের সঙ্গে রবিশঙ্করের শেষ দেখার মতো বিলায়েৎ খাঁর 'কোমল গান্ধার'-এও আছে বাবা উস্তাদ এনায়েৎ খাঁর জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টার বর্ণনা। মনে আছে রবিশঙ্করের সেই সজল চোখের মতো বিলায়েৎ খাঁর উদাস, উন্মনা চোখ এই কথাগুলো বলার সময়। দু'জনের কেউই চোখের জল দেখতে দিতে চান না, সেদিক দিয়ে দু'জনই ভালই macho type, কিন্তু এই বলার কথাগুলোর মধ্যেই একটা দরবারি কানাড়ার কোমল গান্ধারের ছোঁয়া আছে। কিংবা রবিশঙ্করের ক্ষেত্রে তারসানাইয়ে পটদীপের তারার সুরের মোচড়, যেমনটি কিনা প্রয়োগ করেছিলেন 'পথের পাঁচালী' ছবিতে দুর্গার মৃত্যুসংবাদ দিতে গিয়ে সর্বজয়ার কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যের আবহে। বাবার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে ক্রমশ জড়িয়ে আসছিল বিলায়েৎ খাঁর গলা। যদিও বলার মধ্যে তেমন ভাবালু শব্দ কিছু ব্যবহার করছিলেন না। বললেন, "আজও চোখের সামনে ভাসে সেই দিনটা যেদিন বাবা চলে গেলেন। ইলাহাবাদ গিয়েছিলাম প্রয়াগ সংগীত সম্মেলনে। আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম, ড্রিঙ্ক-টিঙ্ক তো খুবই করতেন। বিধানবাবু... ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ড্রিঙ্ক একদম বারণ করে দিয়েছিলেন, he was a regular physician of my father। উনি খুব জোর দিয়েই বারণ করেছিলেন। আজকে বিধানবাবুর কথা খুব মনে আসে কারণ উনি আমার মাকে বলে গিয়েছিলেন— ও এখন ড্রিঙ্ক করে কি না করে, চার মাসের বেশি ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।... আমি জানি এ কথা, যেটা প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মতো হয়ে গিয়েছিল। আমার জন্মদিনের দু'চার দিন আগে এই সব কথা হচ্ছিল। আগস্ট মাসের কথা। উনি বলছিলেন আমার মাকে ওঁর ওই অদ্ভুত বাংলা টোনের হিন্দিতে মা-জি, তোমকো ভয় করনেকো জরুরত নেহি হ্যায়। হামকো মালুম হোতা হ্যায়... হাম সব লোক হ্যায়, তুমহারা ভাইলোক হ্যায় ইধার... তিন-চার মাস তুম ভয় নেহি করো, হাম তুমকো বোলতা হ্যায়।... ডক্টর রায় বলেই দিয়েছিলেন।

"তো ওই ইলাহাবাদের কনফারেন্সে ড্রিঙ্ক-টিঙ্ক একটু হয়েছিল, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ছিলেন, সব টেন্ট-এ বসে। আগে তো টেন্টেই গানবাজনা হত। ওঠা-বসা হত। তো সেদিন দুপুরবেলা বাবা বমি করলেন। গলা দিয়ে টুকরো টুকরো করে সব বেরুল রক্তের সঙ্গে। সেই তিন-চার ঘণ্টা পর যে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন উনি আর ওঁর প্রোগ্রামও করতে পারলেন না। ওনার সেই প্রোগ্রাম তখন আমি বাজালাম। ভোর চারটের সময় ভৈরবী। ভাল লাগল লোকেদের খুব সে বাজনা। তারপর ট্রেন ধরে বাবাকে ওই অবস্থায় আনলাম এখানে। এসে পৌঁছলাম আমরা বুধবার না গুরুবার রাত্তির আটটা-ন'টার সময়। ওই রকমই অবস্থা তখনও ওঁর। এখনও মনে পড়ে বাড়িতে কোন জায়গায় এনে রাখা হল, কী জামাকাপড় ছিল শরীরে। আর ওরকমভাবেই উনি রইলেন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর রাত একটা না দুটোর সময় একেবারে ঠিক হয়ে গেলেন। তখন আমি ঘুমোচ্ছি, আর মা জেগে। তখন ওঁর নাকি চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। মাকে বললেন, তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি জীবনে। তবু আমাকে মনে রেখো। আর মিঞা খাঁকে খুব সামলে রেখো, ওর ওপর আমার অনেক আশা।... কথাগুলো বলেই মাথাটা হেলে পড়ল বাবার, আর তখন কান্নাকাটির আওয়াজ উঠল, আমারও ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখলাম বাবা নেই।

"বাবার কথা ভাবলে কী রাগ মনে আসে? কী বলব শঙ্করবাবু তোমাকে, বাবার কথা ভাবলে সব রাগের কথাই ভেসে ওঠে মনে। And not only that'. বাবার স্মৃতিতে জড়িয়ে একেক সময় ফৈয়াজ খাঁ সাহেব মনে আসেন, মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব মনে আসেন। আর মাকে ভাবলে তো অ-নে-ক কথা, অনেক সুর মনে আসে।"

বাবার কথায়, মার কথায় গুনগুন করে যেসব সুর তুলছিলেন খাঁ সাহেব সে তো আর কলমে লিখে বোঝাতে পারব না, তাই সে চেষ্টাও করছি না। ওটা আমারই থাক। রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁর ভাষার রকমটা ধরাতে গেলেও ওঁদের বইগুলো সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করতে হয়। তারও দরকার নেই, বইগুলোই যখন আছে। আমি বরং ওঁদের আর একটু বর্ণনা করি, বিশেষ কয়েকটা ব্যাপারে ওঁদের ভাবনার ধরনটার কথা বলি।

৩

'রাগ-অনুরাগ'-এর কাজ হচ্ছে যখন লন্ডনে তখন কলকাতায় উদয়শঙ্কর দেহরক্ষা করলেন। রবিশঙ্কর এক অপূর্ব স্মৃতিচারণা লিখে পাঠান আনন্দবাজারে। সেখানে দাদার অজস্র গুণ এবং ক্যারিসমা বোঝাতে গিয়ে ওঁর সেক্স অ্যাপিলের কথা

বলেন। তাতে অনেক বাঙালিই রে রে করে উঠেছিলেন। 'এসব কী বলছেন রবিশঙ্কর, যাঁকে কিনা আমরা দেবতার আসনে বসাই।' পরে 'রাগ-অনুরাগ' ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সময়ও অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন ওঁর জীবনে প্রেমের প্রসঙ্গগুলো নিয়ে। তখন আমারই বড় অস্বস্তি হচ্ছিল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এসব কথা বার করার জন্য। ভাবলাম, শেষে আমার অত্যুৎসাহের জন্য আজ ভালমানুষটার এই হ্যাপা।

অথচ 'রাগ-অনুরাগ' বই আকারে বেরুনোর সময় রবিশঙ্কর সব দোষ আর নিন্দেই নিজের ওপরে নিলেন। লিখলেন, 'তবে হ্যাঁ, যখন সাত-পাঁচ ভাবি, যখন ভাবি এই লেখার মধ্যে আমি কতখানি নিজের দোষ স্বীকার করে উঠতে পেরেছি, তখন আর আমার আপসোস থাকে না। হাজার হোক আমি তো দেবতা নই। যাঁরা আমাকে দেবতা জ্ঞান করতেন তাঁরা যদি আজ আমাকে রক্ত-মাংসের মানুষ জেনেও ভালবাসেন তবেই না আমার জীবন সার্থক। উঁচু পিঁড়িতে বসে শ্রদ্ধা পাবার অভিলাষ আমার নেই। যেটুকু গান-বাজনা করেছি, মানুষকে যেটুকু আনন্দ আজ অবধি দিয়েছি, তার বিনিময়ে যেটুকু শ্রদ্ধা-ভালবাসা মানুষ আমায় দিতে পারেন তা পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করব। কারণ জানব, ওইটুকুই আমার সত্যিকারের পাওনা।'

যে কথাটা নিয়ে খুব হইচই হত সেটা রবিশঙ্করের এক অত্যন্ত সরল, আন্তরিক কথা। বলেছিলেন, আমি একই সঙ্গে অনেক মেয়েকেই সমান ভালবাসতে পারি। কাউকে বেশি ভালবাসার জন্য কাউকে কম ভালবাসতে হয় না। তা এর মধ্যে গণ্ডগোলটা কোথায় তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারি না। রবিশঙ্করকে দীর্ঘ দিন খুব কাছ থেকে দেখেছি বলে জানি এর মধ্যে কোনও ভান বা ভেজাল নেই। মানুষটা সত্যিই এরকম। যখন এসব কথা বলছেন তখন ওঁর সঙ্গে বিবাহিত না হয়েও স্ত্রীর মতনই থাকেন গায়িকা লক্ষ্মীশঙ্করের বোন কমলা চক্রবর্তী। আর সে সময় নিউ ইয়র্কে তাঁর আর এক সংসার মার্কিন মহিলা স্যু জোনসের সঙ্গে। পরে যাঁর গর্ভে ওঁর এক কন্যা হয়— নোরা জোনস, যে নোরাকে আজ সারা পৃথিবী এক ডাকে চেনে। উপরন্তু দীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও প্রথম স্ত্রী অন্নপূর্ণাশঙ্করের সঙ্গেও তখন শিল্পীর লিখিতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। বইয়ের জন্য অন্নপূর্ণা বা কমলার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিংবা একান্তে আমাকে স্যু জোনসের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবিশঙ্করকে এতটাই আপ্লুত ও অনুভূতিপ্রবণ লাগত যে এই তিনজন ও ওঁর অন্যান্য অনুরাগিণীদের কারণে, যোগাযোগে ও দূরত্বে ওঁর ভিতরে যে কী অন্তঃশীল আনন্দবিরহ কাজ করে সারাক্ষণ তা আঁচ করতে পারতাম। কে জানে, প্রেম-ভালবাসা নিয়ে হয়তো আরও বলার চেষ্টা ছিল লোকটার, বাঙালি পাঠকের কথা ভেবেই অনেক কিছু না বলা

রেখে দিলেন। উনি হয়তো বলবেন, না বলা কথার জন্যে তো আমার সেতারই আছে। অনুমানটা এজন্যই করলাম কারণ বছর কয়েক আগে ওঁর ইংরেজিতে যে আত্মজীবনী বেরিয়েছে তাতে প্রেম-ভালবাসার কথা আরওই ক্ষীণ, যদিও ভাষাটা ইংরেজি। আর ভয়ও হয়— তাহলে কি রবিশঙ্কর বয়স, সময়, পরিস্থিতির চাপে নিজেকে কিছুটা হলেও দেবতার আসনে বসাচ্ছেন। নাকি সর্বক্ষণ খোঁচানোর জন্য এক তরুণ, বেপরোয়া শঙ্করলাল এই বইয়ের কাজে নেই।

কম খোঁচাতে হয়নি আমাকে বিলায়েৎ খাঁ সাহেবকেও। প্রেমের কথা উঠলেই যিনি ওঁর সেতারটা দেখাতেন। ওঁর প্রথম ও শেষ প্রেম হিসেবে তুলে ধরতেন সেতারকে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী মনীষা হাজরার সঙ্গে ওঁর পরিচয়, ভালবাসা, বিয়ে ও বিচ্ছেদের কথা বললেন। বললেন ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী লিজার কথা। অর তার পরেই ঘুরেফিরে সেতার। ফের নতুন করে প্রেমের কথা উঠলে বলতেন, প্রেম তো হয়েইছে। কারও চেয়ে কিছু বেশিও, কিছু কম না। এই 'কারও চেয়ে' কথাটা যে কাকে মনে করে বলতেন তাও আমি দিব্যি টের পেতাম। 'রাগ-অনুরাগ'-এ রবিশঙ্করের প্রেমের কথাবার্তা নিয়ে আলোড়নের কথা তো ওঁর অজ্ঞাত ছিল না। সারাটা জীবন দুই শিল্পী সেভাবেই একে অন্যের প্রতিটি পদক্ষেপ যে কীভাবে নজরে রেখে গেছেন তা বাড়িয়ে বলার সামান্য সুযোগও নেই। অন্যজন কোনও আসরে কী বাজিয়ে মাত করল, কার সঙ্গে বেশি ওঠাবসা, কী রাস্তায় ভাবছে, কোন রাস্তায় চলছে, অপরজনের তা প্রায় নিটোল মুখস্থ। বিতর্ক ও বিবাদের পর সার্ত্র এবং কামুর সম্পর্কের মতন। তাতে একটা ধারণাও জন্মেছিল আমার যে বিলায়েৎ সম্পর্কে এই বই লেখার পক্ষে রবিশঙ্কর, এবং রবিশঙ্কর সম্পর্কে বই লেখার পক্ষে বিলায়েতের চেয়ে ভাল লোক হয় না। আবার যদি কখনও রবিশঙ্করের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলার সুযোগ হয় তো ইচ্ছে আছে শুধু বিলায়েৎ আর আলি আকবর খাঁ নিয়ে কথা বলব। যদিও জানি না তেমন সুযোগ আর হবে কি না। আর তখন জিজ্ঞেস করব বিলায়েৎ খাঁ ও নার্গিসের প্রেমের কথা কি তিনি জানতেন? সংগীতমহলের পুরনো জমানার কেউ কেউ জানতেন, রবিশঙ্কর জানবেন না এমনটা মনে হয় না। কিন্তু কখনও আমায় কিছু বলেননি।

বার বার প্রেমের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন বলে শেষে আমিও ওসব কথা তোলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন গভীর সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে যেদিকে গঙ্গা বইছে সেই অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে (মনে হয় আমার থেকে। চোখের জল আড়াল করার জন্যই) নার্গিসের প্রসঙ্গ পাড়লেন। যেহেতু নাম না করেই— একজন হিরোইন। একজন দারুণ সুন্দরী বম্বে হিরোইন, এইরকম করে

করে— পুরো ঘটনাটা বলে গেলেন। বললেন, আমি ভাল গাইতামও। তবু শুধু মা'র কথায় গান ছেড়ে দিলাম কারণ যা বললেন, আমি গানের বাড়ির মেয়ে। তবু তোমাকে গান ছেড়ে শুধু সেতার নিয়ে থাকতে বলছি কারণ ওটা তোমার বাপ-ঠাকুরদাদা আর আমার স্বামীর বাড়ির শিল্প। যে-রাতে মা একথা বললেন তারপর থেকে পড়ে রয়েছি শুধু সেতার নিয়ে।

এই মা'ই ফের বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে ওই মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। শেষে যেদিন হেস্তনেস্ত হল বিলায়েৎ জানলেন যে, যে-মেয়ের জন্য তিনি দিওয়ানা সে আসলে তাঁরই পিতার সন্তান বিখ্যাত গায়িকা জদ্দন বাইয়ের গর্ভে। আমি আকাশ থেকে জমিতে পড়েছি খাঁ সাহেবের কথা শুনে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কথা কি চেপে রাখব? উনি শান্ত গলায় বললেন, তুমি জানতে চাইতে না? তাই তো লেখার জন্যে বলছি। করো, রেকর্ড করো। তবে মেয়েটির নামটা এখন লিখবে না। আমি যখন থাকব না তখন দুনিয়াকে বোলো।

কে জানত তখন এর বছর দেড়েকের মধ্যে উনি চলে যাবেন? আর সেই নামটা আমি করব ওঁর স্মৃতিবাসরে। পরে বিলায়েৎ-নার্গিস পুরো প্রসঙ্গ নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম 'হায় চাঁদ' শিরোনামে। গল্পটা লিখতে গিয়ে কত কতবার যে চোখে জল এসেছে শিল্পীর সেই সন্ধ্যায় মুখটা মনে পড়ে।

সেদিন রাতে রায়চক থেকে ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল। চলে আসার আগে একটা অদ্ভুত কথা বললেন বিলায়েৎ খাঁ, বেশ আচমকাই। বললেন, তুমি রবিশঙ্করজিকে খুব ভালবাস, না? আমি বুঝলাম না কথার প্যাঁচটা, হঠাৎ করে এমন প্রশ্নই বা কেন। জিজ্ঞেস করলাম, কেন জিজ্ঞেস করলেন এটা? বিলায়েৎ খাঁ বললেন, এত কাজ করলে ওনার সঙ্গে। ভাল না বাসলে এত কথা কেউ বলে? বললাম, আমি তো আপনাকেও ভালবাসি। না হলে এত বিরক্ত করতে আসি? উনি চুপ করে হাসলেন একটু, তারপর বললেন, ওই জন্যে তো একটা একটা করে সব বলে দিচ্ছি।

৪

রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁর এক মস্ত মিল ওঁদের বিলাসিতায়। দুজনেরই মহিলা প্রীতির কথা দুনিয়া কম-বেশি জেনে গেছে; যেটা সেভাবে জানতে পারেনি তা হল দু'জনের সুগন্ধি বিলাস, আড্ডার ঝোঁক, পাঁচতারা লাইফস্টাইলের সঙ্গে একটা সরল জীবনধারাকে মেলানোর আপ্রাণ চেষ্টা। সুগন্ধির ব্যাপারে রবিশঙ্করকে তো অক্সফোর্ডের ডক্টরেটই অর্পণ করা যায়। পুরুষের ওদ্ তোয়ালেৎ ও আফটার শেভ,

মহিলার ওদ্ কোলোন ও পারফিউম সম্পর্কে ওঁর জ্ঞান বিশ্বকোষ গোত্রীয়। তবে দুনিয়ার সব সুগন্ধি পরখ করে শেষ অব্দি থিতু হয়েছিলেন দুটি সুগন্ধিতে— এক, ক্রিশ্চন দিয়োরের 'ও সোভাজ' ওদ তোয়ালেৎ ও 'আর্ডেন স্যান্ডালউড ফর মেন'। দ্বিতীয়টি ওঁর মনে ধরেছিল ওতে চন্দনের সুঘ্রাণ ধরা আছে বলে। সেজন্য একটা দুশ্চিন্তাও ভর করেছিল ওঁকে, কারণ আর্ডেনের এই সুগন্ধির নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল চন্দন কাঠ জোগাড়ের অসুবিধের কারণে। আর একটি কোলোনও প্রিয় ছিল রবিশঙ্করের এবং ওরকম একটা আমায় উপহারও করেছিলেন বারাণসীতে 'রোজে এ গালে'। আর্ডেনের ওই চন্দনগন্ধ ছাড়া দেখেছি ওঁর পছন্দের সব ফ্রেগ্র্যান্সই ফরাসি।

বিলায়েৎ খাঁ সেদিক দিয়ে লখনউয়ি। ওঁর দুর্বলতা মার্গীয় আতরের প্রতি। যদিও ওঁর ড্রেসিং টেবিলে বিদেশি সুগন্ধিরও ঢালাও আয়োজন দেখেছি। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন ওঁর তখনকার প্রিয় ফ্রেগ্র্যান্সের নাম 'ব্রাই'। এটা কোন দেশের, কী জাতের, কেন কী বৃত্তান্ত সেসব জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে ওঁর বাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে যে সুগন্ধটার ঘ্রাণ পেতাম মাঝে মধ্যে সেটা দামি জর্দার। সে সময় ওঁর সাধের বারাসতের বিড়ি খাওয়ারও পাট চুকে গেছে শরীরের কারণে। নাহলে আগেকার দিনে দেখা করতে গেলে ওই ছোট্ট ছোট্ট বিড়ির ঘ্রাণ আসত। এক অদ্ভুত তামাকু গন্ধ ছিল সে বিড়ির। মোটেই বিড়ির টিপিকাল বিটকেল গন্ধ নয়।

জীবনের শেষ দিকে গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছিলেন বিলায়েৎ খাঁ। যদিও সারাটা জীবন ওঁর প্রকৃত বিলাসিতা ছিল গাড়িতে। '৫১ সালে ফেস্টিভাল অফ ব্রিটেনে অংশ নিয়ে যা আয় করেছিলেন তাতে একটা ওপেন হুড এম জি কিনে নিয়ে চলে এসেছিলেন। তখন, ওঁর ভাষায়, 'আমার ওড়ার দিন'। স্টাইলের বুশ শার্ট, গলায় স্কার্ফ, চোখে গগলস্, ড্যাশবোর্ডে সিগারেটের টিন আর হাতে ওপেন হুড এম জি-র স্টিয়ারিং— বিলায়েৎ খাঁ এক নিপাট বোম্বাই কা বাবু। দারুণ নাচতে পারতেন বিলিতি নাচ, আর কলকাতার গ্রেট ইস্টার্নের ম্যাক্সিমজ-এর ডান্স ফ্লোরে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল প্রথমা স্ত্রী মনীষা হাজরার সঙ্গে।

আর একটু বয়স হতে প্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল মার্সেডিজ বেঞ্জ। একের পর এক মার্সেডিস কিনেছেন বিলায়েৎ খাঁ। শুধু ড্রাইভিংয়ের ওস্তাদি নয়, উস্তাদজি ছিলেন একেবারে প্রথম শ্রেণির কার মেকানিকও। আমাকে গর্ব করে বলেছিলেন, একটা গোটা গাড়িকে পার্ট বাই পার্ট খুলে ফেলে সেটাকে কমপ্লিটলি মেরামত করে ফের মিলিয়ে এক করে দিতে পারি, হাঁ। আমি কত বড় সেতারি, সেটা তোমরা বলবে। কিন্তু আমি কত বড় কার মেকানিক সেটা আমি নিজেই জানি। হাঃ হাঃ হাঃ।

হাসির কথায় মনে পড়ল, রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ দুজনেরই খুব প্রাণখোলা দমকা হাসি আছে। রবিশঙ্কর আবার দারুণ রসগল্প বলিয়ে। খাওয়াদাওয়ার পর ডিনার টেবিলে বসে জোক্স আদানপ্রদান করা ওঁর জীবনযাত্রার অঙ্গ। বিলায়েৎ খাঁর বিশেষত্ব নানা ধরনের ঘটনার প্রায় রঙিন ছবির মতো নিটোল বর্ণনা দেওয়ার। আর বলতে বলতে একটু প্রাচীন কোনও বন্দিশ বা ঠুংরির সুর গেয়ে শুনিয়ে দেওয়ায়। উর্দু মেশানো হিন্দি বা বাংলা কথায় সে এক ফাটাফাটি ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়। দার্জিলিং-এ নৈশভোজের টেবিলে রবিশঙ্করের প্রায় অভিনয় করে দেখানো পরশুরামের একটা গল্প আর রাতের রায়চকে বিলায়েৎ খাঁর গেয়ে শোনানো নানা মহান উস্তাদের গায়ন স্টাইল জন্ম জন্মান্তরেও ভুলতে পারব না।

যে একটা ক্ষেত্রে রবিশঙ্কর সমস্ত ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের মধ্যে প্রায় অনন্য তা হল ওঁর আশ্চর্য পাঠাভ্যাসে। বাপ্‌রে, কী সাঙ্ঘাতিক বইক্ষুধা এই বয়সেও। কোনও এয়ারপোর্ট দিয়ে যাত্রা করতে হলে লেটেস্ট 'টাইম' ও 'নিউজ উইক' তো কেনা চাই-ই, এবং উড়তে উড়তে সে-সব গলাধঃকরণও করা চাই। কেনা চাই লেটেস্ট ফিকশন, নন-ফিকশন যা চোখে পড়ল বুকস্টলে। আর পড়েই সেটা হস্তান্তর করা চাই কোনও পেয়ারের লোককে। এভাবে কিছু বই আমারও হাতে এসে পড়েছে। ভদ্রলোককে মনের মতো বই উপহার করলেও আহ্লাদের শেষ থাকে না। মনে আছে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংকে নিয়ে 'টাইম'-এ এক চমৎকার স্টোরি বেরিয়েছিল ১৯৭৭-এর হেমন্তে। 'রাগ-অনুরাগ'-এর কাজ হচ্ছিল তখন লন্ডনের চেলসি পাড়ায় শিল্পীর হোটেল অ্যাপার্টমেন্টে। হকিঙের ব্যাপারটা পড়ে দারুণ চাঞ্চল্যে রবিশঙ্কর সেদিন সকালটা ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞান নিয়ে কথা চালিয়ে গেলেন, শেষে কথার মোড় ঘুরল নাদ ব্রহ্ম এবং ওঁ-এর দিকে। যা রবিশঙ্করের forte।

দুই শিল্পীই ভোজনরসিক। বিলায়েৎ খাঁ আবার দারুণ রাঁধেনও। ওঁর বরাবরের পছন্দের খানা হল মোগলাই ডিশ। শেষ জীবনে উনি নিরামিষী এবং একাহারী হয়ে পড়েন। আর রবিশঙ্কর বলতে গেলে দুনিয়ার সব খানার ভক্ত। যদিও বাড়িতে ভাত-রুটি আর বঙ্গীয় পঞ্চব্যঞ্জনের মোহে আবদ্ধ। দারুণ খাদ্যরুচি, কিন্তু খান খুবই কম। কিন্তু যাই খান সেটা পরিপাটি করে, ভালবেসে। বিলায়েৎ খাঁর পানের নেশা ছিল, বার্ধক্যে শরীরের কারণে ছাড়ার আগে। রবিশঙ্কর হলেন perfect teetotaller। কখনও সখনও কোনও সেলিব্রেশনে হয়তো একটু শ্যাম্পেন বা কনিয়াকে চুমুক দিয়েছেন।

তবে একটা নেশায় দু'জনই মাত হয়েছিলেন। বিলায়েতের সেই নেশার নাম রবিশঙ্কর, রবিশঙ্করের নেশা বিলায়েৎ খাঁ। কেউই স্বীকার করেননি, কারওই অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

কফি হাউসের আড্ডা

রণজিৎ দাশ

আসামের শিলচর শহর থেকে আমি কলকাতায় চলে আসি ১৯৭১ সালে। আসি উচ্চশিক্ষাব ছুতোয়, আসলে সর্বনাশের নেশায়। সেই সর্বনাশের নাম কবিতা। তখন আমার বয়স বাইশ, সবে কলেজ পাশ করেছি। একটা আর্মিসবুজ রঙের হোল্‌ড-অল আর একটা ছোট টিনের ট্রাঙ্ক নিয়ে, একটা ঢাউস ডাকোটা বিমানে চেপে, ৭৫ টাকা ভাড়ায়, বাবাব প্রবল অমতে এবং মায়ের গোপন মদতে, আমি শিলচরের কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতার দমদম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছই শরতের এক নিস্তব্ধ সকালে। প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার দূবের এক প্রত্যন্ত শহর থেকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগরে। এর আগেও আমি একাধিকবার কলকাতায় এসেছি, কিন্তু এবার সম্পূর্ণ একা প্লেনে উড়ে এসে বিমানবন্দরে নামার পর আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। এই বিরাট কিন্তু আত্মমুখী শহরটা কি আমাকে ভালবাসবে, আমাকে তার বন্ধু করে নেবে?— এই উদ্বিগ্ন, উদ্‌গ্রীব অনুভূতি।

সে সময় বাস্তবিক অর্থে কলকাতায আমার বন্ধু বলতে যে-কজন মানুষ, তাদের মধ্যে অন্যতম দু-জন হল আমার এক শিলচরের বাল্যবন্ধু রাজশংকর দাস, সে তখন সিটি কলেজের ছাত্র; এবং কলকাতার তরুণ কবি সমরেন্দ্র দাস, সে তখন একটি নতুন লিটল ম্যাগাজিন 'আত্মপ্রকাশ'-এর সম্পাদক। রাজশংকব আমহার্স্ট স্ট্রিটে সিটি কলেজের রামমোহন হস্টেলের আবাসিক ছিল, আমি কলকাতায় এসে সবাসরি তার হস্টেলে উঠলাম। এবং বিকেলবেলা রোমাঞ্চিত মনে পায়ে হেঁটে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে চলে এলাম।

এভাবেই শুরু হল আমার কলকাতার জীবন। আক্ষরিক অর্থেই, কফি হাউস থেকে। এর পর কলকাতায় আমি বহু বার বাসস্থান পালটেছি, পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা শহরে চাকরিসূত্রে ঘুরেছি, কিন্তু এই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস আমার জীবনের

এক স্থায়ী ঠিকানা হয়ে আজও রয়ে গেছে। এই হাউসে কত বন্ধু, কত আড্ডা, কত ঘটনা, কত স্মৃতি। সব কিছু আলাদা ভাবে মনে-করা এবং বর্ণনা-করা আমার পক্ষে অসাধ্য, কারণ আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। আপাতত লিখতে বসেছি কফি হাউসের আড্ডার কিছু কথা, কিন্তু তারও কোনও বিস্তৃত সরস বর্ণনা আমি লিখতে পারব না, কেবল ধূসর স্মৃতি হাতড়ে সেই সব আড্ডার কিছু মূল চরিত্রকেই স্মরণ করব এই রচনায়।

সর্বাগ্রে বলব সেই আদিপর্বের আড্ডার প্রধান কুশীলবদের নাম। এঁরা হলেন: পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ ভড়, সমরেন্দ্র দাস, অরণি বসু, অজয় সেন, অমিতাভ গুপ্ত, আলোকজ্যোতি রায়, শম্ভু রক্ষিত, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রিতম মুখোপাধ্যায়, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, তুষার চৌধুরী, ধূর্জটি চন্দ, একরাম আলি, প্রদীপচন্দ্র বসু, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, জহর সেনগুপ্ত প্রমুখ। এঁরা সকলেই আমার সমবয়সি সতীর্থ কবি, এখন যাঁদের সত্তরের দশকের কবি বলা হয়। কেবল প্রিতম গদ্যকার।

অগ্রজদের মধ্যে নিয়মিত আড্ডাধারী ছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, কালীকৃষ্ণ গুহ, শামসের আনোয়ার এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ছিলেন হাংরি লেখকদের অন্যতম সুবিমল বসাক। ছিলেন আরও অনেকে।

এছাড়া নিয়মিত আমাদের আড্ডাসঙ্গী হতেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, তিনি তখন বাংলা গদ্যের 'যুবরাজ'। আমি সন্দীপনদার বিশেষ স্নেহ পেয়েছিলাম। বস্তুত আমি শিলচরে থাকাকালীনই সন্দীপনদার সঙ্গে আমার পত্র-পবিচয় ঘটে, বেশ কয়েকটি সুন্দর চিঠি তিনি লিখেছিলেন আমাকে, তার দু' একটি এখনও আমাব সংগ্রহে আছে। সন্দীপনদার বাক্‌পটুতা ছিল বিখ্যাত, আড্ডায় এলে তিনিই হতেন সেই আড্ডার মধ্যমণি।

শনিবারের আড্ডা হত জমজমাট। কবিতে-লেখকে ভরে যেত কফি হাউসের বিরাট হলঘরটা, তিলধারণের জায়গা থাকত না। একটা চেয়ারে দু'জন করে বসতে হত, বিশেষত ছোকরা কবিদের। সর্বদাই অগ্রজদের চেয়ার ছেড়ে দিতাম আমরা, তাঁদেরকে সম্মান করতাম খুব। ভালও বাসতাম। নিয়মিত আসতেন শরৎদা, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছিল আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি, স্পষ্ট কথা এবং এক সদয় কাঠিন্য। সুরসিক আড্ডাবাজ ছিলেন তিনি।

কচিৎ-কখনও আসতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কবিখ্যাতি তখন তুঙ্গে। সেই সঙ্গে তাঁর বোহেমিয়ান জীবনচর্যার অতিরঞ্জিত প্রচার। সব মিলিয়ে শক্তি তখন এক অতীব জনপ্রিয় কাল্‌ট ফিগার, এক সম্মোহনী কবিপুরুষ। এমনিতে কফি হাউসে কাউকে পাত্তা দেওয়ার রীতি ছিল না, কিন্তু শক্তি ছিলেন ব্যতিক্রম। শক্তি এলে

গোটা কফি হাউস জুড়ে একটা চাঞ্চল্যের শিহরন বয়ে যেত, সকলেই অকপটে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে দেখত, এমনই ছিল তাঁর তারকা-সুলভ আকর্ষণ। এবং 'পদ্য' ও 'মদ্য' এই শব্দ দুটিকে যিনি প্রায় সমার্থক করে ফেলেছিলেন নিজের বেপরোয়া জীবনযাপনে ('আমার দৈনিক শুধু এক পাত্র মদ্যপান চাই'— ২৮ নং চতুর্দশপদী), তিনি সর্বদাই প্রভূত মত্ত অবস্থায় কফি হাউসে আসতেন, বলাই বাহুল্য। কারণ এই সদামত্ত অবস্থাটিই ছিল শক্তির মূল ভাবমূর্তি এবং শক্তি সেটা বিলক্ষণ জানতেন ও কাল্‌টিভেট করতেন সচেতনভাবে। (ওই ২৮ নং সনেটটিতেই আছে এই অসামান্য পঙ্‌ক্তি-নিচয়: 'পদতল ভরে যায় নূপুরের আক্রমণভার।/আমারও অনেকদিন হতে ইচ্ছা ছিলো করতলে/তোমার মুখের ওই ভূমণ্ডল করিব স্থাপন'। যে-কবি ওই 'ভূমণ্ডল' শব্দটির এমন অলৌকিক ব্যবহার করতে পারেন, সে-কবিকে তো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতেই হবে!) কবি শক্তি আমার নমস্য, কিন্তু ব্যক্তি শক্তিকে আমি বিশেষ পছন্দ করতাম না তাঁর ওই অতিনাটুকে ব্যক্তিত্বের জন্য। অনেক পরে টের পেয়েছিলাম যে তিনি আমাকে পছন্দ করতেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমার একটি সংক্ষিপ্তকালের গোপন সখ্য গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সে গল্প অন্য। আপাতত এইটুকুই বলার যে, শক্তিদার সঙ্গে সে সময় কয়েকবারই কফি হাউসে আড্ডা দিয়েছি এবং খালাসিটোলায় মদ্যপান করেছি। তখন তাঁর স্বভাবের যে-দিকটা খুব প্রকটভাবে নজরে পড়ত তা হল, যা-কিছু কবিতা নয়, তার প্রতি তাঁর হিংস্র অসহিষ্ণুতা। যে-কোনও মেকি বা অক্ষম কবি ও কবিতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা। আমার কেমন মনে হত যে, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় প্রবলতম দেহশক্তির পূজারী স্পার্টানরা যেমন। তাদের সমাজে কোনও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মালেই তাকে অবলীলায় ছুড়ে ফেলে দিত পাহাড়চূড়া থেকে, তেমনই কোনও উচ্চমান-রক্ষার নিষ্ঠুরতা কাজ করত উচ্চতম কবিতার পূজারী শক্তির মানসিকতায়। পরে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে এসে দেখেছি যে, যাকে তিনি খাঁটি কবি বলে মনে করতেন, তার জন্য তাঁর মনে ছিল অগাধ সম্মান আর ভালবাসা।

মাঝেমধ্যে আসতেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পুরো একটি কৃত্তিবাসী দল সঙ্গে নিয়ে। তাঁর 'স্টার ভ্যালু' ছিল আরও মারাত্মক। একদিকে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'কৃত্তিবাস' আন্দোলনের নেতা, অন্য দিকে তিনি তখন আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের উঠতি মেগাস্টার এবং সর্বোপরি তিনি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার কাহিনিকার!

সুনীলদার এই বন্ধুচক্রের সঙ্গেই দু'একবার কফি হাউসে আসতে দেখেছি কবিতাদিকে। কবিতা সিংহ, কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কবি, সেই নারীবাদ-পূর্ব আমলে বাংলা কবিতায় নারীসত্তার বলিষ্ঠ আত্মঘোষণার এক আদি কণ্ঠ। যেমন সুন্দরী, তেমনই

ব্যক্তিত্বময়ী। আমার মতো তরুণ কবিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল নিজের দিদির মতোই স্নেহময়। কবিতাদি তখন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের 'যুববাণী' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। আমাদের সবাইকে ডেকে ডেকে রেডিয়োতে কবিতা পড়াতেন। আমি নিজে দু'বার তাঁর ডাকে রেডিয়োতে কবিতা পড়েছিলাম। তরুণদের কবিতা বিষয়ে তাঁর ছিল অকৃত্রিম আগ্রহ ও মনোযোগ। এই কফি হাউসেই একদিন তাঁর মুখে শুনেছিলাম তাঁর এক অভাবিত পরিকল্পনার কথা। তিনি আমাদের মতো নিতান্ত তরুণ সত্তরের দশকের কবিদের নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করতে চান। আমাদের বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ঘোর কেটে যাওয়ার আগেই তিনি নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলেন আমাদের দশকের সতেরো জন কবির কবিতার একটি মনোজ্ঞ সংকলন— 'সপ্তদশ অশ্বারোহী' নামে।

১

আমাদের সময়ে কফি হাউসে না-এসে বিখ্যাত (কনস্পিকিউয়াস বাই দেয়ার অ্যাবসেন্স) বিখ্যাত ছিলেন দু'জন কবি। দু'জনেই পঞ্চাশের দশকের, তাঁদের একজন বাংলা কবিতার এক প্রকৃত দিব্যোন্মাদ পুরুষ, এবং অন্য জন বাংলা কবিতার এক প্রকৃত স্থিতধী পুরুষ। দুজনেই আমাদের অত্যন্ত প্রিয় কবি— বিনয় মজুমদার এবং শঙ্খ ঘোষ। বিনয় সম্পর্কে তখন কিংবদন্তির ছড়াছড়ি। আমি শুনেছিলাম, বিনয় এক সময় কফি হাউসে নিয়মিত আসতেন, কোনও একটি টেবিলে বসে থাকতেন চুপটি করে, মাঝে-মধ্যে নিজের মনে বিড় বিড় করতেন শালীন-অশালীন ভাষায়, এবং হঠাৎ কখনও ক্ষিপ্ত ও আগ্রাসী হয়ে উঠতেন। আর শঙ্খ সম্পর্কে শুনেছিলাম যে, তিনি সাত্ত্বিক রাবীন্দ্রিক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী এক কবি, তাঁর পক্ষে কফি হাউসের এই মত্ত-প্রমত্ত বোহেমিয়ানার ভিতরে আসা কী করে সম্ভব? এরই মধ্যে দু'একবার তাঁকে কফি হাউসে আসতে দেখেছি, কোনও কবিদের সঙ্গে নয়, তাঁর নিজস্ব কয়েকজন অলেখক বন্ধুর সঙ্গে, তাঁদের একজন ছিলেন সে সময়কার এক সুপরিচিত নাট্য-ব্যক্তিত্ব শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতন, শঙ্খ ঘোষ কফি হাউসে এলেও একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত। তিনিও তখন এমনই কিংবদন্তি। (তাঁর সম্পর্কেই তো সন্দীপনদা বলতেন, 'গরিবের রবীন্দ্রনাথ'! এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র ধারালো কৌতুকে, তিনি 'বাংলা কবিতার পোপ'।)

যাই হোক, বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে প্রচলিত মিথগুলির অধিকাংশই যে কী নির্ভেজাল মিথ্যা হয়, তার একটি প্রকট দৃষ্টান্ত শঙ্খ ঘোষের এই 'কফি হাউসে

না-আসা'র মিথটি। পরে আমি যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি, তখন তাঁর মুখেই শুনে আমি অবাক হই যে, তিনিও তরুণ বয়সে— ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ অবধি— আমাদেরই মতন সারাদিন এই কফি হাউসে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটাতেন। তখন তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত এক প্রধান অভিভাবক তাঁকে একদিন গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি আবার ওই কফি হাউসে যাওয়া শুরু কর নাই তো?' কারণ তাঁর সেই অভিভাবকের বিচারে, 'কফি হাউসে যাওয়া' এবং 'গোল্লায় যাওয়া' ছিল একই কথা। সুতরাং, সুমহান শঙ্খদা-ও আমাদেরই মতন এক সময় এই 'কফি হাউসের গোল্লা'-য় গিয়েছিলেন, এই অভাবিত তথ্যটি জেনে আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল!

এবং এই অভাবিত তথ্যটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কফি হাউসের জন্মকাল বিষয়ে একটি প্রচলিত তথ্য-ভ্রান্তির জরুরি সংশোধনী। প্রচলিত তথ্যটি এই যে, এই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের জন্ম হয় ১৯৫৮ সালে, তৎকালীন ভারতীয় কফি বোর্ড-এর কিছু ছাঁটাই কর্মীদের উদ্যোগে গঠিত একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালনায়। এই তথ্যটিকে ভিত্তি করেই তো এই ১৯৭৭ সালে ধুমধাম করে সদ্যই উদ্‌যাপিত হল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের ৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান (১৯৫৮-১৯৭৭), এই কফি হাউসেই। এবং সেই অনুষ্ঠানে যথারীতি অংশ নিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ। এখন তাহলে, পূর্ববর্তী বিবরণ অনুযায়ী, আমাদের মনে একটি শঙ্কিত প্রশ্ন জাগবে যে, যে-কফি হাউসের জন্মই হল ১৯৫৮ সালে, সেই কফি হাউসের কোন জন্ম-পূর্ব আধিভৌতিক সংস্করণে শঙ্খ ঘোষ তাঁর দলবল নিয়ে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল অব্দি দিব্য আড্ডা দিলেন? শঙ্খদা নিজেই আমাকে সহাস্যে জানিয়েছেন যে, ওই ১৯৫৮ সালে কফি হাউসের জন্মের তথ্যটিই ভুল। ভারত সরকারের সংস্থা 'কফি বোর্ড ইন্ডিয়া'-র পরিচালনায় এই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের প্রতিষ্ঠা হয় সম্ভবত ১৯৪৪-৪৫ সালে। ১৯৫৮ সাল নাগাদ কফি বোর্ড ইন্ডিয়া উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন বোর্ড-এর বেশ কিছু কর্মী ছাঁটাই হন, সেই সকল কর্মচ্যুত কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন কর্মীর উদ্যোগে ১৯৫৮ সালে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হয়— Indian Coffee Worker's Co-operative Society Ltd. (Regd. No. 42/Cal of 1958)। এই সোসাইটি কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের মালিকানা ও পরিচালনা হাতে তুলে নেয়। আজ অবধি এই সোসাইটির প্রযত্নেই কফি হাউসটি চলছে। সুতরাং ১৯৫৮ সাল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের জন্ম সাল নয়, তার মালিকানা-বদলের সাল। (বলা বাহুল্য যে, চিরাচরিত বাঙালি-ঐতিহ্য অনুযায়ী, আমি উপরোক্ত তথ্যাবলি নির্দ্বিধায় লিখে ফেললাম, নিজে কোনওরূপ

নথিপত্র ঘেঁটে দেখার কষ্ট না-করে। ফলে সঠিক গবেষকের হাতে এই সকল তথ্যই সংশোধনযোগ্য।)

২

কিন্তু এ তো গেল অগ্রজদের কথা। আমাদের দিবারাত্রির আসল আড্ডা ছিল নিজেদের মধ্যে— সেই সতীর্থ বন্ধুদের মধ্যে, যাদের নাম আমি সর্বপ্রথমেই করেছি। এই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। বস্তুত কফি হাউসের আড্ডায় পার্থই আমার ব্যক্তিগত হিরো। সে-ই আমার এই রচনার প্রধান চরিত্র। আমার এই মহাভারতে পার্থই কৃষ্ণ। কারণ সেই ১৯৭১ সাল থেকে এই ১৯৭৭ সাল অব্দি দীর্ঘ ৩৮ বৎসর যাবৎ আমি (আমার অগ্রজ-অনুজ মিলে) অন্তত তিনটি প্রজন্মের শতাধিক কবি-লেখকের সঙ্গে কফি হাউসে আড্ডা দিয়েছি, এবং তাঁদের সকলের মধ্যে, নির্দ্বিধায়, পার্থকেই আমার উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছে। প্রখর মনন, গভীর সাহিত্যজ্ঞান এবং মৌলিক কল্পনাশক্তির এমন সম্মেলন আমি খুব কম কবির মধ্যেই দেখেছি। মাতৃপূজা থেকে মার্কসবাদ, কাহ্নপাদ থেকে কাফকা— সব বিষয়ে আড্ডায় যেন পার্থর কথাই ছিল শেষ কথা। অনেক সময়েই সে সব কথা অতি অদ্ভুত, চমকপ্রদ, হেরিটিক্যাল, অন্তর্ঘাতমূলক, প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে শতযোজন দূরেব বস্তু, কিন্তু এমন শাণিত চিন্তার স্ফুলিঙ্গ ঝরিয়ে হাজির হত সে সব অভিনব কথা, যে তার দ্বাবা চমৎকৃত না হয়ে কোনও উপায় ছিল না। এসব আড্ডাব অন্তত চার-পাঁচটি উদাহরণ দিতে পারলে আমাব বক্তব্য স্পষ্ট হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি সে সব দিনের ডায়েরি লিখিনি কখনও, এবং স্মৃতি থেকে তা উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কেবল সনির্বন্ধ অনুরোধ করব সে সব-আড্ডায়-উপস্থিত আমার স্মৃতিধর বন্ধুদের, তাঁরা যদি কেউ কেউ সেই স্মৃতিচারণ করেন।

এখানে বলার কথা এই যে, আড্ডা মানে তো নিছক আড্ডা নয়, স্মল টক, গসিপ আর মামুলি গাল-গপ্পো নয় (সে সব কথা আবার লেখা যায় নাকি?), আড্ডা মানে মননচর্চা, তত্ত্ববিচার, বিতর্কসভা, নব্য চিন্তার নির্মাণ— সব মিলিয়ে এক যৌথ সৃজনশীলতা। 'পরিচয়'-এর আড্ডা থেকে 'কবিতাভবন'-এর আড্ডা, 'কৃত্তিবাস'-এর আড্ডা থেকে 'অন্ধযুগ'-'পুনর্বসু'-র আড্ডা— এ জাতীয় সকল আড্ডার ক্ষেত্রেই ওই প্রখর চিন্তাচর্চা এবং যৌথ সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য একটি মৌলিক সত্য। আমাদের আড্ডার ক্ষেত্রেও এই সত্যটির ঘাটতি ছিল না কোনও। তার বাস্তবিক প্রমাণ বিভিন্ন সময়ে আমাদেরই বন্ধুদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকাগুলি, যেমন, আত্মপ্রকাশ (সম্পাদনা: সমরেন্দ্র দাস), উলুখড় (সম্পাদনা: অরণি বসু ও প্রিতম মুখোপাধ্যায়),

অন্ধযুগ (সম্পাদনা: পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল ও নিশীথ ভড়) এবং (সম্পাদনা: ধূর্জটি চন্দ), পুনর্বসু (সম্পাদনা: প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি আরও অনেক ক্ষণজীবী কাগজ। এই সকল কাগজের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের অনেকটা কাজই এই কফি হাউসের আড্ডায় সম্পন্ন হত। আমাদের প্রায় সকলেরই প্রথম দিককার কবিতার বইগুলির প্রকাশ-কর্মেও এই আড্ডার ভূমিকা ছিল প্রধান। এবং আমাদের পরবর্তী একাধিক তরুণ কবির প্রথম বই-এর নির্মাণ ও প্রকাশের খুঁটিনাটি এই আড্ডাতেই আলোচিত হত। এই ব্যাপারে— এই তরুণতর কবিদের প্রথম বই প্রকাশের ব্যাপারে পার্থর একক উদ্যোগ ও ভূমিকা ছিল অনন্য। প্রায় এক ধর্মীয় প্যাশন নিয়ে কত তরুণ কবির প্রথম বই প্রকাশে যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে পার্থ, তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের সময়ের সাহিত্যচর্চায় শুধু পার্থ-র এই নিঃশব্দ অবদানটিই এক বিস্তৃত গবেষণার ও যথাযথ স্বীকৃতির দাবি রাখে।

সেই সময় আমরা প্রায় সকলেই ছিলাম কাঠ-বেকার, এবং সেই চরম দারিদ্র ও বেকারিত্বের যুগে, আমাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না কোনও। দু'বেলা আড্ডা দিতাম কফি হাউসে, দিনরাত কবিতা আর সাহিত্যের আলোচনায় ডুবে থাকতাম। অনেকেই প্রাইভেট টিউশনি করতাম। তখন ভীষণ রাজনৈতিক অস্থিরতা চতুর্দিকে। পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসি গুণ্ডামি, নকশালদের হিংসা, সিপিএম-এর বাঁচার লড়াই। তখন সবে মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১), কয়েক লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত বাংলাদেশি উদ্বাস্তু তখনও পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শরণার্থী। কমলকুমার বলেছেন তাঁর সেই বিখ্যাত (নাকি কুখ্যাত?) কথা: 'শহরের বাঙালত্ব জাগ্রত হইয়াছে।' শহরের অর্থাৎ কলকাতার। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশত্যাগী বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদকে আমি কফি হাউসে বসে থাকতে দেখতাম। পাতলা চেহারার মানুষটি (তখন তাঁর দাড়ি-গোঁফ ছিল না) একটি সাদা টেরিলিনের শার্ট ও গাঢ় রঙের প্যান্ট পরে চুপটি করে বসে থাকতেন একটি কোনার দিকের টেবিলে, তাঁকে দেখলে একটু আত্মমুখী ও বিমর্ষ বলে মনে হত। (পরে বুঝেছি যে প্রত্যেক বড় কবির চেহারায় একটি স্থায়ী বিষণ্ণতার ছাপ থাকে, ইংরেজিতে যাকে বলে মোর্নফুল লুক। এবং এ-ও আন্দাজ করেছি যে সেই বিষণ্ণতার কারণ জগৎ-বেদনার বোধ ততটা নয়, যতটা নিজের কাব্যাদর্শের তুলনায় নিজের ব্যক্তিজীবনের বহু স্খলন-পতন-জনিত ব্যর্থতার গ্লানিবোধ। এই গ্লানিবোধের তীব্রতাই একজন বড় কবিকে একজন ছোট কবির থেকে আলাদা করে দেয়।)

সেই সময়, কলকাতার আরও অনেক অঞ্চলের মতো, কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলটা ছিল নকশাল-কংগ্রেস-সিপিএম-এর ত্রিকোণ সঙ্ঘর্ষ ও বোমাবাজির এক স্থায়ী

যুদ্ধক্ষেত্র। সর্বত্রই তখন হিংসাশ্রয়ী এলাকা দখলের লড়াই। এবং সেই লড়াইতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বুঁদির কেল্লা কফি হাউসের ছিল এক আলাদা প্রতীকী গুরুত্ব। প্রায়ই মারপিট, ভাঙচুর হত কফি হাউসের ভিতরে। যেহেতু রাস্তার উলটো দিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল নকশাল আন্দোলনের এক প্রধান কেন্দ্র, ফলে কফি হাউসে নকশালদেরই দাপট ছিল বেশি। প্রেসিডেন্সির নকশাল-নেতা অসীম চ্যাটার্জি তখন আমাদের স্বপ্নের নায়ক। নকশাল-কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ তখন আমাদের সসম্ভ্রম আলোচনার কবি। সেই তরুণ বয়সে আমাদের অস্থির, উদ্বিগ্ন চিন্তা-চেতনা প্রায় পুরোটাই ছিল বিপ্লব-কেন্দ্রিক। বামপন্থী কবিদের মতো উচ্চকিত স্লোগান-ধর্মী কবিতা আমরা কাব্যাদর্শগত কারণেই লিখতে পারব না, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের কবিতা যেন কোনও ভাবেই বুর্জোয়া শোষকশ্রেণির পক্ষে না যায়, এই ছিল আমাদের সর্বক্ষণের চিন্তা। কাব্যরচনার এই ধর্মসংকট নিয়ে নিয়মিত গম্ভীর মুখে আলোচনা হত আমাদের আড্ডায়। চুলচেরা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ হত। পার্থ ছাড়াও ভাল তাত্ত্বিক ছিল তুষার। এছাড়া ছিলেন বিদগ্ধ অগ্রজেরা। বিশেষত সুব্রত চক্রবর্তী, ভাস্কর চক্রবর্তী, কালীকৃষ্ণ গুহ এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত খুবই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন। শামসের আনোয়ারেরও বিদ্যা ও মেধা দুই-ই ছিল প্রখর, যদিও এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ছিল অনেকটা আর্টের শুদ্ধতাবাদী। বস্তুত ষাটের দশকের এই সকল কবিদের আন্তরিক সাহচর্যে আমরা, সেই আড্ডার সত্তরের দশকের অনুজেরা, কত কিছু যে শিখেছি, জেনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। আজ সে সব দিনের কথা ও ঋণের কথা খুবই মনে হয়। (এই কফি হাউসেই একদিন আমার হাতে একটা হালকা উপন্যাসের বই দেখে সুব্রতদা বলেছিলেন, 'এইসব গল্প-উপন্যাস পড়ে সময় নষ্ট কর কেন, রণজিৎ? শুধু প্রবন্ধের বই পড়বে, বুঝেছ? বড় কবি হতে হলে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। প্রবন্ধ পড়বে বেশি করে।' সুব্রতদার এই বিচিত্র উপদেশটি যে এক অর্থে অতিশয় মূল্যবান, তা যতই বয়স বেড়েছে, ততই বেশি করে টের পেয়েছি।) সুব্রতদা, ভাস্করদা ও শামসেরদার নিখাদ ভালবাসার স্মৃতি মনকে ব্যথিত করে। এবং মনে পড়ে প্রয়াত গদ্যকার অরূপরতন বসু-র কথা। তিনিও ছিলেন আমাদের এক নিত্যসঙ্গী অগ্রজ, অনেক কিছু শিখেছি তাঁর কাছে।

তো, কফি হাউসে সেই নিত্য রাজনৈতিক হামলা আর ভাঙচুরের শঙ্কাচ্ছন্ন দিনে, আমাদের আড্ডার টেবিলের রক্ষাকর্তা ছিল অজয় সেন। কবি অজয় সেন, আমরা শুনেছিলাম কবিতা লেখার জন্য সে হাওড়ায় তার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে। এই কলেজ স্ট্রিটেই কোথাও তার বোহেমিয়ান ঠেক, সে নিজেও এই পাড়ায় এখন একজন বিরাট মাস্তান (সদর্পে!)। তার বলিষ্ঠ চেহারা, আগ্রাসী ভঙ্গি,

তুখোড় সাহস, ক্ষিপ্র স্মার্টনেস। তার তুড়ির শব্দে কফি হাউস কাঁপত। প্রায়ই তার মারপিটের গল্প, তার নিজের মুখেই, শুনতে পেতাম আমরা। এ-পাড়ার বিবদমান মাস্তানদের মহল্লায়, অজয়, মূলত আমাদের ডাবল প্রটেকশনের উদ্দেশ্যে, ধর্মেও ছিল আর জিরাফেও ছিল। অর্থাৎ নকশালেও ছিল আর কংগ্রেসেও ছিল। অন্তত তেমনই আঁচ করতাম আমরা। সে সময় কফি হাউসে অজয়ের আগ্রাসী বডি ল্যাংগুয়েজ ছিল দেখার মতো। একটা সহজাত অভিনয়-ক্ষমতা ছিল তার, চমৎকার ক্যারিকেচার করত। বস্তুত, বুদ্ধদা (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত) সিনেমা তৈরি করলে সুদর্শন ভাস্করদা হবে সেই ছবির হিরো, এবং অজয় হবে ভিলেন, এমনই একটা আবছা ধারণা ছিল আমার। (তখন আমি বুদ্ধদার হাওড়ার বাড়ি থেকে আইজেনস্টাইন-এর 'ফিল্ম সেন্স' বইটি এনে পড়ছি)। যাই হোক, কোনও ঠাট্টা নয়, সেই উপদ্রুত দিনগুলিতে কয়েকবারই কফি হাউসে আচমকা হিংসার মুহূর্তে অজয় বুক চিতিয়ে আমাদের টেবিলকে আগলে রেখেছে, একথা সত্য।— এখনও কফি হাউসে আসে অজয়, বিয়ে-থা করে সংসারী, ব্যাংকের সম্ভ্রান্ত চাকুরে, শরীরটা একেবারেই ভেঙে গেছে তার, কিন্তু এখনও সেই ক্ষিপ্র স্মার্টনেসের ঝলকটুকু তার শরীরী ভাষায় আছে। শুরু থেকেই সম্পূর্ণ খোলা গদ্যে কবিতা লিখত অজয় এবং সেই আঙ্গিকগত অর্থে সে আমাদের সময়ের সর্বাধিক আধুনিক কবিদের একজন। তার কবিতা তার নিজেরই মতো, সপ্রতিভ, আবেগতীব্র এবং সুখপাঠ্য।

সে সময় কফি হাউসের হলঘর জুড়ে সন্ধেবেলার— বিশেষত শনিবার সন্ধেবেলার— জমায়েতে দু' একটি টেবিলে বসতেন নকশালপন্থী কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা; শক্তিদা-শরৎদার মতো সিনিয়র কৃত্তিবাসী কবিদের একটি টেবিল ছিল; গদ্যকারেরা বসতেন অন্তত দুটি টেবিল জুড়ে; সিপিআই এবং 'পরিচয়' গ্রুপের লেখক-কবিদের একটি টেবিল ছিল; হাংরি জেনারেশনের লেখকদের ছিল একটি টেবিল। 'এই দশক' এবং 'শ্রুতি' পত্রিকা গোষ্ঠীর কবি লেখকরা— পুষ্কর দাশগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, শেখর বসু, অতীন্দ্রিয় পাঠক প্রমুখ বসতেন একটি বিরাট দল নিয়ে। বাকি টেবিলগুলি ছিল তরুণ কবিদের দখলে। শনিবার সন্ধ্যায় বাংলা সাহিত্যের কবি-লেখকদের একটা বড় অংশকে পাওয়া যেত কফি হাউসে। সাহিত্য-জগতের সে এক অভিজাত দৃশ্য। এক কাপ কফির দাম ছিল আট আনা, এক প্লেট পকোড়ার দাম ছিল বারো আনা। তখন চারমিনার সিগারেট না খেলে লেখক হওয়া যেত না। আমরা প্রায় সকলেই চেন-স্মোকার ছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে থাকত বিরাট হলঘরটা, আর টেবিলে টেবিলে ছাইদানিগুলি উপচে পড়ত। বিড়ি খাওয়াটা ছিল চারমিনার খাওয়ার চেয়েও বেশি আভিজাত্যের লক্ষণ

এবং আমরা বেকার বলে অবশ্যই বিড়ি-নির্ভর ছিলাম।

তখন মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল আজকের তুলনায় নিতান্ত গরিব। লেখকর্দের পোশাক ছিল নিতান্তই সাদামাটা, সস্তা প্যান্ট-শার্ট অথবা পাজামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ, পায়ে চপ্পল— সব মিলিয়ে মলিন, রাগী, সন্ত্রান্ত চেহারা। আমরা তো অনেকেই ভ্রূক্ষেপহীন ছেঁড়া শার্ট পরে ঘুরে বেড়াতাম। পোশাকের মধ্যে জিনস তখন ছিল পশ্চিমি অপসংস্কৃতির প্রতীক। কোনও কবির পক্ষে জিনস পরে কফি হাউসে যাওয়া গর্হিত ব্যাপার ছিল। আমার ছিল জিনস-এর প্রতি দুর্বলতা, তদুপরি আমার কবিতায় বরাবরই ছিল যৌনতার প্রাধান্য। কবিতায় যৌনতা তখন বুর্জোয়া অবক্ষয়ের চরম প্রকাশ— একটা ভীষণ নিন্দনীয় কাজ। অথচ আমি তো যৌনতা ছাড়া কবিতাই লিখতে পারতাম না, এখনও পারি না। ফলে আমি বেশ দুর্ভাবনা এবং আত্মগ্লানির ভিতর দিন কাটাতাম। কবিতায় যৌনতার জন্য সেকালে নানাভাবে সমালোচিত হয়েছি আমি, তবে কখনও খুব প্রকট নিন্দা বা আক্রমণের মুখে পড়তে হয়নি, একথা ঠিক।

এখনকার তরুণ কবি-প্রজন্মের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের সেই তরুণ বয়সে প্রভূত বিদেশি সাহিত্য পড়ার রেওয়াজ ছিল। আমাদের কফি হাউসের আড্ডার একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিল আধুনিক বিদেশি সাহিত্য। তখন বিদেশি বই ছিল সস্তা, হাতে হাতে স্তাঁদাল-জিদ-লোত্রে আমোঁ-জেনে-রিলকে-নেরুদা-লোরকা-কামু-কাফকা-সার্ত্র-র বই ঘুরত। দাদাইজম-সুররিয়ালিজম-অ্যাবসার্ডিটি-আদি পশ্চিমি শিল্প-সাহিত্যের শেষতম ট্রেন্ডগুলি নিয়ে অন্তহীন তর্ক চলত আমাদের আড্ডায়। তিনজন গদ্যকার ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী— ডস্টয়েভস্কি, কাফকা এবং কামু। ডস্টয়েভস্কি-র 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', কাফকা-র 'মেটামরফসিস', কামু-র 'আউটসাইডার' (এবং প্রেফারেবলি, জয়েস-এর 'ইউলিসিস', প্রুস্ত-এর গদ্যের যে-কোনও দশ পাতা, সার্ত্র-র 'নশিয়া', হেনরি মিলার এর' ট্রপিক অব ক্যান্সার') পড়া না থাকলে আড্ডায় মুখ দেখানোই মুশকিল ছিল। এবং এই মহতী তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল একটিই বাংলা গদ্যগ্রন্থ: কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'। কমলকুমার তখন কফি হাউসের কিংবদন্তিদেরও কিংবদন্তি, কৃত্তিবাসী কবিগোষ্ঠীর ঘোষিত কুলগুরু, এক স্বপ্নের লেখক। আমি তাঁকে কোনও দিন কফি হাউসে আসতে দেখিনি, কিন্তু সে সময় আমাদের কাছে কফি হাউসেরই এক 'নৈশ-শাখা' খালাসিটোলায় কয়েকবারই তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হওয়ার পরমুহূর্তেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি শিলচর থেকে এসেছ? তোমাদের অঞ্চলে অনেক 'হাওর' আছে, তাই না?'

সত্যিই হাওর বরাক উপত্যকার একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, এটি একটি বিল-জাতীয় সুবিশাল জলাশয়, কিন্তু এটি বিল-এর মতো গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায় না, এটিতে সারা বছর জল থাকে। এমন একটি নিতান্ত আঞ্চলিক তথ্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। 'অন্তর্জলী যাত্রা' ছিল আমাদের ধর্মগ্রন্থ-প্রায়। পরবর্তী কালে জেনেছি যে, ফ্লবেয়ার-এর উপন্যাস 'সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন'-এর একটি স্মরণীয় পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণটাই তৎকালীন প্যারিসের কিছু তরুণ কবি-লেখক মুখস্থ বলতে পারতেন। আমি নিজে 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা (মনে করুন গ্রন্থটির সেই অসাধারণ আরম্ভ: 'আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব।') সুব্রতদাকে অনর্গল মুখস্থ বলতে শুনেছি। আজ ভাবলে অবাক লাগে, সে সময় গদ্য এবং পদ্যের কি নিবিড় দেহ-সম্পর্ক ছিল। গদ্যের কত প্রভাব ছিল কবিতার উপর। এখনকার প্রধান আন্তর্জাতিক গদ্যকারদের— কোয়েটজি, রুশদি, ম্যাককোয়ান, হোয়াইট, অ্যাটউড-দের গদ্য পড়ে কবিতা লেখার কথা ভাবা যায়! বড়জোর বোর্হেস ও মার্কেজ, তার পরই শেষ।

আমাদের অবশ্যপাঠ্য কবি ছিলেন একাধিক— বোদলেয়ার থেকে আখমাতোভা পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিস্তৃত অধ্যয়নের এই ঐতিহ্য আমরা পূর্বসূরী কবিদের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। ফলে নিজের নিজের পাঠ-বিস্তৃতি অনুযায়ী কবিতার সপ্তসিন্ধু-দশদিগন্ত আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল।

তখন ঝাঁকে ঝাঁকে লিটল ম্যাগাজিন বেরুত, এবং শনিবারের কফি হাউসে সেগুলি হাতে হাতে বিলি হয়ে যেত। প্রতিটি কাগজই পড়া হত মন দিয়ে, এবং বিভিন্ন লেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হত। কৃত্তিবাস, শতভিষা, গল্পকবিতা এবং অলিন্দ— এই কাগজগুলিতে লেখা ছাপা হওয়া গর্বের ব্যাপার ছিল। নানা মতবাদের সব শিবিরের কাগজই সকল টেবিলে অকাতরে বিলি হত বলে আমরা সব রকম লেখালেখির খবর রাখতাম। কফি হাউসের লেখক সভায় সকলের লেখালেখির এই অবাধ আদান-প্রদানের সুযোগ এবং সুপ্রথাটি সে সময়ের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এক অমূল্য ভূমিকা পালন করত। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশে মনের ভিতর যে বহুস্তরিক মিশ্র-চিন্তা শিল্পসৃষ্টির পক্ষে সর্বাধিক সহায়ক, এই ব্যাপক আদান-প্রদান সেই প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে দিত।

নিজের নতুন বই বিলি করাও ছিল অত্যন্ত সোজা। শুধু একটা শনিবার সন্ধ্যায় ঝোলা ভর্তি বই নিয়ে কফি হাউসে এসে ১০ মিনিটের মধ্যে ৪০ জন কবিবন্ধুকে

বই বিলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে খালাসিটোলায় চলে যাওয়া যেত।— তারপর যে সাসপেন্স, যে নৈঃশব্দ, যে নিষ্ঠুরতা, তা-ও সহ্য করতে হত এই কফি হাউসে বসেই, কবিজীবনের এক অনিবার্য কঠোর প্রশিক্ষণের মতো!

শক্তি এবং শঙ্খ এলে কফি হাউসে চাঞ্চল্য জাগত, একথা বলেছি। অনেক দিন পরে, সে রকম চাঞ্চল্য জাগতে দেখেছি জয় গোস্বামীর ক্ষেত্রে। কচিৎ কোনও শনিবার জয় রানাঘাট থেকে দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে কফি হাউসের নীচে আসত কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্য, সাধারণত সে উপরে উঠত না, তার বন্ধুরাই উঠে এসে সেই লেখকটিকে ডেকে নিয়ে যেত জয়ের কাছে, কিন্তু তাতেই সারা কফি হাউসে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হত। জয় গোস্বামী— প্রত্নজীব-আলেয়া হ্রদ-এর কবি জয় গোস্বামী তখন বাংলা কবিতার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, তার আগমনে চাঞ্চল্য তো জাগবেই! বড় ভাল লাগত আমার। জয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তখন। মাঝে মধ্যে জয় আমার ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে আড্ডা দিতে যেত। আর আমি জয়ের বন্ধুত্বে মজতাম। পার্থ-র মতন, জয়ের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াটাও এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। যে-কেউ জয়ের সঙ্গে কবিতা নিয়ে মাত্র ১৫ মিনিট আড্ডা দিলেই বুঝতে পারবেন যে জয় কী অনন্য প্রতিভা। এবং বাকি জীবনে আর জয়কে ভুলতে পারবেন না। (প্রসঙ্গত, জয়ের কবিতা পার্থই আমাকে প্রথম পড়ায়। সম্ভবত ১৯৭৭ সালে, তখন আমি বালুরঘাটে আমার প্রথম চাকুরিস্থল থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি। 'অভিমান' পত্রিকার একটি সংখ্যায় জয়েব একগুচ্ছ কবিতা, আমি পড়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যাই। এই ছিল পার্থ, যে-কোনও নতুন কবির মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেলে একটি একক মাইক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত সেই অচেনা কবির প্রচারে।)

চাঞ্চল্যের কথাই যখন হচ্ছে, তখন বলি যে, আমার নিজের মনে চাঞ্চল্য জাগত, এরও অনেক পরে, আর এক তরুণ কবি আমাদের আড্ডায় এসে যোগ দিলে, তাঁর নাম গৌতম বসু— 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল'-এর কবি। এই কবিকেও পার্থই আমাকে প্রথম চেনায়। লাজুক ও বিনয়ী, মৃদুভাষী ও মহাজ্ঞানী এই কবির সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বড় আনন্দ পেতাম। উক্ত বইটিতে গৌতমের একটি মর্মস্পর্শী চরণ— 'অন্ধ ধূপবিক্রেতার হাত থেকে/ধূপ কেনার সুযোগ নষ্ট হয়েছে'— মনে পড়লে আজও আমার চোখে জল আসে।

আমি এখনও কফি হাউসে আড্ডা দিই। সপ্তাহে একদিন। আমাদের এই বর্তমান আড্ডাচক্রের মধ্যমণি উৎপলদা— বাংলা কবিতার এক চলমান কিংবদন্তি, কবি

উৎপলকুমার বসু। সত্তরোর্ধ্ব বয়সে 'বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে'-র মতো বিস্ময়কর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, সদাহাস্যময়, সদাতরুণ উৎপলকুমার বসু। কী সৌভাগ্য আমাদের! তাঁকে ঘিরে আমরা— এক ও অদ্বিতীয় কালীদা— কালীকৃষ্ণ গুহ, শম্ভু রক্ষিত, আমি, গৌতম চৌধুরী, বিশ্ব মণ্ডল, অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ সরকার, শুভাশীষ ভাদুড়ি, কদাচিৎ পার্থ এবং প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (এই আর এক কবি যার সঙ্গ আমার অতি প্রিয়), এছাড়া আরও কয়েকজন তরুণ কবি ও গদ্যকার। আড্ডা দিয়ে আনন্দ পাই। মনে ও মননে চাঙ্গা হয়ে থাকি।

মূল বঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি সুদূর শহর থেকে আমি এসেছিলাম কলকাতায়, এক কাঁচা মনের নবীন যুবা, আমার কাছে এই কফি হাউসের আড্ডা ছিল এক শীর্ষমানের কবিতার কর্মশালা। এক নিরন্তর জ্ঞানচর্চার মুক্ত অ্যাকাডেমি। সুতরাং এই অ্যাকাডেমির একজন এমেরিটাস ছাত্র হিসেবে আমি যে আজীবন গর্ববোধ করব, এতে আব আশ্চর্যের কি? আজ আমি লেখক হিসেবে যেটুকু-যা-কিছু, তাব পিছনে এই কফি হাউসের আড্ডার অবদান অনেক।

সিনেমার আড্ডা

সুগত সিংহ

সিনেমাকে ঘিরে আড্ডা শুরু হয় সেই ছেলেবেলায়। অন্তত ষাটের দশকে তাই হত। একটা ছবি দেখে এলেই পাড়ায়, স্কুলে গল্পটা বলে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করত। যা দেখেছি তার বাইরেও সে-গল্পে প্রচুর কারিকুরি থাকত। বিশেষত ইংরেজি ছবি হলে নিজস্ব পারটিসিপেশন অনেক বেড়ে যেত। কারণ অনেকটাই বুঝতে পারতাম না। সেটা বন্ধুদের কাছে বলে ফেললেই তো বেকুফের একশেষ। ফলে তাপ্পি মারতেই হত। আমি সাউন্ড অব মিউজিক দেখে সে বয়সে ধবতেই পারিনি কেন ক্যাপ্টেন আর মারিয়া ছবির শেষে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। সুতরাং আমি শেষ করলাম এইভাবে— তারপর ওরা বনে চলে গেল। এখান থেকেই আড্ডাটা টেক অফ করল, কারণ একজন প্রশ্ন করল— বনে যাবে কেন? আর একজন বলল— দেখলি না শুরুতেই মারিয়া গান গাইতে গাইতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর খেয়ালখুশি মতো আড্ডাটা এদিক-ওদিক গড়িয়ে সাব্যস্ত হল— বনে গেলেই ওবা ভাল থাকবে, ফুর্তি করবে, গান গাইবে, গাছে গাছে ঝুলবে। এখন বুঝি, ওই আড্ডাগুলো থেকেই মন গল্পের বীজ বুনতে শিখেছিল।

বাংলা গল্পে সৎমার উপস্থাপনা চিরকালই খুব খারাপ। তারা খেতে দেয় না, খাটায়, বকে, মারে ইত্যাদি। সৎমা আর ঠাকুমার ঝুলির রাক্ষুসি-মা প্রায় সমার্থক ছিল। সৎমাকে নিয়ে অনেক শংকিত আড্ডা আমরা মেরেছি এবং মা মরে গেলে বাবা যদি আবার বিয়ে করে, কেন জানি না সেটা খুব অসম্ভব মনে হত না, তো আমারও মরে যাওয়া ভাল এবিষয়ে কারও দ্বিমত ছিল না। কিন্তু সাউন্ড অফ মিউজিক দেখার পর আমরা বুঝলাম সৎমাও অন্যরকম হতে পারে। সুতরাং সেটাও আড্ডার বিষয় হয়ে উঠল এবং সমাধান বেরোল সৎমা যদি গান গায় বা

নাচে তো সে ভাল হলেও হতে পারে। সন্তান সমেত দ্বিতীয় বিয়ে আমাদের দেশে সব সময়ে ভ্রূকুটি নিয়ে দেখা হয়, ওদের দেশে এটা জলভাত। তাই ওরা এমন গল্প ভাবতে পারে, আমরা নই। এটা অবশ্য বুঝেছিলাম বড়বেলার একটা আড্ডা থেকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই বিষয়ে আড্ডার সিদ্ধান্ত কত পালটে যায়।

সব সময়ে যে না বোঝার থেকে গল্প বানানো শুরু হত তা নয়। কল্পনা মাঝেমধ্যে অসম্ভবের প্রান্ত ছাড়িয়ে দৌড়ত। যেমন এক বন্ধু ভাইয়া কী একটা ছবি দেখে এসে ঘোষণা করল তাতে একটা জলের পাহাড় দেখিয়েছে। মনটা এমন কাদার মতো ছিল যে এ নিয়ে কারও মধ্যে একটুমাত্র প্রশ্নের উদয় হল না বরং ঘোর আড্ডা শুরু হয়ে গেল সেই পাহাড়ে কি নৌকো নিয়ে লগি ঠেলে ওঠা যাবে নাকি স্টিমার বা জাহাজ লাগবে। সেদিন ভাইয়া যেটা বলেছিল তার মধ্যে একটা সারিয়েল এলিমেন্ট ছিল এবং আজ অব্দি এই এত স্পেশাল এফেক্টের রমরমার দিনেও জলের পাহাড় তো কোথাও দেখলাম না। ওসব জল্পনা ছেলেবেলার আড্ডাতেই ফেলে এসেছি। একটু বড় হওয়ার পর সিনেমার আড্ডা হলেই দুটো দল গজিয়ে উঠত— একদল উত্তমের ভক্ত তো আর এক দল সৌমিত্রর। অর্থাৎ আড্ডার মধ্যে ফ্যান ফলোয়িং ঢুকে পড়ল। এটা যে কোন বয়স থেকে কেন হয় সেটা আলাদা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হতে পারে। সে সময়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য যেসব চোখা চোখা বাণ ছোড়া হত সেগুলো এখন বড়ই ভোঁতা লাগে। কাউকে গুরু বলা হচ্ছে তো কাউকে গরু, একে রাঙা মুলো তো ওকে ভাঙা কুলো। মজার কথা হিরোইনদের নিয়ে হাঁ হয়ে যাওয়ার অভ্যেস নিশ্চয় ছিল, কিন্তু এ ধরনের ক্ল্যানিশ ফ্যান ফলোয়িং ছিল না। কী বাংলা কী হিন্দি— সুপ্রিয়া, অপর্ণা, হেমা, রেখা, জিনাতকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল, দলাদলি ছিল না। অথচ আড্ডায় হিন্দি ছবির হিরোরা এসে পড়লেই উরে বাপরে একদল দেবানন্দ নিয়ে তো আর এক দল রাজেশ খান্না নিয়ে, এক দল রাজেশ খান্না নিয়ে তো আর এক দল অমিতাভকে নিয়ে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠতাম। এদের মধ্যে বয়সের পার্থক্যটা তখন মাথার মধ্যেই আসত না।

ইতিমধ্যে একজন দুজন মেয়ে বন্ধু হতে শুরু করল। যেহেতু কোএড স্কুলে পড়তাম না তাই এ জিনিস দুর্লভ দুর্মূল্য মনে হত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে কথা খুঁজে পেতাম না। হঠাৎ এই বেইজ্জতি থেকে উত্তরণের একটা ব্রহ্মাস্ত্র আমি আবিষ্কার করে ফেললাম। মেয়েদের আড্ডায় কোনও সিনেমার প্রসঙ্গ যদি এনে ফেলা যায় তো তর তর করে কথা এগিয়ে চলে। তাতে আর একটা সুবিধেও হল। যে কথাটা সরাসরি বলা যায় না সেটা ভায়া সিনেমা বলে দেওয়া সহজ। যেমন প্রেম নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে 'কাটি পতঙ্গ' ছবি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দাও।

কোনও পক্ষেই আর কোনও অসুবিধে নেই। সুযোগ বুঝে সিনেমা ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক বেরিয়ে যাও। জায়গা মতো গুনগুন করে ওঠো— ইয়ে যো মহব্বত হ্যায়। সমস্ত রাস্তা খোলা। তখন মেয়েদের আড্ডায় গেলে আগে থেকে মনে মনে তৈরি হয়ে যেতাম কোন কোন ছবিতে লাগসই প্রেম আছে, গানগুলোও বার বার ভেঁজে নিতাম। বিশেষত 'ববি' ছবির রসগর্ভ দৃশ্য এবং গানগুলো খুব সাহায্য করেছিল। এজন্য বাজকাপুরের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকতে পারতাম। কিন্তু একদিন ফট করে কান্তা পকেট থেকে একটা রাজেশ খান্নার ছবি বার করল। সস্তার প্রিন্ট, তথৈবচ কাগজে ছাপা। তখন ফুটপাতে পাওয়া যেত। ছবিটায় হাত বোলাতে বোলাতে লাল হয়ে উঠে বলল— চেহারাটা দেখেছিস। মনে হয় আচ্ছা করে চটকাই। ব্যস। আমার সমস্ত সৌধ ধুলিসাৎ। প্রচণ্ড জেলাসিতে যেন আকাশ থেকে সজোরে মাটিতে এসে পড়লাম। তারপর থেকে মেয়েলি আড্ডায় পারতপক্ষে সিনেমার কথা আর তুলি না।

এই সময়ে বাড়িতে একজন পড়াতে এলেন যিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির চলচ্চিত্র সংসদে যথেষ্ট অ্যাকটিভ ছিলেন। তার কাছে পড়াশোনা যত না হত সিনেমার আড্ডাটা হত বেশি। একটা জগৎ যেন খুলে গেল। আইনজেনস্টাইন, বার্গম্যান, কুরোসাওয়া, অদ্ভুত অচেনা সমস্ত নাম, কিন্তু ধারণা হল এবা সিনেমার ভগবান। গ্ল্যামার সর্বস্বতার বাইরেও যে একটা সিনেমা হতে পারে একথা তো কেউ কখনও বলেনি। সেই আড্ডাগুলোতে এমন একটা প্রথাবিরুদ্ধতা ছিল যা তরুণ মনকে উজ্জীবিত করে তুলল। সেই হজম-না-হওয়া জ্ঞানগুলো স্কুলে গিয়ে প্রায় হেঁচকির আকাবে না ঝাড়তে পারলে শান্তি হত না। এসব আজগুবি কথা শুনে বাকিরা তেমন আওয়াজ দেয়নি, বরং কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তখন আকাশে বাতাসে কী একটা ছিল— অন্য কথা, অন্য সুর শুনলে মানুষ আকৃষ্ট হত এবং সেটা স্কুল লেভেল থেকেই। ফলে ক্লাসের ফাঁকে টিফিনে অন্য একটা আড্ডা বসে যেত। আমিই তার মধ্যমণি, আমার উপরেই দায়িত্ব পড়েছে এই অজ্ঞ পাষণ্ডগুলোকে সিনেমা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার।

১৯৭৬ সালে ঋত্বিক ঘটক মারা গেলেন। তাঁর ছবিগুলো তথ্যকেন্দ্রে পরপর দেখানো হল। আমি দৌড়লাম টিকিট কাটতে। শুধু কি আমি একা, যাদের আমি প্রতিদিন বিনি বয়সায় জ্ঞান বিতরণ করি সেই ভেড়ার পালকেও তাড়িয়ে নিয়ে চললাম। ওই রেট্রোসপেকটিভ নিয়ে অভূতপূর্ব উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। ভোররাত থেকে লাইন পড়ে যেত। আমরা লক্ষ করেছিলাম পিজির একদল ছাত্র হস্টেল থেকে বেরিয়ে সব সময়ে আগে জায়গা দখল করে নেয়। প্রতিদিন লাইন দিতে

দিতে আলাপও হয়ে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী আর করব, এদের সঙ্গে সিনেমার লাইনে দাঁড়িয়ে সিনেমার আড্ডাই দিতাম। ওদেরকে ইমপ্রেস করার জন্য ঢপ মারতাম— সত্যজিৎ রায় আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আড্ডা মারেন। উনি তো আমাদের স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র তাই আমাদের একটু অন্য চোখে দেখেন। ইট পেতে জায়গা রাখা নিয়ে এদের সঙ্গে একদিন প্রচণ্ড ঝামেলা বেঁধে গেল। ওরা বলল— তোরা তো সত্যজিতের ক্যাম্পের লোক, সত্যজিৎই তো ঋত্বিককে পলিটিক্স করে শেষ করেছে, তোরা কেন ঋত্বিকের ছবি দেখতে এসেছিস। আমরা তেড়ে উঠলাম— ঋত্বিকও নাকি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে কিছু দিন পড়েছেন, তাই আমাদের লাইনে আগে জায়গা দিতে হবে। তাছাড়া এ নিয়ে ওদের কোনও কথা বলার রাইটই নেই, পিজি থেকে কোনও দিন কোনও ফিল্ম মেকার বেরোয়নি, বেরোবেও না। ডাক্তাররা মানুষ মারতে পারে ছবি বানাতে পারে না। এরপর ওদের সঙ্গে আমাদের আড্ডা ভেঙে গেল, আমরা আবার ফিরে গেলাম উত্তম-সৌমিত্রর সেই ক্ল্যানিশ সাইকোফ্যানসির জায়গায়।

প্রথম ঋত্বিকের সবকটি ছবি দেখে আমরা একেবারে তাড়িত হয়ে পড়লাম। তত দিনে সিনে সেন্ট্রাল প্রকাশিত চিত্রবীক্ষণের ঋত্বিক বিশেষ সংখ্যাটি হাতে চলে এসেছে। তাতে ঋত্বিকের অনেকগুলি লেখা এবং ইন্টারভিউ ছিল। সেগুলি পড়ে স্কুলে গিয়ে ইউং, আরকিটাইপ নিয়ে যথেচ্ছ কপচে সবাইকার পায়ের তলার মাটি একেবারে আলগা করে দিলাম। সে সব আড্ডার স্পেসিফিক কনটেন্ট আজ আর মনে নেই, বোধহয় তাতে তেমন কিছু ছিলও না, শুধু মনে আছে কৃশানুর একটি ক্ল্যাসিক কমেন্ট। লাইফ সায়েন্স ক্লাসে তখন শংকরবাবু রিপ্রোডাকশন পড়াচ্ছেন। তা নিয়ে চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। শংকরবাবুর মতো নির্বিবাদী গোবেচারা মানুষ আর হয় না। কিন্তু কৃশানু একদিন বলে বসল— শংকরবাবুর সঙ্গে সে যুক্তি তক্কো গপ্পোর সত্রাজিৎ বসুর মিল খুঁজে পেয়েছে। দুজনেই পর্নোগ্রাফি বেচে খায়।

কলেজে ওঠার পর সিনে ক্লাবে যাতায়াত শুরু হল। আইজেনস্টাইন, বার্গম্যান, কুবোসাওয়া— অ্যাদ্দিন যাদের নাম শুধু শুনেই এসেছিলাম তাদের ছবি এবার দেখতে পেলাম। দেখা নয় গোগ্রাসে গেলা। ভেতরে ভেতরে আবার আড্ডা মারার চাপ অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু সিনে ক্লাবের আড্ডায় সেই খিদে মিটল না। প্রথমত এরা শো ফেস্টিভ্যাল ইত্যাদি আয়োজন করা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয়ত দেখলাম এরা আমার মতোই পণ্ডিত, পণ্ডিতমন্যই বলা যায়। সিনেমা তৈরির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, সব বিদ্যেটাই পুথিগত। কোথায় সেই আড্ডা যা রাশিয়ার হাড় হিম করা ঠাণ্ডায় বসে আইজেনস্টাইন আর পুডোভকভিন মারতেন, কোথায়

সেই আড্ডা যা সিনেমাথেক ফ্রাঁসেতে বসে গোদার, ত্রুফোঁ, শ্যাব্রল, রোহ্‌মারদের মধ্যে জমে উঠত, কোথায় সেই চল্লিশের দশকের সত্যজিৎ, সুব্রত, বংশী চন্দ্রগুপ্তর আড্ডা যার কথা আমরা ইতিউতি পড়েছি। ইতিমধ্যে এক পরিচিত ভদ্রলোক টালিগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণ অন্য এক আড্ডায় এসে পড়লাম, আড্ডা না গাড্ডা কে জানে! ইনডাস্ট্রিতে বিভিন্ন রকম আড্ডা চালু আছে। টেকনিসিয়ানদের আড্ডা, অভিনেতাদের আড্ডা, প্রডিউসারদের আড্ডা ইত্যাদি। কোনও আড্ডা হয় শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে যখন আলো বা মেঘ বা অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কোনও আড্ডা হয় যখন হাতে কোনও কাজ থাকে না, দিনের পর দিন শুধু টালিগঞ্জে যাতায়াতই সার হয়। কোনও কোনও আড্ডায় অনেক পুরনো কথা, অনেক তথ্য জানা যায়, কোনও আড্ডা ক্রিয়েটিভ হয়ে ওঠে, আবার কোনও আড্ডা একান্তভাবে কেচ্ছামূলক। আড্ডা ছাড়া একটা শুটিং ইউনিটে কোহেসন তৈরি হয় না। কিছু আড্ডা শুরুই হয় রাত আটটার পর তরলে ভাসতে ভাসতে। প্রথম প্রথম সে আড্ডা এড়িয়ে চলতাম। এক বর্ষীয়ান ক্যামেরাম্যান উপদেশ দিলেন— মালের আড্ডায় না গেলে তুমি বুঝতেই পারবে না কোন বাঁশটা কোথা থেকে উদ্ভূত হয়ে তোমার পশ্চাৎদেশে ধাবিত হচ্ছে।

একবার এক বিচিত্র আড্ডায় ক্যাটালিস্ট হিসেবে আমায় কাজ করতে হয়েছিল। ক্রিশ্চিয়ান হিস্ট্রি ইনস্টিটিউট থেকে কমিশনড হয়ে একটি ব্রিটিশ টিম কলকাতায় এসেছিল উইলিয়াম কেরির জীবন নিয়ে ছবি করতে। কাস্টিং-এ ব্রিটিশ এবং এখানকার অভিনেতারা মিলিয়ে মিশিয়ে ছিলেন, টেকনিশিয়ানরাও তাই। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরদের মধ্যে দুজন এসেছিল ওখান থেকে, এখান থেকে ছিলাম আমি এবং আর একজন। প্রথম আলাপেই বুঝতে পারলাম এরা ভীষণ নাকউঁচু এবং আমাদের মানুষ বলে গণ্য করছে না। বিশেষত চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডেভিডের হাঁকডাক এবং তর্জনে পুরো ইউনিট কাঁপত। এখানকার অভিনেতাদের মধ্যে যাদের ইংরেজি উচ্চারণ ব্রিটিশ ঘেঁষা তাদেরকেই নেওয়া হয়েছিল আর নেওয়া হয়েছিল কিছু জুনিয়র আর্টিস্ট যাদের হাঁটাচলা ছাড়া কোনও কথা ছিল না। এদেরকে আগে এক্সট্রা বলা হত, কিন্তু শব্দটার মধ্যে একটা অপমান লুকিয়ে আছে বলে এখন সংগত কারণে জুনিয়র আর্টিস্ট বলা হয়। এরা আসেন খুব নিম্নবিত্ত স্তর থেকে। সিনেমায় মুখ দেখানোর থেকে অর্থের তাড়নাটা এদের মূল। বারুইপুরের পিঙ্কিও দুর্বল চেহারাটাকে প্রাণপণ পলেস্তারায় ঘসেমেজে সেটে আসত। এত যে উন্নাসিক আর দাপুটে ডেভিড এই পিঙ্কির প্রতি অদ্ভুতভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ল। ডেভিড মাঝে মাঝেই পিঙ্কির সঙ্গে আড্ডা মারতে শুরু করল। সেটা ছিল এক অসম এবং বিষম আড্ডা।

কারণ কেউ কারও ভাষা বোঝে না, কালচারাল, সোশ্যাল, ইকনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝে না। প্রেমালাপে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিকে সাধারণত কাবাব-মে-হাড্ডি ধরা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে দোভাষী কাম মডারেটারের দায়িত্ব নিতে হল। এরকম আড্ডায় কেউ কি কখনও পড়েছেন, না পড়ে থাকলে বুঝতে পারবেন না সেটা কী কঠিন কাজ ছিল। দুজনের বক্তব্য দুজনে যাতে বুঝতে পারে তাই প্রচুর জল মিশিয়ে মিহি করে, ফিল্টার করে দুজনের উপযোগী করে বিতরণ করতে হত। ডেভিডের মেজাজ আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে এল। পরে বুঝেছিলাম ওদের ওই প্রাথমিক মেজাজটা ছিল স্ট্র্যাটেজিকাল। এখানে টেকনিশিয়ানরা ফ্লোরে কাজের থেকে বেশি কথা বলে। অকারণ সময় নষ্ট করে। সেটাকে ডিসিপ্লিনে আনার জন্য ওই দাওয়াই।

এদের সঙ্গে বিভিন্ন মহলে ঘুরতে ঘুরতে বুঝতে পেরেছিলাম হাই সোসাইটির কল গার্ল এবং অন্যান্য মহিলারাও সাদা চামড়া দেখলে কী রকম মুখিয়ে ওঠে। ডেভিডের আকর্ষণ কিন্তু একমাত্র সেই আনস্মার্ট কগ্‌ণ পিঙ্কি। ডেভিড একদিন আমাকে আব পিঙ্কিকে গ্র্যান্ডে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাল। আমি পড়লাম ফাঁপরে। ম্যানারস না-জানা সস্তা পোশাকের পিঙ্কিকে গ্র্যান্ডে কি আদৌ ঢুকতে দেবে! ডিনার শুরু হবে আটটায়, কটায় শেষ হবে কে জানে। পিঙ্কি তারপর বারুইপুর ফিরবে কী করে। সিধে মারলাম ঢপ— পিঙ্কির বাবা অসুস্থ। পরের দিন সেটে এসেই ডেভিড পিঙ্কিকে আলাদা করে ডেকে হাতে এক হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল। ব্যাপার দেখে প্রোডাকশন ম্যানেজার শৈলদা ভয় পেয়ে আমার কানে কানে বলতে শুরু করল— সুগত এরা আমাদের অতিথি, কিন্তু কোনও বেচাল যেন না হয়, তাহলে জুনিয়র আর্টিস্ট সাপ্লায়াররা মেরে আমার চামড়া গুটিয়ে দেবে। ডেভিড কোনও দিন কোনও অসভ্যতা করেনি। শুধু সিডিউল শেষে পার্ক হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে অন্তিম পার্টি যখন তুরীয় হয়ে উঠেছিল তখন একঘর লোকের মাঝে মাথা উঁচু করে একটাই আর্জি জানিয়েছিল— Pinki.. would you kiss me! ভাগ্যিস পিঙ্কিকে সেটা আমায় বুঝিয়ে বলতে হয়নি, বলতে পারতামও না। নিজেই বুঝে নিয়ে সপাটে ডেভিডের গালে চুমু খেয়েছিল। তারপর দৌড়েছিল বারুইপুর লোকাল ধরতে। আর ফরসা গালে সস্তা লিপস্টিকের লাল দাগ না মুছে ডেভিড নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল।

তরুণ মজুমদার যখন চিরকুমার সভা সিরিয়াল করলেন তখন সুযোগ এল ওনার সঙ্গে চিত্রনাট্যের কাজ করার। প্রথম আলাপে তাঁকে ভীষণ রাশভারী আর মৃদুভাষী মনে হয়েছিল। এমন মানুষের সঙ্গে প্রয়োজনের বাইরে বেশি কথা বলা যায় না। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন লেখা নিয়ে বসতে হত আমি সতর্ক থাকতাম

যাতে সীমানা না লঙ্ঘন হয়। এমনকী সিগারেট খাওয়ার দরকার হলে ছোটবেলার ভঙ্গিতে একটু বাইরে যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। সেটা দশ-পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর এত ঘন ঘন হতে শুরু করল যে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে উঠল। একদিন যেই অনুমতি নিতে গেছি উনি নিজের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন— নিন খান। নিজেও একটা ধরালেন। ধোঁওয়ায় ধোঁওয়ায় গাম্ভীর্যের রাশ আলগা হয়ে গেল। তারপর কাজও হত আড্ডাও হত। ডিজিটাল টেকনোলজি আসার আগে যে বিশেষ ধরনের ম্যাগনেটিক স্টকে সিনেমার অডিও এডিটিং-এর কাজ হত সেটা যে শান্তারামের উদ্যোগে কলকাতায় চালু হয় তা আমি ওনার থেকে জেনেছিলাম। মজার গল্পও করতেন। যেমন— একদিন বম্বের এক স্টুডিও চত্বরে দাঁড়িয়ে হেমা মালিনীর সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ রই রই আর্তনাদ শোনা গেল। যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে, পিছু পিছু একটা ষাঁড় ধেয়ে আসছে। হেমা তো নাচিয়ে, দুরন্ত ফুটওয়ার্কে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার ছোটখাট গোলগাল চেহারা। স্প্রিং দেওয়া বলের মতো এদিক-ওদিক এলোমেলো ড্রপ খেতে শুরু করলাম। ষাঁড়টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

অন্তরীণ ছবিতে যখন অ্যাসিস্ট করতে গিয়েছিলাম মৃণাল সেনের সামনে দাঁড়িয়েই মনে হল অ্যাদ্দিনে সিনেমায় আড্ডার হেঁসেলে ঢোকা গেল। কবি সাহিত্যিকরা চুপচাপ একান্তচারী হতে পারেন, কিন্তু ফিল্ম মেকার মাত্রই বেশি কথা বলেন। প্রোডিউসাব ভজানো থেকে তিরিশ চল্লিশজনের ইউনিটকে চালনা করার সময়ে কথাই একমাত্র হাতিয়ার হয়ে ওঠে। যখন শুটিং থাকে না এই প্রগলভতা আড্ডায় চরিতার্থ হয়। মৃণালদাও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর থলি এত রকম গপ্পো আর ঘটনায় টস টস করে যে একটু টোকা মারলেই ভুড়ভুড়িয়ে ওঠে। লিন্ডসে অ্যানডারসন সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট ব্রিটিশ ফিল্ম মেকার হয়েও কেন ব্রিটেনের বিদ্বৎসমাজে ব্রাত্য সেই ব্যাখ্যা যেমন করেন আবার ইউরোপের এক নামী ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জুরি বোর্ডের মাননীয় সদস্য হয়ে ছবি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেটাও বলেন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করি— জুরিদের কাজ তো মন দিয়ে ছবি দেখা, তারাই যদি ঘুমোয় তো... মৃণালদার অকপট স্বীকারোক্তি— কী করব। জাপানের ডাকসাইটে পরিচালক নাগিসা ওশিমাও জুরি হয়ে গিয়েছিল। সামনে বসে লোকটা এমন একঘেয়ে সুরে নাক ডাকছিল যে আমারও ঝিমুনি এসে গেল। আসলে ফেস্টিভ্যালগুলোতে সাত-দশ দিন ধরে দিনে পাঁচ-ছটা করে এত অর্থহীন ছবি দেখতে হয় যে ঘুম ছাড়া পিঠ বাঁচবে কিসে। যত দিন যাচ্ছে ভলতেয়ারের সেই কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝছি— Tyranny of... Tyranny of... বলে আর মনে করতে পারলেন না। মৃণালদার ওই এক দোষ, নামই মনে রাখতে

পারেন না তো উদ্ধৃতি। ইয়ার্কি মারলাম— টিরানি অফ ড্যামনামি? হেসে বললেন— না। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে রীতিমত বই দেখে এসে বললেন— Tyranny of Many। তুমি যে শব্দটা বললে এটা তার থেকেও খারাপ। চারপাশটা মিডিওক্রিটিতে ভরে যাচ্ছে। গরিষ্ঠের এত দলবাজি আর মধ্যমেধার এত অত্যাচার যে খালি ঘুম পায়। এত অ্যালার্জি বলেই বোধ হয় শব্দটা মনে করতে পারছিলেন না। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি যখন মিডিওক্রিটিতে আক্রান্ত তখন আড্ডাও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। স্কুল থেকে শুরু করে বানপ্রস্থ পর্যন্ত সিনেমা নিয়ে আরও কত রকমের আড্ডা মারব জানি না। কিন্তু স্বচ্ছতা আর রসবোধের অভাবে তা কেমন ক্লীন্ন হয়ে আসছে। আসলে আড্ডা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। মানুষ যদি শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নিজেকে আড়াল করতে চায় তো দুরন্ত আড্ডার বদলে নীরন্ধ্র কেজো কথায় আমরা থমকে যাব।

কফি কিংবা সিধুপানের আড্ডা

দেবী রায়

'কফির রঙ
কোন খোঁয়াড়ি দেবতার পানীয় যেন।'

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের নীচে মলয়ের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলুম, এমন সময় সদ্য আমেরিকা ফেরৎ সুনীলদা সদলবলে এসে গেলেন— তখন তো উৎসাহে টগবগ করছেন এমন মনে হল, হঠাৎ— আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার গায়ের টেরিনের শার্টটায় পরখ করে বললেন, 'দারুণ!' ওই সময়, সবে কলকাতা শহরে এ রকম সে অর্থে একবারও ইস্ত্রি করার প্রয়োজন নেই এমন শার্টের প্রচলন হয়েছে খুব। আমি এমনিতে তখনও হাফ্-গরিব, চাকরি যে খুব একটা আহা-মরি গোছের বাগিয়েছি তাও নয়— মোটামুটি চলে যায়— তবে ওই আমার এক চিরকেলে ঘোড়ারোগ! রেয়ার জামা-প্যান্ট পরার একটা শখ আমার আজও আছে। ঠিক যে গরিবিয়ানা ঢেকে রাখার স্বচ্ছন্দ প্রয়াস তাও নয়— ওই বন্ধুরা বলেন আমার নাকি কিঞ্চিৎ সাজুগুজু করা অভ্যেস আর গেল না। কিছু পরেই, উত্তরপাড়া থেকে মলয় চলে আসে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়ির ছেলের গায়ের রং কি, মশায় বললে পেত্যয় যাবেন— চাঁপা ফুল অব্দি মুর্চ্ছো যাবে।

যাই হোক, ইসমাইলের দোকান থেকে কুড়িটার প্যাকেট— 'পানামা' কেনা হল। আর দুদ্দাড় করে দোতলায় উঠে গিয়ে, আমরা আর একটি টেবিল দখল করি। ওই সময়, এখনকার মতো বেওসাইদের এত ভিড় লক্ষ করা যেত না। তখন কফি-সেবী বলতে কলেজ-য়ুনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদেরই বোঝাত, আর কিছু অধ্যাপকদের। অবশ্য, অ্যালবার্ট হলের পুরনো আমলের কয়েকজন বৃদ্ধকে যে দেখিনি এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কোন জাদুবলে যে, ওঁরা কয়েকজন বয়সটাকে একই জায়গায় ধরে রেখেছেন তাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার সত্যিই! আর

প্রেমিক-প্রেমিকারা পছন্দ করত নিরিবিলি দুপুরের তিনতলা। তখন বেশ সুনশান ছিল। তখন হরহামেশা— বিশেষত রবিবারের সকালে অন্তত দশ-এগারোটায় আজকের সুবিখ্যাত অভিনয় জগতের দিক্‌পাল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আড্ডা দিতে দেখা যেত তাঁর বন্ধু, অধ্যাপক ও সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য্যর সঙ্গে। ওঁদের টেবিলে আরও বহু নামী মানুষদের দেখা যেত। সেখানেই আসতেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক ও অভিনেতা-পরিচালক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা ও অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী, হয়তো বা কয়েকবার ওই সব মঞ্চের ব্যক্তিত্ববানদের সঙ্গে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে থাকব। কবি ও অধ্যাপক মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে (এখন তো নাটকের জগতের মানুষ) শক্তিদার-পৃথ্বীশদার (গঙ্গোপাধ্যায়, আর্টিস্ট ও কবিদের নির্ভেজাল আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু)। টেবিলে দেখেছি কি? কবি অমিতাভ দাশগুপ্তকেও দেখেছি লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে— ওঁদের সঙ্গেই বোধহয় থাকতেন কবি ও মলাট-লিখিয়ে অর্থাৎ আর একজন শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীকে (উনি যে আরও কি নন অর্থাৎ একাধারে পরিচালক, গল্প লেখক ইত্যাদি।) কবি ও অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষকেও দেখেছি তবে অল্প স্বল্প। দেখেছি সদা হাস্যময় ও চিরতরুণ কবি ও অধ্যাপক অরুণ মিত্রকে। তখনও কি এলাহাবাদ ছেড়ে পাকাপাকি কলকাতায়? ঠিক মনে নেই। দেবেশ রায়? হ্যাঁ, খুব মনে আছে ওঁর 'দুপুর', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'কালীয় দমন' প্রমুখ গল্প-উপন্যাস তো আমার খুব অন্যতম প্রিয় লেখা। বিমল রায়চৌধুরী ও শংকর চট্টোপাধ্যায়কে (অধুনা প্রয়াত) কফির আড্ডায়— ক্বচিৎ, কবিতা সিংহকে। কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তো সুনীলদাদের টেবিলে। বলাই বাহুল্য— ওঁর 'র‍্যাঁবো, ভের্লেন এবং নিজস্ব' কবিতার বইটি তখনই বেশ সাড়া জাগিয়েছে! কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রণবকুমাব মুখোপাধ্যায়, বিজয়া দাশগুপ্ত (তখনও বোধহয় 'মুখোপাধ্যায়' হননি)। এঁদের কবি হিসাবে এক ডাকে সবাই চেনেন। আর শক্তিদাকে? শক্তিদা তো সকাল থেকে রাত্তির অব্দি এই আসছেন আবার যাচ্ছেন। আড্ডা হচ্ছে কফি হাউসে, মুখে 'কারণ' বারির সুরভি। শক্তিদা বললেই সবাই চেনেন আর চট্টোপাধ্যায় বলতে লাগে না। ওঁদের আড্ডায় কবি ও অধ্যাপক উৎপলকুমার বসুও আসতেন, মুখে পাইপ।

ঠিক আমাদের কবি বন্ধু সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও পাইপ কিংবা চুরুট। অতীন্দ্রিয় পাঠকের মুখে সিগারেট, না চুরুট—? বৃহস্পতি ও শনিবার কফি হাউসের আড্ডায় ওঁদের দেখা যাবেই। গল্পকার রমানাথ রায়, শেখর বসু, আশিস ঘোষ, অমল চন্দ প্রমুখ শাস্ত্রবিরোধী গল্প লিখিয়েদেরও। মাঝে মধ্যেই কবি পরেশ মণ্ডলকেও দেখেছি। কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্তকে কফি হাউসের আড্ডায় বোধহয় দেখা

যেত কম— দেখা যেত তৎকালীন আড্ডায় আমাদের বন্ধু ও কবি-অধ্যাপক উত্তম দাশকেও। তুলনামূলক ভাবে কম কবি মৃত্যুঞ্জয় সেনকেও। আরও সব উজ্জ্বল কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অরুণ বসু, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (এখন তো বিশাল চিত্র পরিচালক), সুব্রত চক্রবর্তী, শামসের আনোয়ার, ভাস্কর চক্রবর্তী এবং অবশ্যই শংকর দে এবং আরও কেউ কেউ। আমাদের শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, আলাদা স্বাদের গদ্য লেখেন সেই বাসুদেব দাশগুপ্ত! মলয়ের চিঠি নিয়ে এসেছিলেন পাটনা থেকে সুবিমল বসাক (ঢাকার কুট্টি-ভাষায় লিখে বেশ নামডাক)। কলেজ স্ট্রিট তখন ছিল আমার কাছে ভূ-স্বর্গ! সেই সব উদ্দীপনাময় দিনগুলি ছিল যথার্থ প্রাণবন্ত। কফি হাউসের আড্ডায় খুব কম দেখেছি কবি আলোক সরকারকে। আমাদের বন্ধু ও কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে, কবিপত্রের অন্যান্যদের মধ্যে প্রভাত চৌধুরী, রাণা চট্টোপাধ্যায়, শতভিষার মৃণাল দত্ত প্রমুখকেও বেশ মনে আছে। কফি ঘরের আড্ডায় বোধহয় আশিস সান্যালকে অ-নিয়মিত দেখা যেত। তখনকার আকাশ ছিল সত্যিই নীল! এখনকার মতো ধোঁয়াশা আর 'কুচুটে' ছিল না।

কফি পানও নিশ্চয়ই 'পান'! আর 'সিধুপান' হচ্ছে আসলে জাত বনেদি! 'সিধুপান' যাঁরা করে থাকেন তাঁরাই একমাত্র জানেন এর মোহ— এর খপ্পর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কি ভয়ংকর রকমের দুরূহ! ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু 'মদ'কে তালাক দিতে পেরেছেন এমন মানুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই আঙুলে গোনা যায়। যে মলয় ধূমপান করা ছেড়ে দিয়েছেন তাকেও নিয়মিত ধারায় রামে আসক্ত— লক্ষ করেছি।

খালাসিটোলায় গিয়েছি অথচ কমলদার (মজুমদার) সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি এ যেন ভাবাই যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি কখনও চর্মচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করিনি। শুনেছি, তিনিও নাকি খালাসিটোলায় নিয়মিত পদধূলি দিতেন! কমলদার বহু স্যাঙাতের মধ্যে— ওই সময় ইন্দ্রনাথ মজুমদার ও বেলাল চৌধুরী ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে পাশাপাশি দেখা যেত। এই সুবিখ্যাত অকুস্থলে নিমাই চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়ব্রতকেও প্রায় নিত্যই দেখেছি। আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— মানে আমাদের 'দুলুদা' তো মিথ। খালাসিটোলায় 'মাটির খুরি শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন' একজন নামী বিদেশি বুদ্ধিজীবী এসে মন্তব্য করেছিলেন। বারীন সাহা মশাইদের সঙ্গেই উনি এসেছিলেন কি? ঠিক স্মরণে নেই! বিখ্যাত 'টাইম' পত্রিকার সাংবাদিক লুই ক্রারের দৌলতে— সম্ভবত আমি জীবনে, সর্বপ্রথম, গ্র্যান্ড হোটেলে— 'স্কচ' পান করেছিলাম। ও'র সঙ্গে ছিলেন আমাদের পরিচিত স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক প্রশান্ত সরকার। ওই দিন মলয়, আমি, সমীরদা ছাড়া ছিলেন সমীর রায়,

শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু প্রমুখ। এই সেই সমীর— যিনি, ব্যাংকশাল কোর্টে ছুটে গিয়ে আমার জামিনের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমার দুর্দিনের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। হাংরি জেনারেশন সাহিত্য আন্দোলন করার দায়ে আমাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই 'টাইম' পত্রিকার দৌলতে আমরা, ওই সময়, রাতারাতি খবর হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ি। সুবিখ্যাত সাংবাদিক খুশওয়ন্ত সিং, আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন: 'Don't worry, there will be many to support you' টেলিগ্রামের বয়ান ছিল ওই রকম। যা আজও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। নানাবিধ সাহায্য করেছিলেন পুপুল জয়াকার, কবি ও রাষ্ট্রদূত অক্টাভিও পাজ। আমাদের বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর গোচরে এনেছিলেন সুবিখ্যাত কবি শ্রীকান্ত বর্মা। লেখক ও সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ ও কবি-সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত প্রমুখের নেপথ্য সহযোগিতা ভুলে যাওয়ার ব্যাপার নয়। কিন্তু এই দুজনকে আমি খুব একটা খালাসিটোলায় দেখেছি কি? বরং জীবৎকালেই মিথ বিনয় মজুমদারকে বহু বার দেখেছি! ওঁর 'ফিরে এসো চাকা।' ওঁর সম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক গদ্যে— মূল্যায়ন করেছিলেন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় জ্যোতির্ময় দত্ত। সে কথা ভুলিনি। তখন হাংরি জেনারেশনের কবি লেখকদের নিয়ে গুজব আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ত— কে বা কারা, তলে-তলে ছড়াতেন কে জানে। এই আমরা নাকি মদ্যপান করে একেবারে বেহেড হয়ে শুয়ে আছি নিমতলার শ্মশান ঘাটে। ওই মনুমেন্টের নীচে জামা প্যান্ট খুলে নাঙ্গা হয়ে অপকর্ম করতে করতে বোতল থেকে সরাসরি 'নিট' পান করছি। আমাদের মধ্যে কে নাকি একে ওকে টেলিফোনে গালাগাল দিয়েছি— এই রকম সব মুখরোচক গুজব। তখন কে যে কবি আর কে যে খোঁচড় ইনফর্মারের কাজ করে যাচ্ছিলেন আমাদের জব্দ করার জন্য তা খোদায় মালুম! ও সব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অন্তত আমার আর নেই! কত জায়গায় বিদেশি মদ্যপানের আমন্ত্রণেই যে আজকাল আর যাওয়া হয় না— শুধুমাত্র সময়াভাবে। 'পেঙ্গুইন' একবার এক সংকলনে (ইন্ডিয়ান রাইটিং টু ডে) আমার একটি কবিতা নেওয়া হবে প্রায় এ রকম বয়ানে একটি চিঠি পেয়েছিলাম খোদ বিলেত থেকে। সম্পাদক ছিলেন কবি আদিল কুসোওয়ালা। আমি আর আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে, পেট খোলশা করে বলে ফেলি এক সিধুপানের আড্ডায়— বোধ হয় 'টপ-ভুজঙ্গ' অবস্থায়—। তারপর? তারপর আর কি! যথারীতি ল্যাং। তারপর থেকে নিজের কাছে কান মুলেছি। খুব শিক্ষা হয়েছে ভাই রে। এই হচ্ছে সিধুপানের মহিমে আর এই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের আন্ডার গ্রাউন্ডের নেট ওয়ার্ক। সবই কপাল। কপালের নাম গোপাল! তারপর গরিব বাড়ির ছেলের সাহিত্য করা। সিধুপান, ভাই

তুমি এ সবের সাক্ষী। বলতে ভুলে গিয়েছি আমার আর এক প্রিয় লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ। ও রকম ফিটফাট ধুতি-পাঞ্জাবি-প্যাম্প-স্যু-তে মানাতও দারুণ! সবাইকে সব জিনিস তো মানায় না। ফ্রিজ থেকে 'দিশি' বের করতে পারেন একমাত্র আমাদের শ্যামলদাই। আজ খেয়ে যা দেবী— বাজারে গিয়ে বেছে বেছে— 'মাছ' কিনেছি। শুধু একটা অভিমান রয়ে গেল শ্যামলদা সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকায় (ডি-ফ্যাকটো এডিটর?) আমার বড় গল্পটা বিজ্ঞাপিত হয়েও আর ছাপার অক্ষরে বের হল না। 'অমৃত' পত্রিকাই যে বন্ধ হয়ে গেল। আসলে টানা গদ্য লেখার প্রতি আমার দুর্বলতা ইদানীং কেন, চিরটাকাল রয়েছে। গদ্য লেখার প্রসঙ্গ এলেই আমার ঔপন্যাসিক ও মানুষ প্রফুল্ল রায়ের কথা মনে পড়ে। এই মানুষটিই আমাকে 'যুগান্তর'-এ সরাসরি গদ্য লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং বুঝিয়ে ছিলেন দৈনিক পত্রিকায় লেখার অবশ্য জ্ঞাতব্য অথচ শিক্ষণীয় ব্যাপার। যেমন, পত্রিকা হচ্ছে মাস-মিডিয়া— লেখার বেশি প্যাঁচ পয়জার না দেখানোই সঙ্গত। তারপরও উনি আমায় গল্প লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমিই ও রাস্তা মাড়াইনি। আমার কাছে ছোট গল্প আর অংক প্রায় একগোত্রের। বরং ছোটখাটো একটা উপন্যাস লেখা খুব সহজসাধ্য না হলেও একেবারে অনায়াসসাধ্য নয় আমার কাছে। খালাসিটোলায় তুষার রায়কে কি মনে নেই?— ফাল্গুনী?

'অনেক কিছুই হয়তো বোঝা সহজ কিন্তু বোঝানো শক্ত।'

—নীরদ মজুমদার

বিট-আন্দোলনের পুরোধা অ্যালেন গিনসবার্গ ও পিটার অরলোভস্কি কলকাতায় এসে কীভাবে যেন কলকাতার কবি লেখক শিল্পীদের মায়ায় সাতপাকে বাঁধা পড়ে গেলেন। গঞ্জিকা সেবন কি তারপর থেকেই বিদেশে পপুলার? একে সাহেব তাতে আবার পাঞ্জাবি-পায়জামা নোংরা— অমলিন চেহারায়— এসব তো বাঙালি চোখ দেখতে অভ্যস্ত নয়। সাহেব মানেই কোট-প্যান্ট-স্যুট-টাই মুখে পাইপ চিবিয়ে চিবিয়ে ডাটা-চচ্চড়ি খাওয়ার মতো ইংরেজি বলা। যার অর্ধেক বোঝাই যাবে না তবেই না ইংরেজি! মুখে ফটাফট ইংরেজি বলা হচ্ছে আঁতলামি। অপরকে ইমপ্রেস করা। আরে বাপু, পহেলে নিজে ইমপ্রেস্‌ড হও— তবেই না। শ্মশানে-শ্মশানে, হাওড়া ব্রিজের তলায় গঞ্জিকা-সেবী এই দুই কবিকে নিয়ে কলকাতায় এক তুমুল উত্তেজনা। তদুপরি— সঙ্গে রয়েছেন সুনীল-শক্তি-উৎপল-সন্দীপন-শংকর (চট্টোপাধ্যায়)। কখনও বা শক্তি-সন্দীপন-সমীর ও আমি আরও কেউ কেউ... কলেজ স্কোয়ারের কর্নারে আলো-আঁধারিতে মত্ত অবস্থায় আধশোয়া— আপনার কি মনে আছে, সমীর?

সেদিন, আপনিই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। আপনার হাত ধরেই তো প্রথম 'নিউ ক্যাথে' যাই। সোনাগাছির 'কমলা বাঈ'য়ের কথা আজও আমার মনে আছে। একের পর এক বিয়ার পান। সেদিন সর্বপ্রথম জেনেছিলাম বেশ্যার ভালবাসা কাকে বলে। আর একবার সোনাগাছির সিঁড়িতে আমরা উঠছি আর 'দাদা'রা নেমে আসছেন।— মনে পড়ে?

একবার কফি হাউসের সিঁড়ির চাতালে সুনীলদা ও শংকরদাকে বেহেড অবস্থায় পেয়ে যাই। কীভাবে ট্যাক্সি ধরে ল্যান্সডাউনে আপনার বাড়ি পৌঁছেছিলাম... শংকরদা, স্বর্গ থেকে কি একবারও আমার কথা মনে পড়ে? আপনার মতো সহৃদয় মানুষ কলকাতা শহরে দিন দিন কমে আসছে আর এই কলকাতা হয়ে উঠছে শুধুমাত্র কংক্রিটের জঙ্গল।

কমলদার সঙ্গে প্রথম কোথায় আলাপ হয়েছিল কফি হাউসে? খালাসিটোলায়? না, বারদুয়ারীতে? মনে রাখার খুব কি একটা দরকার আছে? যা মনে আছে, তা হল ও রকম ভার্সেটাইল জিনিয়াস আমি ইহজীবনে খুব কম দেখেছি। পড়াশোনার কি গভীরতা। কী ভাবৈশ্বর্য, কল্পনার বিস্তার, ভাষার গাঁথুনি... আপনি স্বতন্ত্র, স্বমহিমায়, একক। শিল্পের জন্য ও রকম স্বার্থত্যাগ আমি গুটিকয় মানুষকে দেখেছি। তারপর তো সবই কেরিয়ার আর ধান্দাবাজি, এ রকম আর একজন মানুষ সমরেশ বসু। শেষ, ওঁর সঙ্গে পানাহার— মডেল পাবলিশিং হাউসের জয়দেব ঘোষের দৌলতে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আর একবার 'অ্যাম্বার'-এ। বলা বাহুল্য, অটোমোবাইল ক্লাবে সর্বপ্রথম গিয়েছিলাম ভয়-এর সঙ্গেই এক বৃষ্টির সন্ধেবেলায়। দোতলা-তিনতলা জুড়ে পানাহার আর কী তুমুল আড্ডার ঝাঁঝ সেখানে। বহু লম্বা কিংবা বেঁটে কবি, পত্রিকা অফিসের সম্পাদকের সঙ্গে লেখকদের নিবিড় আত্মীয়তাও ওখানে, ওই জলচক্রের আসরে।

খালাসিটোলায়, কে যেন একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আচ্ছা, কমলদা ও রকম গ্লাস হাতে ঘুরে ঘুরে মদ্যপান করার 'হেতুটা' কী? আমরা সবাই কান খাড়া। সবার হাতে টলটলে ঝাঁঝ নেশা। কমলদা শিক্ষকসুলভ মেজাজে বলে ওঠেন, 'আরে, তাও জানো না। এই ধরো, তুমি ঘুরে ঘুরে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছ আর চারপাশে পর্যবেক্ষণ করছ— এখন দ্যাখো, খুব যদি নেশা হয়ে যায় তো তুমি সামনের বেঞ্চে বড় জোর বসে পড়বে। আর যদি প্রথমেই বসে পড়ো তো তারপর সটান শুয়ে পড়বে... বাকিটা বোধ হয় বলেছিলেন শক্তিদা। অবশ্য মা-বসুন্ধরা তোমাকে নির্ঘাত আশ্রয় দেবেন। এই আর কি। বলে, কয়েক কলি রামপ্রসাদী গেয়ে উঠলেন। পরমুহূর্তে, এই কাউকে হয়তো 'দরবারি কানাড়া' কার কণ্ঠে শুনেছেন তাও স-বিস্তারে কথকের

ঢঙে বোঝাচ্ছেন, 'ভীমপলশ্রী' সুরে বড় যে কান্না, কমলদা। আমাদের তিনশো ষাট পর্যন্ত তাল আছে। রাজা বিক্রমাদিত্য, মধ্যরাত্রে 'দীপক' রাগিণী বাজাচ্ছেন আর একের পর এক প্রদীপ জ্বলে উঠছে— ওই রাগ রাগিণীতেই ডেকে আনছেন শীত, বর্ষা, বসন্ত। হিম্মতে মর্দা, মদতে খুদা! চেষ্টা করে যাও। অবিরাম চেষ্টাতে সব হয়। এমনকী, ঈশ্বরকে পর্যন্ত লাভ করা যায়। বিশ্বাস চাই। ধ্যান চাই। নিষ্ঠা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবে মাকে ডাকতেন। সর্বস্ব পণ করা চাই— তবেই না।

খালাসিটোলায়— আমরা হাংরিরা একবার জীবনানন্দ দাশের জন্মোৎসব পালন করেছিলাম। কমলদা খুব তারিফ করেছিলেন। যদিচ, কমলদার পাশে আমি একেবারেই বেমানান।

যেমন সমীর, আমার বন্ধু সমীর রায় খালাসিটোলার চেয়ে নিউ ক্যাথে পছন্দ কবতেন সর্বাধিক। পকেটে সব সময় এক-দু হাজার টাকা। সেকালে এক দু' হাজার টাকা কম কথা নয়। দু-দু'খানা 'কার'! তবু, ট্যাক্সি করে যাওয়া— যাওয়া মানে নৈশ-যাত্রা আমাদের! 'মিনি বুকের' প্ল্যান কোথায় হয়েছিল, সমীর? বাড়িতেই কি?— না, নিউ ক্যাথেয়?

একদিন সকালে— গাঁজা পার্কের সুবিখ্যাত পানশালায় পা রেখেছি কি রাখিনি। চোখাচোখি— এক শালপ্রাংশু চেহারার এক বিশাল মানুষের সঙ্গে। সেদিন সঙ্গী ছিল শান্তনু দাস তার আগে 'রাম' নাম কোথায় হয়েছিল? মানসদার বাড়িতেই (কবি ও ডক্টর মানস রায়চৌধুরী) কি? তোর মনে আছে সে সব শান্তনু? এই সেদিনের কথা আমার বন্ধু 'ওঁকে' সর্বাগ্রে চিনতে পারেননি। একটি বড় বোতল প্রায শেষ। আব একটি ম্যাগনাম সাইজের বোতল 'কিটসের' পেটের ভিতর অতীব যত্নের সঙ্গে যেন সদ্যোজাত শিশুকে ধরে ধরে শোয়াচ্ছেন। শান্তনু একবার চুপিসাড়ে বলে ওঠে, 'মাইরি, পিপে নাকি রে?'

উনি বলেন 'কী খবর, দেবী?'

— ভালই আছি, নীরদদা। আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে!'

শান্তনু ভীষণ রকমেব আবেগ সর্বস্ব ছিল ত'— ফলে যা হয় আর কি। 'গঙ্গোত্রী'কে নিয়ে নানাবিধ প্ল্যান ছিল ওর মাথায়! কিন্তু, মাত্রাছাড়া 'পান' হলে যা হয় আর কি।

'অ্যামুজে ভু বিয়াঁ।' আনন্দ করো।

'ইলফো তঁতে দ্য ভিবর'— এ লাইনটা বোধ হয় আমার জন্যই। বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।

'দি দোঁ! তু ন পার্ল পা! (ওহে। তুমি কথা বলছ না যে।) হয়তো, এটুকুই

ফরাসি জ্ঞান জেনে আমার অপর বন্ধু মঞ্জুষ দাশগুপ্ত না তিরস্কার করে বসে। দু' অক্ষরের 'পরমাত্মীয়' শব্দটা আমরা পরস্পর নিভৃতে খুব উচ্চারণ করি। পুষ্করবাবু, আমার ফরাসি জ্ঞানের দৌড় তো জানেননি। ষাট দশকে আমি অ্যাপোলোনিয়রের তর্জমা করেছিলাম— এ খবর অন্তত মঞ্জুষ জানেন, তবে ইংরেজি থেকে। বলতে পারেন তর্জমার তর্জমা। দুধ থেকে পাউডার আবার গুলে সেই দুধ।

হ্যাঁ, একথা মানি চোখ তৈরি হলে তবেই বোঝা যায় তুলির-টান। একটি রেখার সঙ্গে সূক্ষ্ম আর একটি রেখার মিলমিশ কি পার্থক্য।

কেমন জানেন? ধরুন, প্রথমে গজল ধরেছেন জগজিৎ সিং 'ইয়ে দৌলত ভি লে-লে। লৌটা দে মেরা বচপন!' এর পরই চিত্রা সিং গাইছেন 'কাল চৌদ ভী এক রাত থি।'

— মনে হয় নাকি যে, পাহাড়ের পাশেই এক ঝিরিঝিরি নদী। আর যদি শোনেন এম. এস. শুভলক্ষ্মীর ভজন— যদি শুনে থাকেন কায়মনোবাক্যে কখনও তবে তার অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, তিনি আক্ষরিক অর্থেই মন্দিরের এক পবিত্র পরিবেশের ভিতর প্রবেশ করেছেন... 'উপলব্ধি' তখন শুধুমাত্র একটি অভিধানিক শব্দ নয়, অন্য— অন্যতরো কিছু—।

'কাছা দেয় মদের দোকানী।'

— এ লাইনটা কাব লেখা? যে কোনও রসিক পাঠক জানেন যে, এ লাইন শক্তিদা ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবেন না। লেখা সম্ভবও নয়। সত্যিই পা থেকে সেদিন, মাথা টলমল করে উঠেছিল— তখন আমি হাওড়ার হেড অফিসে ঘাড় গুঁজে লেজারে—। চারতলায় কীভাবে যে নিষেধের বেড়া তুলে ফেলে শক্তিদা সামনে হাজির হয়ে যান? তারপর ঝড়ের মতো এসে আমার 'বস' কে তাপ্পি দিয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে যান মেছো হাটেব ঠেকে আজও তা আমার কাছে একটি অভিজ্ঞতা। আমি জন্মেছি হাওড়া শহরে। কিন্তু ওই 'ঠেক' ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ এক অনাবিষ্কৃত রাজ্য। অথচ, তখন হাওড়ার ডি. এম. দীপক রুদ্র, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পার্থসারথি চৌধুরী।

আর একবার হাওড়ার বাড়িতে, মধ্য দুপুর গড়িয়ে— সদর দরজার কড়া সশব্দে জানান দেয় 'তিনি এসে গিয়েছেন' স্বভাব সুলভ স্বরে একবার শুধিয়েছিলাম: কে—?

'দরজা খোলো, তবে টের পাবে বাবা-আ!'

আরে! এ যে শক্তিদার টলটলে গলা! জয়নারায়ণবাবু আনন্দ দত্ত লেনের প্রতিটি ইট জেনে যায় যে শক্তিদা এসে গিয়েছেন?

শেক্সপিয়ার সরণির কালীদার চেম্বারে কে না গিয়েছেন? রাঘা বাঘা টপ অফিসিয়াল থেকে বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীবী মায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই আমি পর্যন্ত। একেবারে সরাইখানা। গাঁজা পার্কে যেমন বিমল রায়চৌধুরী, কালীদার চেম্বারে তেমনই কালীদাই ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম।

এই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত 'এলফিনে'-আমাদের সপ্তাহান্তিক আড্ডা ছিল। মদ্য পানও চলত, সাহিত্যও চলত একেবারে দু'ভাই হাত ধরাধরি করে! কে না আসত? কানাই কুণ্ডু থেকে রবীন সুর, উত্তম দাশ, চারু খান প্রমুখ প্রায় সবাই!

আর ডিউক? তখন, ঝিনচাক ব্যাপারটা ঠিক জমে ওঠেনি। মানুষ হিসাবে তৃপ্তিবাবুর তুলনা নেই। ওঁর ঠিক দোকানদারি মেজাজই ছিল না কখনও। আমার পকেট একেবারে গড়ের মাঠ! কিন্তু তৃপ্তিবাবুকে একবার উঠে গিয়ে বলতেই 'আরে, ঠিক আছে!' ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। কিন্তু তখনই একশো টাকার মতো বিল হয়ে গিয়েছে। শান্তি, শুধুমাত্র কর্মচারী নয়— সে আমাদের ছোট ভাইয়ের তুল্য, সদা হাস্য! ওই আলো-আঁধারিতে একবার একটি ছোট টেবিলে বসে অর্ডার দিয়েছি, হঠাৎ সন্তোষদার গলা। 'তোমার তো সাহস কম নয় দেবী? এ টেবিলে না বসে ওখানে চলে গেলে? হোয়াট অডাসিটি য়্যু হ্যাভ? কী ব্যাপার তোমার।' সন্তোষদা, তার আগেই বেশ কয়েক পাত্র চড়িয়েছেন বোঝাই যাচ্ছে! হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করেন 'তুমি কি কম্যুনিস্ট?'

— সন্তোষদাকে বোঝাবার চেষ্টা করি প্রতিবাদের কবিতা লেখার অর্থ নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট হওয়া নয়?

তখন উনি, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেসে ওঠেন, বলেন: তোমার জনৈক দাদা বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি কম্যুনিস্ট। কিন্তু, তুমি তার নাম আমার মুখ দিয়ে বলাতে পারবে না।

— আমি জানতে চাইও না সন্তোষদা। তিনি তাঁর মতো থাকুন। আমি আমার মতো— আমি কখনও আপনার কাছে চাকরির আর্জি নিয়ে যাইনি।

— 'যখন আমি টুসকি দিলেই এক একটা চেয়ার এসে যেত, তখন তুমি যাওনি-ই বা কেন?'

— জানেন, অলিম্পিয়ায় একবার অর্ধেন্দু চক্রবর্তী আর আমি হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি... পাশের টেবিলে একজন ধমকের স্বরে এক ভিনদেশি মানুষকে বলে ওঠেন:

'আরে, এখানেও হিসেব? আরে ব্যাটা আউজগা আছি, কাউলকা নাই।'

আড্ডা: একটি অবিকল্প জানলা

কৃষ্ণা বসু

কিশোরী বয়সেই আমার বন্ধুরা আমাকে নাম দিয়েছিল 'আড্ডারু', যে ভাল সাঁতার দেয় সে যেমন 'সাঁতারু', যে ভাল আড্ডা দেয় সেও তবে 'আড্ডারু'— এই বিবেচনায় আর কি! তা আড্ডা আমি দিতাম খুবই, সকালে আড্ডা, সন্ধ্যায় আড্ডা, এমনকী কলেজে উঠে ক্লাস পালিয়ে দুপুরেও আড্ডা। আমার অভিভাবকরা বলতেন, 'ক্লাসে তো পারবি না, ওই আড্ডাতেই ফার্স্ট হবি আর কি!"— তা গুরুজন-বাক্য আমি মাথা পেতে নিয়েছিলাম, মনোযোগ দিয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আড্ডা দিয়ে গিয়েছি এবং যেহেতু 'আড্ডা' নামক এই অসাধারণ, স্পর্শকাতর, উচ্চমানের শিল্পটি আজও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তাই নেহাত এ বিষয়ে আমার ফার্স্ট হওয়াটা হয়ে ওঠেনি। আমার মনে হয়েছে আড্ডা একটি অসাধারণ শিল্প, যৌথ শিল্প, যা হঠাৎ হঠাৎ-ই নির্মিত হয়, সব শর্তপূরণ হলেও কখনও-বা ঠিকঠাক হয় না তার নির্মাণ, আবার দু-একটি শর্ত কখনও কমবেশি হলেও বেশ জমে ওঠে, উত্তীর্ণ হয়ে যায় এই যৌথ শিল্পটি, ঠিক ভাল শিল্পের মতো, কখনও হয়ে ওঠে, সব সময়ই হয়ে ওঠে না। শাস্ত্রে অধিকারী আর অনধিকারী বলে দুটি শব্দ আছে শুনতে পাই, একমাত্র 'আড্ডা' শাস্ত্রটিতেই আমি নিজেকে গভীর অধিকারী বলেই জানতাম, অনেক ভেবেচিন্তে এই বিষয়টি সম্পর্কে এত দিনে কিছু সামান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, আগে পরে যাচাই করে দেখেছি, আমার মতো সামান্য জনের সেই সিদ্ধান্ত বহু বিজ্ঞজনও সমর্থন করেছেন। প্রথমত আমি ভেবে দেখেছি গান যেমন সবাই গাইতে পারে না, চেষ্টা করলেও পারে না, তেমন-ই চমৎকার আড্ডা সবাই দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে',— ব্যাপারটা এরকমই, যে বা যাঁরা আড্ডা দিতে পারেন, তাঁরা আপনিই পারেন, তাঁদের ব্যক্তিত্বের এক সহজাত গুণের মতো এই আড্ডা দেবার গুণটি।

আমি পরিচিত পুরুষদের মুখে মুখে মাঝে অভিযোগ শুনেছি, মেয়েরা আবার আড্ডা দিতে পারে নাকি? মেয়েরা জানে শুধু শাড়ি গয়না আর সংসারের গল্প,— 'এই শাড়িটা কত দিয়ে কিনলি ভাই? এই গয়নাটা কোথ থেকে গড়ালি ভাই?'— এইসব ছাড়া আর কথা আছে নাকি মেয়েদের?' আমি তাঁদের কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছি বারে বারে, 'কেন শার্ট প্যান্ট জুতা জামার গল্প, সংসারের গল্প ছেলেরা করে না? মেয়েরা কী গল্প করে নিজেদের আড্ডায়, তা ছেলেরা জানবেই বা কেমন করে?' মেয়েরাও বিভিন্ন বিষয়ে আড্ডা দেয়, আসল কথা, আড্ডা তো উঠে আসে যাপিত জীবন থেকে। আজকের মেয়েদের জীবন এবং অভিজ্ঞতা, কর্মপরিধি কত বেড়ে গেছে, ফলে আড্ডার পরিধিও বেড়েছে সেই সঙ্গে। তাছাড়া আড্ডার সাবলীল মুহূর্তে মেয়েরাও মেয়েদের কাছে অনেকখানি অন্তরঙ্গ অনায়াস মেজাজে ধরা দেয়, তার ভেতরের দুঃখ-অপমান, গৌরব-গরিমা, সুখ-আনন্দ— অনেক কিছুর খবর পাওয়া যায় সেখান থেকে।

ছোটবেলায় দেখেছি পাশের বাড়িতে দারুণ একটি মহিলা-মজলিশ বসত। দুপুরবেলায় ভাতটাত খেয়ে উঠে, সকালবেলাকার হেঁশেলের পাট চুকিয়ে মা, পিসি, জ্যেঠি, কাকিরা এক জায়গায় জড়ো হত। রোজই নয়, তবে প্রায়ই দুপুরে জমে উঠত সেই মেয়ে-মজলিশ।

আমাদের এক পাড়া সম্পর্কে জেঠিমা ছিলেন, তাঁর একমাত্র মেয়ে— বিয়ে হয়ে গেছে সেই কবে, জেঠা সারাদিন অফিস কাছারি করতেন, জেঠিমার ঘরের সংলগ্ন ঢাকা বারান্দায় বসত সেই মেয়ে-মজলিশ। সবচেয়ে অল্পবয়সি, সঙ্গলোভাতুর সদস্য ছিলাম আমি। গ্রীষ্মের আর পুজোর ছুটির কিংবা পরীক্ষা শেষের দুপুরে গিয়ে জুটতুম সেই আড্ডায়। আমাদের এক ছোট ঠাকুমা ছিলেন এ আড্ডার পাণ্ডা, মাথাভর্তি চকচকে সাদা চুল একটিও কাঁচা নেই, পানের রসে ঠোঁট দুটি টুসটুসে, কপালে আধুলি সাইজের লাল টিপ, জীবনের রসে টইটম্বুর এই মানুষটিও বড়ই টানত আমায়। সে আড্ডায় কোন আলোচনা যে না হত, তা জানি না, বড়ি দেওয়া, সোয়েটারের প্যাটার্ন, কোন রান্নায় সাদা জিরে, কোথায় কালো জিরে, কিসে রাঁধুনি, কার সঙ্গে পেঁয়াজ চলে, কার সঙ্গে সরষে, ব্যানার্জি গিন্নির ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়েছে, কলকাতায় বাসা নিয়েছে, মাকে একবারই বিজয়ার দেখাটা করতে আসে, দত্তদের মেজ মেয়েটাকে ফি রোববার পাত্রপক্ষরা দেখতে আসে, কোনও পক্ষেরই কেন পছন্দ হচ্ছে না,— এসব তো আলোচনা হতই এ ছাড়া খবরের কাগজ আর আকাশবাণীর কল্যাণে কিছু রাজনৈতিক ঘটনা, লোমহর্ষক সংবাদ,— এসবও এসে পড়ত মাঝে মাঝে। এবং এসব আলোচনার সঙ্গে অনিবার্য ভাবে এসে পড়ত

'নারীগণের পতিনিন্দা'। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা' থাকত, সেই মজলিশ মঙ্গলেও নারীগণের পতিনিন্দা ছিল একটি অবশ্য আলোচ্য বিষয়। একজন তাঁর স্বামী কী রকম ঘুম কাতুরে, শ্রমভীরু, বেলা করে ঘুম থেকে উঠেই অফিস যাবার জন্য হুলুসস্থুলুস বাধিয়ে দেয়, এ কথা আরম্ভ করতে না-করতে, অন্যজন তাঁর কর্তা কী রকম ভুলো মনের মানুষ সে বিষয়ে বিস্তারিত বলতে আরম্ভ করেন। বন্ধু দম্পতিতে ছুটির দুপুরে ভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বাড়িতেই বলতে বেমালুম ভুলে বসে আছেন। যথারীতি রবিবার দুপুর বারোটার সময় নিমন্ত্রিতরা এসে হাজির তখন সে কি বিশ্রী অবস্থা,— তার বিবরণ দাখিল হতে থাকে মজলিশে। এই অভিযোগ, অনুযোগ, অনুরাগ উচ্চারণের মধ্যে একটি সত্য খুবই ধরা পড়ত; এই সব জেঠিমা, কাকিমা, মাসিমারা ছিলেন স্বামী সম্পর্কে খুবই সচেতন, অনেকে ছিলেন রীতিমত স্বামী-গরবে গরবিনী, আবার যাঁর স্বামী কিছুটা দীনহীন বিপন্ন মানুষ, তিনি স্বামীর কারণেই সেই মেয়ে মজলিশে কুণ্ঠিত থাকতেন বোধ হয়। স্বামী মানে তো তখন (এবং এখনও অনেকাংশে) স্টেটাস, মান মর্যাদা, গৌরবগরিমা আবার বিপরীতে লজ্জা কুণ্ঠা অপমানও বটে। নিজের তো কোনও স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল না, স্বামী, শ্বশুরের, পিতৃগৃহের, প্রতিষ্ঠিত ছেলের পরিচয়েই এই মানুষগুলির পরিচয় ছিল। যে কথা বলছিলাম, 'নারীগণের সেই পতিনিন্দা'-র মধ্যে শ্লেষ অলঙ্কারের মতো প্রচ্ছন্ন অনুরাগ খুব প্রকাশ পেত। শুধু এই সব আলোচনার সময় তিনজনকে দেখতাম চুপ করে থাকতে। একজন হল বিনুপিসি, বিনুপিসির স্বামী বিনুপিসিকে নিত না, আর একজন ঘোষাল জ্যাঠাইমা, বালবিধবা, দেওরের সংসারে সে ছিল আশ্রিতা, আর তৃতীয় জন ছিল বয়স্কা কুমারী, রূপহীনতার জন্য যার বিয়েই হয়নি, চুল পাতলা হয়ে টাক বেরিয়ে পড়েছে, ঠোঁট মোটা, উঁচু কপাল, কেমন খড়িওঠা ছিল তার গায়ের রং,— সে ছিল মনাদিদি। পাড়ার সব ছোটদেরই মনাদিদি ছিল সে, অদ্ভুতভাবে চুপ করে থাকত এইসব আলোচনার সময়, আর তার হাতের উলকাঁটার কিংবা লেস বোনার কুরুশ চলত দ্রুতলয়ে, খুব গোপন করা দীর্ঘ নিশ্বাস কখনও শুনতে পেতাম তার কাছটিতে বসে থাকলে। দত্ত কাকিমা প্রায়ই অভিযোগ করতেন, 'এত করি, সারাদিন খেটে মরি, তবু কারও মন পাই না, না শাশুড়ি না ননদের।' এ অভিজ্ঞতা অভিযোগ শুধু দত্ত কাকিমা কেন প্রায় সবারই ছিল। অতসী বউদির স্বামী তাদের পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোজগার করতেন, তাই তাঁর টাকায় তাঁর পরিবারের অন্য সকলের পোশাক আশাক, সাধ আহ্লাদ মিটত, অতসী বউদি এ ব্যবস্থা খুব খুশি মনে নিত না। নিজের ইচ্ছামত শাড়ি গয়না সে কিনতে পারত না শাশুড়ি জা ননদের ভয়ে। এইসব শাশুড়ি-শাসিত, ননদ-তাড়িত মহিলারা অন্য কারও

ননদ রূপে কিংবা পরবর্তী কালে শাশুড়ি রূপে কোন ভূমিকায় ছিলেন তা অবশ্য জানার কোনও উপায় আমার ছিল না। তখন দু-চারজন মেয়ে বউ সেই মফস্‌সল থেকে চাকরি করতে যেত কলকাতায়; স্থানীয় স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করেন দু-একজন, সেই মেয়ে-আড্ডা-সমিতির কেউ-ই চাকরিবাকরি করত না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের ছিল না, দুপুরগুলি ছিল মৃদু আলস্য এবং বিশ্রম্ভালাপে ভরা, এক ধরনের মন্থরতা ছিল সে সব দুপুরে, এখনকার দুপুরগুলির থেকে তা কত আলাদা। যাঁরা চাকরি করতেন তাদের সময় অভাবও বটে, আবার মানসিকতাও থাকত না বলে তাঁরা এসব দ্বিপ্রাহরিক বৈঠকে আসতেন না; যেমন রমলাদি, শুভাবউদি এরা শিক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু এঁদের দুপুর-আড্ডায় কচিৎ দেখা যেত। এই চাকুরিরতা মহিলাদের সম্পর্কে এক ধরনের মিশ্র মানসিকতা প্রকাশ পেত এই মেয়ে মজলিশের সদস্যাদের মধ্যে, কেউ বলত, 'দেমাক, দুটো পয়সা ঘরে আনছে তো তাই দেমাক, আমাদের আর মেশার যুগ্যি মনে করেন না পটের বিবিরা!' কেউ আবার বলত, 'আচ্ছা ওদের সময় কোথায় বলত, আমাদের নেহাত দুপুরটা কাটতে চায় না, তাই তো—।' সেই আধুলি সাইজের লাল সিঁদুরের টিপ পরা রাঙা টুসটুসে ছোট ঠাকুমাই কেবল বলত, 'ওরকম করে বলিস না, ঘর সংসার চাকরি বাকরি এই যে দু-দুটো দিক সামলাচ্ছে এ কী কম কথা! দ্যাখ বাপু তোরা যদি লক্ষ্মী হোস, ওরা তাহলে মহালক্ষ্মী বুঝলি।' আমার কিশোরী মন দিয়ে আমি এইটুকু অন্তত বুঝতে পারতাম যে ওরা এই মেয়ে মজলিশের সদস্যাদের ঈর্ষার পাত্রী। সামান্য হাত খরচাটুকুর জন্য যাকে স্বামী কিংবা ছেলের ওপর, ভাসুর কিংবা দেওরের ওপর নির্ভর করতে হয়, তার ভেতর যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন অপমান থাকত তা ওদের ভিতরে ভিতরে মারত, আর সেই সূক্ষ্ম অপমানের মারটুকুকে ঢাকবার জন্য কেউ কেউ চাকরি করা মহিলাদের দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করতে তৎপর হত। ওরা ছেলেমেয়েদের ভাল ভাবে যত্ন করে মানুষ করে না, ওরা শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে না, পটের বিবি ঠাকরুনটি সেজে সব স্কুলে অফিসে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী সন্তানের সেবা করে, হেঁসেল ঠেলে ওঁরা খুবই সুখে আছেন তা কিন্তু ওদের কথা থেকে প্রকাশ পেত না। এই আড্ডার অন্যতম সদস্যা বিশ্বাস কাকিমা গল্প করতে করতে অর্ডারি সোয়েটার বুনত, অর্ডারি ব্লাউজের হেম সেলাই করত, দু-দশ টাকা নিজস্ব রোজগার ছিল তার; তার কাছ থেকে শিখে নিয়ে তারই মতো দু-চার টাকা নিজস্ব উপার্জনের দিকে আগ্রহ জেগেছিল কারও কারও, এগুলি ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের অতি দূরবর্তী কিন্তু প্রথম আকাঙ্ক্ষা। অপর্ণা কাকিমা বলে এক জ্ঞাতি কাকিমা ছিলেন আমার, তিনি একদিন বললেন, 'হাত তোলা তো, নিজেদের হাত

থেকেও নেই, বড় ছেলের কাছে পাঁচটা টাকা চাইলাম, ফিরিওয়ালা এসেছে একটা ফুলতোলা টেবিল ক্লথ বড় পছন্দ হল রে, তা ছেলে বলল 'টাকা ফাকা হবে না, আমার হাত খালি।' আজ মাসের ৪ তারিখ হাত খালি হয় কী করে ভগবান জানেন!' বলতে বলতে বড় ধূসর রঙের চোখ দুটি জলে ভরে এসেছিল তাঁর। এই সব আড্ডার সবচেয়ে সত্য দিক যেটি আমার কিশোরী মনকে স্পর্শ করে যেত, তা হল প্রায় একই ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের একগুচ্ছ মানুষী পরস্পরকে সঙ্গ দিত, ক্ষতের শুশ্রূষা করত, আপদে বিপদে সাহায্য পরামর্শ দিত, ভালবাসা সখীত্ব দিত এবং সংসারের জোয়াল টেনে চলার রসদ জোগাত পরস্পরকে, ভালবাসত, হিংসে করত, আবার ভালবাসত। এই আড্ডাটি থেকে কেউ উঠতেন চারটের গাড়ি স্টেশনে ঢুকলেই, ছেলেরা ফিরবে ইস্কুল থেকে এক পেট খিদে আর হাত পা ভরা ধুলো নিয়ে; তাদের মুখ হাত ধোয়ানো, খেতে দেওয়া আছে, তার-ভর্তি শুকনো জামাকাপড় তোলা আছে। ছোট্‌ ঠাকুমা উঠতেন সবার আগে, আচার বড়ি এইসব তৈরি করার নেশা ছিল তাঁর— ছাদ-ভর্তি সেসব রোদ্দুর খাচ্ছে, তুলতে হবে রোদ পালাবার আগেই। সবাই চলে যাবার পর বিনুপিসি উঠত। তার কোনও তাড়া ছিল না, কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে নেই, অন্ধ বুড়ি মাকে নিয়ে বিনুপিসি একা একা থাকত। বুড়ির কিবা দিন কিবা রাত! এক একদিন দেখেছি সবাই উঠে যাবার পরও বিনুপিসি চুপ করে বসে থাকত জ্যেঠির ঢাকা বারান্দার কোণে, তার খোলা রুখু শুকিয়ে-আসা চুলগুলিতে খেলা করত বিকেলের হাওয়া। আমার ইচ্ছে করত বিনুপিসি, মনাদিদি, অপর্ণা কাকি এদের সবাইকে আমি আস্ত এক একটা রঙিন জীবন উপহার দিই!

আমি খুব বিশ্বাস করি, মানুষকে পেশায় যতটা চেনা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি চেনা যায় তার নেশাতে। পেশার মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা আছে। অনেক সময় ইচ্ছা খুশি মতন পেশাও আমরা নির্বাচন করে নিতে পারি না অনেকেই। তাই কর্মক্ষেত্রে যতখানি কাজ এবং যতখানি আলস্য হয়; ততখানি চিত্তবিশ্রাম হয় না (যাঁদের হয় তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান); তাই তার জন্য অনেককেই নিজের নিজের ইচ্ছা রুচিমাফিক আড্ডা তৈরি করে নিতে হয়।

এ রকম একটি আড্ডার খবর আমি জানি যা গড়ে উঠেছে নিত্য যাত্রিণীদের ট্রেনের মহিলা-কামরায়। আমি যে আড্ডাটির কথা বলছি তা শিয়ালদহ মেন লাইনের সকালের আপ ও সন্ধ্যার ডাউন ট্রেনের মহিলা-কামরার আড্ডা। কল্যাণী, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর-গামী সকালের আপ ট্রেনের এবং শিয়ালদহ-গামী সন্ধ্যার ডাউন ট্রেনের মহিলা-কামরা প্রায়ই এই আড্ডায় ছুটন্ত ট্রেনের গতিতে স্পন্দিত হতে থাকে। এঁদের অধিকাংশ চাকুরি-জীবিনী, সামান্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীও আছে, দু-একজন

আছে স্বনিযুক্ত পেশায়, একজন একটি ছোট কারখানাও চালান স্বামীর সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে। যেহেতু স্রোতের বিপরীতে এই আপ ট্রেন সকালের, এবং ডাউন ট্রেন সন্ধ্যার, তাই ট্রেনের গোলমাল না থাকলে ভিড় থাকে সহনীয় রকমের। অনেকেই বসে যান, সামান্য দু-চারজন দাঁড়িয়ে বা পালা করে বসে, আড্ডা চলে অবিরাম। সারাদিন যে যার পেশায় নিযুক্ত থাকেন, সারা সকাল সময়ের সঙ্গে বাজি ধরে সংসারের কাজ, বেরুনোর প্রস্তুতি সারেন, সন্ধ্যা উতরে বাড়ি ফেরেন প্রায় সবাই। ফিরেই সান্ধ্য জলখাবার, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার তদ্বির করা, কখনও দূরদর্শনে সিরিয়াল, রাত্রের রান্না (কাজের লোক থাকলেও তদারকি করতে হয় প্রায় সকলকেই), পরদিন সকালে বেরুবার প্রস্তুতি, কাজের লোক না থাকলে তো কথাই নেই এবং কে না জানে পৃথিবীর সবচেয়ে নশ্বর বস্তু হল এই কাজের লোকগুলির স্থায়িত্ব, এসব কারণে এই নিত্য যাত্রিণীদের সকাল সন্ধ্যার ট্রেন জার্নির কিছুটা অবকাশ ভরে ওঠে সখী সংবাদে। আমি নিজে এই আড্ডার নিয়মিত অংশীদার। আমার ছোটবেলার সেই জেঠির বাড়ির ঢাকা বারান্দার আড্ডার থেকে এ আড্ডা মেজাজে মর্জিতে, চালে চলনে অনেকখানিই আলাদা। খুব জমে এই আড্ডা এক এক দিন। ট্রেনের ধাবন্ত গতি, হু হু হাওয়া, মাঝে মাঝে হকারদের চিত্ত চমৎকারী চিৎকার, কখনও কামরার ফ্যান ধর্মঘটীর মতো নিশ্চল, তবু তারই মাঝে সুখদুঃখের গল্প, সমস্যার উচ্চারণ, সমাধান, কখনও খুব ব্যক্তিগত কথাবার্তা, রোজকার নিত্যযাত্রার বৈচিত্র্যহীনতা ঘুচিয়ে দেয়, গড়ে তোলে এক স্বাচ্ছল উষ্ণ পরিবেশ। একটি বিষয় প্রায় সবাই একমত যে, 'আহা, এই চব্বিশ ঘন্টার দিনটাকে টেনে যদি ছত্রিশ ঘন্টার করা যেত।' এই আড্ডায় অন্য সব মেয়ে-আড্ডার মতোই সংসার সন্তান স্বামী এসবের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যে প্রসঙ্গটি বারে বারেই ফিরে ফিরে ওঠে তা হল— কাজের লোকের প্রসঙ্গ। সারাদিন সবাই বাড়িতে থাকতে পারেন না, কাজের লোকের উপর ভরসা করা ছাড়া উপায়ান্তরও নেই। তাই কাউকে 'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করার পর উত্তরে যদি বিষণ্ণ হাসি কিংবা 'ভাল নেই' শোনা যায়, তারপরে অনিবার্য ভাবে পরবর্তী প্রশ্নমালা, 'শরীর খারাপ নাকি?' 'কাজের লোক পালিয়েছে?' 'নতুন কাজের লোক পেয়েছেন?'— উত্তরে কেউ বলেন, 'বাড়ির লোকের থেকে কাজের লোকটা বেশি জরুরি।' এই সুরসিকার প্রতি-উত্তর দেন কেউ, 'তার মানে বাড়ির লোকটি অকাজের লোক বলো?' কিংবা কেউ বলে 'আর বলো না, কাজের লোকরাই তো রেখেছে আমাদের'— অসাধারণ বাকপটু যাজ্ঞসেনী বলে, 'রেখেছে মানে কি রে? 'রাখোয়াল', 'রক্ষিতা' নাকি রে আমরা?'— তার এই রসিকতায় হো হো হু হু হি হি হাসির ফোয়ারা তার জলকণা ছড়ায়।

এ রকম হাসিঠাট্টার মধ্যেই একদিন এক মর্মান্তিক গল্প, না গল্প নয়, ঘটনা জানতে পারলাম। শান্তি নামের সহজ সুশ্রী, মেয়েটি কৃষ্ণনগরের দিকে কোন স্কুলে পড়ায়। বেচারাকে আসতে হয় কোন সকালে, ফেরেও সন্ধ্যার পর পরই, ছোট্ট একটি মেয়ে আছে ওর এই পাঁচ কি ছয় বছরের। সেই শান্তির জীবনের ঘটনা। একটি তরুণী কাজের মেয়ে ছিল তার বাড়িতে, সব কাজ মেয়েটি কাজে যোগ দেবার পর দায়িত্বের সঙ্গে বুঝে নিয়েছিল, ছোট মেয়েটিকে রেখে আসে তাই বড় উদ্বেগ ছিল তার; স্বামী খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে যত্ন নিতে পারে না, এ নিয়েও বেদনা ছিল তার, আমরা শান্তির কথার থেকে বুঝতে পারতাম তা। কিন্তু শান্তির শান্তি থাকল কই? এক বছর যাবার আগেই শান্তি বুঝতে পারল তার স্বামী এই কাজের মেয়েটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, বুঝতে পেরেও শান্তি নিজেকে প্রবোধ দিত, না, সে যা অনুভব করেছে বুঝেছে তা ঠিক নয়, তার নিজের মনকে শক্ত করতে চাইত। কিন্তু ক্রমে সত্য এতই স্পষ্ট হল যে শান্তি এক দিন ক্ষোভে প্রতিবাদে তীব্র হয়ে উঠেছিল, তার উত্তরে তার দাসীর সেবায় অভ্যস্ত স্বামী বলে বসেছিল, 'তোমার না পোষায় তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে পারো।' অপমানিত শান্তি সত্যি চলে এসেছে তার বালিকা কন্যাটিকে নিয়ে। গ্রামের স্কুলের শিক্ষিকা সে, মেয়েকে ভর্তি করিয়েছে নিজের স্কুলের মর্নিং সেকশনে, স্কুলে কোয়ার্টার্স পেয়েছে, সেখানেই সে উঠেছে। এ ঘটনা যাঁর মুখ থেকে আমরা শুনি তাঁর সত্যবাদিতায়, সততায় আমাদের গভীর আস্থা; বর্ষীয়সী রমাদির বলা শেষ হলে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। একজন শুধু বলে ওঠে, 'বাঃ চমৎকার প্রতিদান!' মন্তব্যকারিণী কার প্রতি কার প্রতিদানের কথা বললেন ঠিক বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ নীরবতার পর রমাদিই বললেন, 'তোরা যাই বলিস লোকটা মানে শান্তির বর কিন্তু ভণ্ড নয়, সম্পর্ক তা হোক না কাজের মেয়েটির সঙ্গে, তাকে সে স্বীকার করেছে। আরে বাবা, সেবাযত্ন যে করে তাকেই তো ভোগ করতে, এই সেদিন পর্যন্ত তেমন মেয়েকেই তো বিয়ে করতে অভ্যস্ত ছিল সব। এত যে গালভরা 'ওয়াইফ্' 'ওয়াইফ্' বলে চেঁচাস, 'স্ত্রী' একটু সম্মানিত কাজের লোক ছাড়া কী বলত?'— এইখানে প্রতিবাদ ওঠে, 'রমাদি সবাই শান্তির বরের মতো নয়, তাহলে এতগুলো সংসার টিকত না!' কেউ বলে, 'দুর্বলতা এসে পড়লে তা জয় করাই তো শিক্ষা।' আলোচনা ঘুরে যায় মেয়েদের সামাজিক মূল্যে, পুরুষদের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায়, চাকুরিজীবী মেয়েদের অসুবিধার কথা কেউ ভেবে দেখে না, এই অভিযোগে। স্নিগ্ধা নামের এক লেডি ডাক্তার বললেন, 'সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানেন, মেয়েরাই মেয়েদের এখনও যোগ্য সম্মান দেয় না, দিতে শেখেনি। আমার একটি পরিচিত মেয়ে তার কিছু মেয়েলি সমস্যার জন্য লেডি ডাক্তারের

কাছে কিছুতে যাবে না দেখাতে, অবচেতন মনে বদ্ধমূল ধারণা যে পুরুষ ডাক্তাররা যোগ্যতর। ভাবুন অবস্থাটা? ভালভাবে ডাক্তারি পাশ করে হাউসস্টাফ থেকে পুরোদস্তুর ডাক্তার হয়ে বসেছে যে, তাকে শুধু মহিলা বলেই আর একজন মহিলা সূক্ষ্ম ভাবে অবজ্ঞার চোখে দেখবে? কেন দেখবে বলুন?' এর উত্তরে একটি বেদনাময় নীরবতা নেমে আসে, হকারদের ডাক, ট্রেনের ঘর্ঘর ধ্বনির মধ্যে সেই নীরবতা আরও তীব্র হয়ে বাজে আমাদের সকলের বুকের ভেতরে। এক অধ্যাপিকা বান্ধবী হাসতে হাসতে বলে ওঠেন, 'আমার চাকরি পনেরো বছরের হল প্রায়, আমার ইন্টারভিউয়ের সময় শুনেছিলাম কলেজ কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিল মহিলা নেওয়া হবে না, পুরুষ অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে, অথচ কলেজটা কো-এড কলেজ, ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ে এখানে, শেষমেশ আমিই নির্বাচিত হই, সে অন্য গল্প; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটার কথা ভাবুন, যোগ্যতা পুরোপুরি থাকা সত্ত্বেও মেয়ে হওয়াটা কি অপরাধ নাকি?' সব বিষয়েই রঙ্গ করে আমাদের বান্ধবী মৃন্ময়ী। সে বলে, 'ওসব কথা বলিস না ভাই, নাইট শো-এ সিনেমা দেখার পর বউ সঙ্গে আছে বলেই বর যখন বেশি পয়সা কবুল করেও ট্যাক্সি জোগাড় করে, কিংবা যখন বিবাহবার্ষিকীর কথা মনে করে পিওর সিল্ক কি তাঁত সিল্ক আনে, তখন কি মনে হয় মেয়ে হয়ে জন্মানোটা অপরাধ? আমি ভাই জন্ম-জন্মান্তর মেয়ে হয়েই জন্মাব।' তার কথায় হাসে কেউ কেউ, কেউ মৃদু করুণার চোখে তাকায়, কেউ আবার এই স্বামী সোহাগিনীকে ঈর্ষা করে, কিন্তু আমরা দু-একজন জানি সবটাই মৃন্ময়ীর রসিকতা, গত ছয় মাস ধরে মৃন্ময়ীর স্বামী বেকার, চাকরি নেই তার। মৃন্ময়ীর উপার্জনই এখন তাদের সংসারের ভরসা। ওই ভাবেই ওই মেয়ে হাসি দিয়ে সব কিছু ঢেকে রাখে। মৃন্ময়ীর মতো কিছু মেয়ে আজকাল সংসারের প্রধান আর্থিক অবলম্বন হয়ে উঠছে, ফলে পরিবারে তাদের ভূমিকাটুকুও পালটাচ্ছে।

কোনও কোনও দিন খুব হুল্লোড় হয় মহিলা কামরায়। কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ির মতন কণা কণা খুশি ওড়ে কামরার চঞ্চল বাতাসে। অকারণ খুশিতে কেউ গান ধরে, 'তুমি খুশি থাক, আমার পানে চেয়ে চেয়ে খুশি থাক!' রমাদি রসিকতা করে, 'আহা মরে যাই রে, রান্নাবান্না ছেলেমেয়ে সামলানো সব ছেড়ে যদি ওই গানখানা গাইতে পারতাম, শুধু খুশি থাকে না রে, শ্রম দিয়ে বা টাকা দিয়ে খুশি কিনতে হয়।' 'আঃ রমাদি তুমি সবতেই সিরিয়াস কেন গো?' গানের খুশিটুকুকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিবাদ করে সেই লেডি ডাক্তার স্নিগ্ধা। এই সব আড্ডায় রাজনীতি, সংস্কৃতি, ফিল্ম, সাহিত্য, দূরদর্শন, আকাশবাণী, সংগীত সব কিছু যখন তখন উঠে পড়ে। একটা জিনিস লক্ষ করবার মতো যে মেয়েরা আর ছোট্ট ইউনিট নিজের পরিবার শ্বশুর-শাশুড়ি

দেওর-ননদ, স্বামী-সন্তানের মধ্যে নিজেদের আলোচনা আড্ডার বিষয়কে সীমাবদ্ধ রাখছে না। ছোটবেলার আড্ডায় দেখেছি, কেউ অসবর্ণ বিয়ে করছে, তাকে কেন্দ্র করে নিন্দা বা সমর্থনের একটা আলোচনা তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যেত। আর এখন দেখছি, বয়স ছ-বছর আট বছরের ছোট পাত্রকে প্রেম করে বিয়ে করলেও তা বিশেষ আলোচনার বস্তু হয়ে উঠছে কই? ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা বোধ সত্যিই বেড়েছে আমাদের? আমাদের এই আড্ডায় দুজন বিবাহ-বিচ্ছিন্না আছেন, যার মধ্যে একজন শুধু ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং প্রচ্ছন্ন অমর্যাদার কারণেই বিবাহ ভেঙে চলে এসেছেন, আর একজন পুরনো দাম্পত্যে যথার্থ প্রেম না পেয়ে নতুন প্রেমটিকে বিবাহ-পরিণামী করবেন বলেই বিবাহ-বিচ্ছিন্না। মনে পড়ে মফস্‌সল শহরের বিনুপিসি মনাদিদির কথা। নাম করে বলা অনিরাপদ এবং গোপনীয়তার প্রশ্ন এখানে অনিবার্য, তাই, অনুচ্চারিত থাক পরিচিতি, এমন দু-চার জনের কথা মনে পড়ছে যাদের বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমও রয়েছে। স্বামী ছাড়াও রয়েছে ঘনিষ্ঠ বান্ধব কারও কারও, কেউ আবার স্বামীর অনানুরাগের জ্বালায় অপমানে কিছুটা প্রতিশোধ স্পৃহায় সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছেন। কোনও কোনও নারী আজ আর শুধু প্রথাগত সম্পর্কে বাঁধা থাকছেন না, তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি মেয়েরা তাঁদের ব্যক্তিগত এই ধরনের সম্পর্ক সম্বন্ধে খুব গোপনীয়তা পছন্দ করেন। আমি শুনেছি, পুরুষরা তাদের ঘনিষ্ঠ আড্ডায় কিছুটা অগোপন হতে ভালবাসেন, কখনও আবার অতিরঞ্জন থাকে তাঁদের কথায়। কিন্তু মেয়েরা নিরাপত্তাবোধ সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন, তাই অধিকাংশ সময় এই সম্পর্কের ঘর রুদ্ধদ্বার থাকে, দৃষ্টির জ্ঞানের বাইরে থাকে সকলের, অন্তত মেয়েটির দিক থেকে এই সতর্কতাই স্বাভাবিক।

স্বনিযুক্ত ব্যবসায়ী মেয়ে নিজে একটি প্রেস চালান কিংবা ছোট কারখানা চালান এসব কি ভাবা যেত এই সেদিনও! এ আড্ডায় কিছু নিত্য যাত্রিণী আছেন যাঁরা দীর্ঘদিন চাকরি করছেন, অর্থনৈতিক অবলম্বন আছে বলেই, কিংবা সংসারে অন্য কোনও উপার্জনক্ষম মানুষ নেই বলে, কেউ তাদের বিয়ের কথা ভাবেননি, তাদের কারও চোখের তলায় কালি জমে, যেন খর গ্রীষ্মকাল জেগে থাকে তাদের চারিপাশে, স্বার্থপর উদাসীন সংসার তাদের কুসুমিত হতে দেয়নি। কল্পনা নামের মেয়েটির বয়স হয়েছে ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। তার উপরেই তাদের সংসারের ভার, বুড়ি মা আর ছোট দুটি ভাই বোনের দায়িত্ব তার ওপর, ভাই এখনও বেকার। কিছু কিছু মেয়ে থাকে ঘর সংসারের জন্যই তৈরি, সে সব মেয়ে যখন নিজের ঘরটুকু পায় না, সে বড় বেদনার। কল্পনার নিকট-বান্ধবীরা তার জন্য ঘর বাঁধার ব্যবস্থা করে একটি উপযুক্ত বয়স্ক পাত্রও জোগাড় করে ফেলেছিল। প্রায় পাকা হয়ে আসা সেই

বিবাহ-সম্বন্ধ ভেঙে গেল তার উপর নির্ভরশীল বেকার ছোট বোনের ষড়যন্ত্রে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব মানুষকে, এমনকী নিজের ছোট বোনকেও কতখানি অমানুষ করে তোলে তার দৃষ্টান্তে আমরা হতবাক হয়ে যাই। এ ঘটনা ঘটেছে তিন বছর আগে তারপর আর কল্পনা নিজের ঘর বাঁধার চেষ্টা করেনি।

আজকাল বিভিন্ন পাড়ায় খুব মহিলামহল গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর এবং পুরো সময়ের গৃহিণী— সব রকম মহিলাই থাকছেন এই সব মহিলামহলে। এই মহিলামহলগুলির প্রধান আকর্ষণ আড্ডা, সঙ্গ-সুখ। এরকম সব মহিলা মজলিশ আবার চমৎকার সব নামও রাখছে নিজেদের আড্ডার, 'সখী সমিতি', 'কিছুক্ষণ', 'সঙ্গসুখ', 'সখী সমাচার', 'মহিলা মজলিশ'— আপাতত মনে পড়ছে এই পাঁচটি আড্ডার নাম। এই ধরনের নাম দেবার মধ্যে একটা সুরুচি ও শিক্ষার ছাপও রয়েছে। আমার বসবাসের কাছেই এ রকম একটি মহিলা মজলিশের খবর আমি জানি। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা তাদের আড্ডা, ওই আড্ডারই কোনও এক সদস্যার বাড়িতে বসে; এক এক শুক্রবার এক এক জনের বাড়িতে। তাছাড়া দুপুরে বৈঠক তো আছেই অনিয়মিত। আমি যে সব সময় হাজির থাকতে পারি, প্রতি সাপ্তাহিক বৈঠকে যে উদিত হতে পারি, তা নয়; তবে আড্ডার টান প্রেমের টানের মতোই তীব্র, না গিয়ে পারি না, মাঝে মাঝেই চলে যাই। গত শুক্রবার গিয়ে একটি মজার ঘটনা, আবার মজার নয়ও, জানতে পারলাম। এই আড্ডার কনিষ্ঠ সদস্যাদের এক জনের নাম সুমনা, খুবই ব্যস্ত মেয়ে, মেয়ে মজলিশে কমই আসে, কিন্তু যখন আসে তখন তার সুন্দর সপ্রতিভ বাচনভঙ্গি সুশ্রী উপস্থিতি আমাদের সকলেরই মনোহরণ করে নেয়। দারুণ মেয়ে সে, অল্প বয়সেই নামী প্রতিষ্ঠানে চার হাজারি মনসবদার হয়ে বসেছে, এ হেন সুমনার বিয়ের জন্য তার বাবা মা এবং একমাত্র ভাইটিও খুব তৎপর হয়েছে। কিন্তু পাত্র যা পাওয়া যায়, মানে, প্রতিপত্তিতে, চাকুরির স্টেটাসে সবাই সুমনার চেয়ে কিছুটা কমজোরি। শেষে একটি পাত্র, দেখতে নব কার্তিক, সেও তিন হাজারি মনসবদার, উন্নতির দরজা অবধারিত ভাবে সামনে খোলা, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল সুমনার। পাত্রপক্ষ দেওয়া-থোওয়া, নমস্কারি, ফার্নিচার নিয়ে পাকা কথা বলতে এসে বলে বসলেন, 'দেখুন, ছেলের বিয়েতে কেউ ঘর থেকে খরচা করে না, ছেলেকে মানুষ করতেও তো কম যায়নি, বেশি নয়, হাজার ত্রিশ দেবেন, ও আপনাদের কাছে কিছু না।' এই পাকা কথা বলার সময় মহিলা মজলিশের সভানেত্রী ছিলেন সুমনাদের বাড়ি, তিনি সুমনার মায়ের বান্ধবীও বটে, তাঁরই মুখে শুনলুম। পাত্রপক্ষের এই কথার উত্তরে সুমনার মা, নিজে একটি স্কুলের শিক্ষিকা তিনি, খুব শান্তভাবে বলেছেন, 'সে তো ঠিক কথাই, ছেলেকে মানুষ করতে অনেক

খরচ হয়েছে আপনাদের, তিরিশ হাজার তো দাবি করতেই পারেন, দেব তিরিশ হাজার, তবে কিনা আমাদের মেয়েকেও মানুষ করতে কম খরচ হয়নি, এই বয়সেই মেয়ে আমার চার হাজার পায়, আপনারাও আমাদের চল্লিশ হাজার দেবেন, তাহলে কাটাকুটি করলে দাঁড়ায় দশ হাজার, ওই দশ হাজারই বিয়ের সাত দিন আগে পাঠিয়ে দেবেন।' আর বলা তো বাহুল্যই, বিচক্ষণ পাঠক পাঠিকা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সেখানে সুমনার বিয়ে হয়নি, হয়নি তো বহুত আচ্ছা, আমাদের সুমনার ঢের ঢের পাত্র জুটবে কিন্তু এ কথা শোনার পর সুমনার মা সলিলা দিদিমণিকে এক হাজার অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না। গোটা বাংলা জুড়ে প্রতিটি মেয়ে মজলিশে সলিলা দিদিমণির মতো বুদ্ধিমতী তেজি দু-চারজন করে দরকার, তাতে করে বিবাহ-উপযোগী মেয়েগুলিরও কিছু আত্মসম্মান জাগে। 'সুমনার মায়ের দৃষ্টান্ত সবাইকে দেওয়া যায় না'— এ কথা বললেন মিসেস ঘোষ, তাঁর দুটি বিবাহ উপযোগী কন্যা ঘরে বসে রয়েছে। তাঁর বেদনা আমরা বুঝি। স্বীকার করি যে সবাই সুমনার মতো এমন চমৎকারভাবে স্বনির্ভর নয়। কিন্তু যে মেয়েটি সারা জীবনের জন্য একটি গৃহে (শ্বশুর বা স্বামী গৃহে) সঙ্গ, সেবা, মাধুর্য দেবে, রান্নাবান্না করবে, সন্তান পালন করবে, সন্তানের শিক্ষা স্বাস্থ্য দেখবে— সে যে এত কিছু দিতে যাচ্ছে তার জন্য তো প্রাপ্য অনেক টাকা, কেন না সে যে শ্রম দান করছে তার কি কোনও মূল্যই নেই? সে কি ভাত কাপড়ের বিনা মাইনের কাজের লোক? সে সব তো সে পায়ই না উপরন্তু তার বাবা মাকেই দিতে হয় গয়নাগাটি, পোশাক-আশাক, যাবতীয় ফার্নিচার, নগদ টাকা। কারখানায় শ্রম দান করলে তা নিজের কারখানা হলেও পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, ইস্কুল কলেজ অফিস কাছারি সবেতেই শ্রম দান করলে টাকা পাওয়া যায়, শুধু সাংসারিক শ্রমের জন্য টাকা পায় না সংসারের এই নিত্য নারী শ্রমিকগুলি। অধিকন্তু একটু ভাল ভাত কাপড়ের এই চাকরিটির জন্য মেয়ের বাবা মাকে ঘুষ দিতে হয় হাজার হাজার টাকা। কেন?

আমাদের এই আড্ডায় এক অংশীদার শ্রীরূপা, একটি কলেজে পড়ায়, ওর স্বামীও একটি কলেজের লেকচারার, ছোট একটি ছেলে আছে ওদের; সে শুক্রবার শ্রীরূপার বাড়িতে ছিল সান্ধ্য-আড্ডা। আমার যেতে একটু দেরি হয়েছে, শ্রীরূপার ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল, পা দিয়ে দেখি বসবার ঘরে শ্রীরূপা জমে আছে জমজমাট আড্ডায়। আর রান্নাঘরের থেকে সহাস্য মুখে এক পট কফি তৈরি করে নিয়ে শ্রীরূপার বর খাবার ঘরের টেবিলে এনে রাখল। মহিলাদের কেউ কেউ এ দৃশ্য দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে গেলেন, 'ইস আপনি কেন আপনি কেন, আমরা বানিয়ে নিচ্ছি চা কফি।' সমবেত মহিলাদের দিকে তাকিয়ে শ্রীরূপার বর সাগর একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে

উঠল, 'মাননীয়াগণ, এই করেই নিজের নিজের পায়ে কুড়ুল মারিতেছেন। কেন, সংসারের কাজ আপনারা করিতে পারেন, আমরা পারি না? আসল কথা কি জানেন, আপনারা নিজেদের সাম্রাজ্যে কাহাকেও ঢুকিতে দিবেন না, এই তো? সেটি হইতেছে না, এক্ষণ হইতে আমরাও এ সাম্রাজ্য কিছুটা দখল নিব, বুঝিলেন মহাশয়ারা।' সাগরের কথাবার্তা সব সময় মজাদার নাটকীয়, এ আমরা আগেও লক্ষ করেছি। এই বলে সে কফি পট থেকে নিজের জন্য এক কাপ ঢেলে নিয়ে নিজের পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল। ওই ঘর থেকে তার ছেলে তখন চেঁচিয়ে তার বাবার কাছে পড়া জানতে চাইছে, 'বাবা অ্যাটিচুড কথাটার মানে কী হবে?' মনে মনে এই অধ্যাপকটিকে আমি অভিনন্দন জানালাম। কথা বলে দেখেছি জীবন সম্পর্কে সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এই মানুষটির। বাইরে নারী নির্যাতনের উপর বক্তৃতা করে বাড়ি ফিরে এসে ছোটখাট সামন্ত প্রভু হয়ে বসেন না। এই আড্ডায় ওই সন্ধ্যাতেই কফি পান করতে করতে শুনলুম রাণু, আমাদেরই পাশের বাড়ির রাণুকে পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল গত রবিবার। পাত্রের মামা বলেছিলেন, 'তুমি তো মা সারাদিন অফিসে থাকবে, তা শ্বশুর-শাশুড়িরও তো ইচ্ছে হবে একটু সেবাটেবা পেতে, কী করবে মা, তুমি?' রাণু নাকি গম্ভীর ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আপনারা তো ছেলের বউ খুঁজতে এসেছেন, নার্স-এর দরকার ছিল তা তো জানতাম না।' এ কথা শুনে পাত্রের মামা আহত হলেও পাত্রটির নাকি মেয়েটির এই ব্যক্তিত্ব এতই ভাল লেগেছে যে সে ঠিক করেছে ওই মেয়েই সে বিয়ে করবে। রাণুর ভাবী বর, শ্রীরূপার বর সাগর— এমন মানুষের সংখ্যাও আজকাল বাড়ছে। আশার, আশ্বাসের কথা।

আজকাল অধিকাংশ সংসারে ক্ষুদ্রতম ইউনিট, স্বামী-স্ত্রী একটি বা দুটি সন্তান, ব্যস। আগেকার যৌথ পরিবারে যে নিরাপত্তা, সঙ্গসান্নিধ্য মিলত তা আজ আর নেই। এইসব আড্ডাগুলি সেই সঙ্গসান্নিধ্য এবং কখনও প্রয়োজনে নিরাপত্তা দানও করে বই কী।

আড্ডার কি ঠিকঠাক কোনও প্রতিশব্দ আছে? নেই বোধ হয়, আমি তো অনেক খুঁজেও পাইনি, 'সভাসমিতি' এর ধারকাছ দিয়েও যায় না, ইংরেজি শব্দ 'পার্টি, তাও নয়। দুটি মাত্র শব্দকে পেয়েছি যারা আড্ডার নিকটাত্মীয়— এক 'বৈঠক', দুই 'মজলিশ'। আড্ডাবাজ মানুষের সঙ্গে মজলিশি মানুষের একটা মিল আছে। তা ঠিক প্রতিশব্দ না থাক, তা দিয়ে মাথাব্যথা অভিধান প্রণেতার, আমার মনে হয় অবিকল্প এই আড্ডার এক ঈশ্বর আছেন, তিনিই আড্ডাধারী মানুষগুলিকে মজান, রসান এবং প্রসন্ন কৌতুকে আড্ডাধারী মানুষগুলির মুখের দিকে তাকান। আড্ডাধারীদের বুকের মধ্যেও মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকে ঈর্ষার বিষাক্ত সাপ, তাই দেখে তিনি

গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। আড্ডা তো অনেক রকমেরই দেখলাম, শুধু পুরুষরা নিজেদের মধ্যে কেমন আড্ডা দেন তা জানবার কোনও উপায় আমার নেই, কেন না জীবনযাপনের পুরুষসঙ্গীটি এবং পরিচিত বন্ধুস্থানীয় পুরুষেরা কেউই যথাযথ ছবিটিকে তুলে ধরবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। শুধু মেয়েদের আড্ডার একটি নিজস্ব মেজাজ আছে; আবার নারী পুরুষের মিলিত আড্ডার একটি মৌতাত থাকে, এই ধরনের মিলিত আড্ডার টেবিল গুলজার হয়ে ওঠে কলেজ স্ট্রিট কফি-হাউসের কয়েক কাপ কফিকে কেন্দ্র করে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কফি হাউসে, বসুশ্রী সিনেমার পাশের কফিখানায়, এ রকম আড্ডা শুনেছি বসে। সাহিত্যের এক চমৎকার আড্ডা বসে প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় 'প্রমা' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে বাসন্তীদেবী কলেজের বিপরীতে 'হিমনীল'-এ। কলেজ স্ট্রিট কফি ঘরের এক একটি টেবিলকে কেন্দ্র করে আট দশটি চেয়ার জড়ো হয়, নারী-পুরুষ সবারই সেখানে অধিষ্ঠান, সর্বার্থসাধক এ আলোচনা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট টনিক। সব আড্ডারই ধর্ম বোধ হয় নমনীয়তা, ফ্লেকসেবিলিটি, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসেও তাই। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এর মুক্তপক্ষ বিহার। কারও বাড়িতে আড্ডা দিলে যেমন সেই গৃহকর্ত্রী বা গৃহকর্তার প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতেই হয় চা-কফি টুকিটাকি খাবার পরিবেশন করে বাড়ির মালকিন আড্ডাকে সঞ্জীবিত করেন, কফিঘরে তো তেমন নয়, আর নয় বলেই বেশ একটা গণতান্ত্রিক মেজাজ আছে এ-আড্ডার। রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত কেউ উঠে যেতে বলবে না, খুশিমত সুগন্ধি উষ্ণ কফি, টাটকা খাবার সর্বদাই প্রস্তুত, পার্স বা পকেট রুগণ না হলেই হল। আড্ডালিপ্সু বাঙালির একটু দুর্নাম আছে আড্ডা-প্রবণতার জন্য, কলেজ স্ট্রিট কফিঘরের আড্ডারুরা সেই দুর্নামকে মাথা পেতে নেন, ভাবখানা এই যে— 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।'

কথা হচ্ছিল কলেজ স্ট্রিট কফিঘরের টেবিলে ঘিরে বসে কলকাতার বর্ষা নিয়ে, হঠাৎ চলে এল গ্রুপ থিয়েটারের কথা, মৃচ্ছকটিক, রাণীকাহিনী, নাথবতী অনাথবৎ, যখন একা, ফুটবল, মিস্টার কাকাতুয়া, ঘাসিরাম কোতোয়াল, চরণদাস চোর হয়ে আলোচনা ঘুরে গেল পদ্য লেখা, ছন্দ, মিল, সুররিয়ালিজম, কমিউনিকেশনের সমস্যা; আবার আড্ডা-নদী বাঁক নিল উৎপলেন্দু, গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনি— কোনও ঠিক নেই— আড্ডার নদী ইতিউতি কোন দিকে ছোটে। এর মাঝে মাঝে থাকে পরচর্চার অতি মুখরোচক মশলা। লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা তাদের আর্থিক সংকটের কথা বলেন, কেউ কেউ নিজের পত্রিকা পুশ সেল করেন— বিজ্ঞাপন না-পাওয়ার জন্য ক্ষোভ করেন। কেউ আবার

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শিল্প-সাহিত্যের চলমান পরিবেশকে নস্যাৎ করে দেন। কেউ ব্যক্তিগত বিষ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ করে ফেলেন, কিন্তু তবু এ আড্ডায় যত বিষই থাক অমৃতটুকুই শেষ কথা, এই যে সঙ্গসান্নিধ্য এই আঁচ থেকে অনেকে আমরা শীতটুকু ঝেড়ে ফেলি, ভিজে হাত দুটিতে তাপ দিই। একঘেয়েমি ভরা জীবনে যথেষ্ট নয় কি এই বিষামৃতে মেলা উত্তাপ? কেউ কেউ বলেন কফি হাউসের এই সম্মিলিত শব্দপুঞ্জে তাদের মাথা নাকি ধরে যায়। আমি তাদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারি না। আমার মনে হয় এই শব্দপুঞ্জে, সিগারেটের ধোঁওয়া, কফির গন্ধ, ছোট ম্যাগাজিনের সম্পাদকের অহংকৃত উচ্চারণ কখনও পরচর্চা, তরুণ লেখক-লেখিকার আত্মবিশ্বাসী মুখগুলি— সব কিছুর মধ্যে এমন একটি অবিকল্প আমেজ আছে যে মাথাটি না ধরে আমার মাথাটি বুঁদ হয়ে যায় তাতে। আর এও কি কম কথা এক সঙ্গে বিভিন্ন টেবিলে একশো দেড়শো জন অতি তরুণ অনতি তরুণ, পরিণত তরুণ মানুষ মানুষী বসে শিল্প সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠেছে, তা যতই তাৎক্ষণিক পক্ষপাতদুষ্ট (কখনও বা ঈর্ষাকাতর)— হোক-না-কেন, তা নিশ্চয়ই আমাদের গরিমারই ব্যাপার, লজ্জার নয়। এই শিল্প-সাহিত্যকেন্দ্রিক আড্ডাটি শনিবারের সন্ধ্যায় সাধারণত বসে, কখনও বৃহস্পতিবার বা অন্য বারও। এরা সন্ধ্যাবেলা টিউশানি করতে পারতেন, ঘরে বসে বসে দূরদর্শনের আপাত মনোরঞ্জক সিরিয়াল দেখতে পারতেন, নিদেনপক্ষে এক টুকরো ঘুমিয়ে নিয়ে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে পারতেন, তা না করে এই কফিঘরের আড্ডায় বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে মেতেছেন— এটাই আমার বেশ ভাল লাগে। আমাদের সবাইকার কত রকমের সমস্যা, দুঃখ, বেদনা রয়েছে, যেন প্রত্যেকের বুকের ভেতরে একটা করে করুণ দীনহীন প্রদীপ জ্বলছে, সব প্রদীপগুলো এক জায়গায় মিললে একটু দেওয়ালি দেওয়ালি মনে হয় বই কী!

যে আড্ডার রং আজ ধূসর

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

'তখন গোলদিঘির চারপাশে এত দোকানপাটই ছিল না। গোলদিঘির একটা আলাদা সৌন্দর্য ছিল। সন্ধে নেমে আসত গোলদিঘির জলে। মির্জাপুরে ত্রিপুরা হিতসাধনী হলের পাশে আমাদের মেসবাড়ি ছিল। সন্ধের পর সেখানে বসত আড্ডা। গোলদিঘির উত্তরের একটি দোকান থেকে আনা তেলেভাজা আর মুড়ি ছিল আড্ডার আবশ্যিক উপাদান। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, গোকুল নাগ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে অনেকেই আসতেন সেই আড্ডায়। অনেকে বলতেন কল্লোলীয় আড্ডা। আমি জানি না এখনকার মেসবাড়িগুলিতে এ রকম আড্ডা বসে কি না।' অনেক বছর আগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সভায় প্রেমেন্দ্র মিত্র এই স্মৃতিচারণ করেছিলেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া বলে মির্জাপুর, আমহার্স্ট স্ট্রিট, বৌবাজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, বৈঠকখানা অঞ্চলে মেস, হস্টেল, বোর্ডিং-এর ছড়াছড়ি এই শতকের গোড়া থেকেই। মফস্‌সল থেকে যারা আসত তাদের আশ্রয় ছিল মেস-হস্টেল। শুধু কবি সাহিত্যিক নয়, পরবর্তী কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন এমন বহু মানুষের ছাত্র জীবন বা তার পরবর্তী কাল কেটেছে মেস-হস্টেলে। শিবরাম চক্কোত্তি তো মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে মুক্ত আরামে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন। অভিনেতা জহর রায়ের নিজস্ব বাড়ি ছিল। কিন্তু পটুয়াটোলা অঞ্চলের একটি মেসে তাঁর ঘর ছিল। সেই ঘরের ছাদ পর্যন্ত ছিল নানান বইতে বোঝাই। জহর রায়ের ঘরেও আড্ডা বসত। অভিনেতা জহর রায়কে অনেকে চেনেন কিন্তু পড়ুয়া জহর রায়কে অনেকেই চিনতেন না। এ রকম অনেকেই আছেন যাঁদের স্মৃতির অনেকটাই জুড়ে আছে মেস-হস্টেল।

তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ঠিকই বলেছিলেন। এখনকার মেস-হস্টেলগুলিতে কিন্তু সেই আড্ডা বসে না। আগেকার মতো কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এখন মেস বা

বোর্ডিং-এ থাকেন না। কিন্তু অধ্যাপক থাকেন। তাঁদের ঘরে হয়তো মাঝে-মধ্যে আড্ডা বসে। কিন্তু আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু হয় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি। এখনকার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্য-নাটক নিয়ে আলোচনা কম হয়। সেই জায়গাটা অধিকার করে নিয়েছে টিভি। সন্ধে বা রাতে যেটুকু অবসর তা টিভি দেখে কেটে যায়। তাছাড়া এখনকার প্রজন্মের মানসিকতাও বোধহয় পাল্টে গেছে। সম্পূর্ণ প্রফেশনাল আউটলুক বা পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি। বয়স থাকতে থাকতে কেরিয়ার তৈরি করে নাও। কবিতা-গল্প পড়লে কেরিয়ার হয় না। আগেকার দিকে বাবা-মায়েরা যা বলতেন এখনকার দিনে ছেলে-মেয়েরা সেটা মেনে নিয়েছে।

আমরা মির্জাপুরে যে মেসে থাকতাম সেখানে মাঝেমধ্যে আসতেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদ্যোত ভদ্র প্রমুখ। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় চাইতেন তখন মেসে থাকতে। মেসের জীবনযাত্রা উপভোগ করতে। মনে আছে এরকম এক সন্ধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। এখনকার ছেলেরা সাহিত্যচর্চায় সে রকম উৎসাহী নন শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন ওঁরা। এ কথা শুনে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, সাহিত্যিকরা যদি গার্হস্থ্য জীবন ছেড়ে মেসে থাকতে শুরু করেন তাহলে মেসবাড়ির আড্ডা আবার জমে উঠতে বাধ্য। কিন্তু সাহিত্যিকরা মেসে থাকতে চাইবেন কি? বোধহয় না। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মেসে আড্ডা জমাতে চাইলেও টিভি-পর্দার সামনে থেকে এখনকার প্রজন্মকে টেনে আনতে পারবেন কি? শারদ-সাহিত্য বাদ দিলে এখনকার তরুণ যুবকরা এমনি বই-টই পড়ে কি? আমি মির্জাপুর শিয়ালদহ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি মেসে প্রায়ই যেতাম। কিন্তু সাহিত্য নাটক নিয়ে আড্ডা বা এমনই স্রেফ আড্ডা চোখে পড়েনি। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় অমন যে কফি হাউস আর বসন্ত কেবিনের আড্ডা তাও তো এখন অনেক ম্লান। বরং সেদিক থেকে মির্জাপুরের ফেবারিট কেবিন ধারাটা টিকিয়ে রেখেছে। এই চায়ের দোকানটি কল্লোল যুগ থেকেই বিখ্যাত। এখনও সেখানে চায়ের কাপ নিয়ে আড্ডা বসে। রাজা উজির মারা হয়। কত রাজনীতিক বাত হয়ে যায় প্রবীণ কিংবা নবীনের তর্কের ফোয়ারায়।

বৈঠকখানা রোডের একটি মেসে থাকতেন অধ্যাপক স্বপ্নেন্দু রায়। ভীষণ পড়ুয়া মানুষ। আবার আড্ডা মারতেও ভালবাসতেন। ওঁর দুঃখ এখনকার প্রজন্ম আড্ডা মারতে যেতে ভুলে যাচ্ছে। ওঁর ঘরে থাকে দুটি জীবনবিমা ও আর্থিক সংস্থার কর্মী। তারা সারাদিন ব্যবসার হিসেবনিকেশ করে।

সমরেশ বসু একবার আমায় বলেছিলেন, ওঁর বিখ্যাত গল্প আবাদ কিংবা

জোয়ার-ভাঁটার সূত্র কিন্তু বৌবাজার একটি মেসের আড্ডা। ওই আড্ডা থেকেই তিনি উপাদান পেয়েছিলেন। নিজের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রঙে মাখিয়ে ওই গল্পগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। সমরেশ বসুরও দুঃখ ছিল এখানকার মেস-বাড়িগুলিতে সেই আড্ডা আর বসে না।

১৯৮৬-র জুনে ইউরোপ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে লন্ডন। অক্সফোর্ড নিবাসী নীরদ সি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি মির্জাপুরে মেসে থাকি শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। মির্জাপুর-কলেজ স্ট্রিটেই নীরদবাবুর অর্ধেক স্মৃতি। ওঁর মতে কলকাতার আসল গন্ধটা পাওয়া যায় এই অঞ্চলে। তিরিশের দশকে বিভিন্ন মেসে থাকতেন বিখ্যাত সব মানুষজন। বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপও হত এইসব মেসে। সন্ধের পর মেসের আড্ডায় না জমলে নীরদবাবুর মন ভরত না।

পরিচয় পত্রিকার অফিসে সেই সময় বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি, নীরেন রায় সমস্ত দিকপাল মানুষজন। হীরেন সান্যালের স্মৃতিকথায় আছেঃ রাত বাড়লে পরিচয়ের এই আড্ডা উঠে আসত কোনও না কোনও মেসে।

নীরদবাবু বলেছিলেন, তিরিশের দশকে মেসে সারা মাস থাকলে খেতে লাগত আড়াই-তিন টাকা। এখন কত লাগে? তাঁর প্রশ্নে বলেছিলাম কোনও কোনও মেসে তিন-সাড়ে তিনশো আবার কোথাও চার-পাঁচশো টাকা। নীরদবাবু বলেছিলেন, তখন হিন্দু হস্টেলে এমনকী মেসগুলিতেও মাসের শেষে গ্র্যান্ড ফিস্ট হত। এখন কি হয়? আমি ওঁকে জানিয়েছিলাম এখনও হয়। নীরদবাবু বলছিলেন, হোটেলে খাওয়ার থেকেও ভাল লাগত ওই গ্র্যান্ড ফিস্টের খাওয়া। সেই মর্মে সারাদিন আড্ডা। আমি ওকে বলেছিলাম, খাওয়াদাওয়া হয়। কিন্তু সেই আড্ডাটা আর নেই। নীরদবাবু শুনে বিষণ্ণ হয়েছিলেন।

এবার এখানকার মেস-হস্টেলগুলিতে আড্ডার কিছু নমুনা দেওয়া যাক। বৌবাজার স্ট্রিটের একটি মেস। বেশ পুরনো। সরিৎশেখর বসু কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসের পদস্থ কর্মী। বিয়ে করেননি। বাড়ি বর্ধমান শহরের কাছে একটি গ্রামে। মাসে একবার করে বাড়ি যান। সন্ধে হলেই তাঁর ঘরে আড্ডা বসে। আড্ডায় যাঁরা আসেন তাঁরা সবাই যে মেস বাসিন্দা তা নয়। কিন্তু সরিৎশেখর বসুর ঘরের আড্ডা তাঁদের প্রিয়। আড্ডা মারতে মারতে রাত গড়িয়ে যায়। কারুর বাড়ি সোনারপুর, কারুর বরানগর, কারুর বা কসবা। ফিরতে হয়। সরিৎশেখরবাবু তাঁর এই ঘরের আড্ডা নিয়ে খুব গর্বিত। এঁরা সকলে সাহিত্য, নাটক, গান ভালবাসেন। রাজনীতির কথা এঁদের আড্ডায় কদাচিৎ ঢোকে। কারণ বর্তমান রাজনীতিতে এঁরা বীতশ্রদ্ধ।

মির্জাপুরে আমাদের স্টুডেন্টস হস্টেলের (যা এখন বড় মেস) আড্ডায় জমাটি তরুণ ছিল দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। সে বেচারি এখন নাগপুরের কাছে গোন্ডিয়ার বাসিন্দা। রেলের কর্মী। তার দুঃখ ভরা চিঠি আসে মেসের আড্ডা থেকে বঞ্চিত বলে। তবে বছরে দু-একবার সে ফাঁক পেলেই চলে আসে কলকাতায়। দেবজ্যোতি বা গৌতম মুখোপাধ্যায় এই প্রজন্মেরই প্রতিনিধি। কিন্তু তারা একটু ব্যতিক্রম। টিভির চেয়ে বই পড়া তাদের প্রিয়। আড্ডা না মারতে পারলে তাদের প্রাণ আই ঢাই করে। আমার কবি-বন্ধু সুব্রত সরকার, ছাত্রনেতা তাপস দত্ত বা সৌমিত্র মণ্ডল ছুটে আসে মেসে নিছক একটু আড্ডা মারার জন্যে। সাংবাদিক বন্ধু কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত প্রায়ই আমায় বলে, তোর প্রতি হিংসে হয়। মেসে থাকিস। আড্ডার এত সুযোগ। গার্হস্থ্য জীবনে এটা আমরা পাই না।

এই সেদিনও কলেজ স্কোয়ারে ব্যাপটিস্ট হস্টেলে ছাত্রনেতা সৌমিত্র মণ্ডলের ঘরে তুমুল আড্ডা বসত। প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ, বিদ্যাসাগর, সিটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আসত। রক্ত টগবগ করত সকলের। প্রত্যেকের চোখে সমাজ বদলানোর স্বপ্ন। সৌমিত্রর ঘরের আড্ডায় রাজনীতির বন্যা বইত। মার্কস-এঙ্গেলস, গান্ধী, মাও নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি। সেই আড্ডা নেই। রাজনীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক নেই।

এবার শেষ করি সত্তর বছরের আড্ডাধিপতি সরোজ চাটুজ্যে মশাইকে দিয়ে। চাটুজ্যে মশাই বিয়ে-থা করেননি। তিন কুলে কেউ নেই। ৫১ বছর আগে কলেজে পড়তে এসে বৈঠকখানার মেসে এসে উঠেছিলেন। এখনও সেই মেসেরই বাসিন্দা। ওঁর ঘরে এখনও আড্ডা বসে। আড্ডার শরিক যাঁরা তাঁরা সকলেই কমবেশি চাটুজ্যে মশাইয়ের সমবয়সি। সব থেকে যিনি তরুণ তাঁর বয়স ৬২। তবে এঁরা পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে ভালবাসেন না। বর্তমান সময়ই তাঁদের আড্ডার বিষয়। বিশের দশকের কলকাতার চাইতে রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ বা সলমন রুশদি নিয়েই ওঁদের আগ্রহ অনেক বেশি।

কলকাতার আড্ডা

মন্দার মুখোপাধ্যায়

আড্ডা ব্যাপারটা বোধহয় কলকাতারই। না হলে গগনচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বাবাদের সেই 'গগন দাদামণি' অবসর গ্রহণের পর, খড়দা থেকে প্রায় প্রতিদিন কলকাতার ক্রিক লেনে আসতেন, তাঁর দাদা বিপিনবিহারীর সঙ্গে দাবা খেলতে, আর রাতে খড়দা ফিরতেন শেষ ট্রেন চেপে। এই আড্ডাটা সম্ভবত শিরোমণি বাড়িতে জমত না। তাই খড়দারই না— আড্ডাবাজ মেজোকাকা (খশু) ছোটকাকা (সনু) তাঁদের চাকরি জীবন শেষ করে কেউই কলকাতায় থিতু হলেন না। কাকিমাদের শত অসন্তোষ সত্ত্বেও তাঁরা থাকতে চাইলেন খড়দায়, কলকাতার 'আড্ডাবাজির' বাইরে।

আমি অবশ্য বড় হয়েছি দুরন্ত আড্ডার পরিবেশেই। ঘরে বাইরে আড্ডা। বাবা পিসিদের সঙ্গে জুটে মা-ও খুব আড্ডাবাজ হয়ে গেলেন। যাই হোক, বাবার গল্পে শুনেছি ছাত্রজীবনে তাঁর কলকাতার আড্ডার কথা। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়তেন। দাদু-ঠাকুমা থাকতেন কটক। বাবা থাকতেন তালতলায় একটা নিজস্ব ঘর ভাড়া করে। এ সময় তাঁর বন্ধু ছিলেন, রাজেন তরফদার, রথীন মৈত্র, বরোদা গুহ। আড্ডা বসত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। এই অঞ্চলেরই আশেপাশে থাকতেন তাঁর কটকের বন্ধু অক্ষয়কুমার সুর। বাবার আমৃত্যু সখা আমাদের হামদুকাকু। চল্লিশ সালে তোলা তাঁর বন্ধুদের দলের একটি ছবি দেখে বোঝা যায় আড্ডায় উৎফুল্ল মুখগুলি— কী আনন্দে মেতেছে সকলে। এই বন্ধুদের দলের কাউকেই আমি চিনতে পারি না। কিন্তু তাদের সেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছিপছিপে চেহারার সাদাকালো ছবি আমাকে সরাসরি বসিয়ে দিত আড্ডার আসরে। বাবা যখন তাঁর ছাত্রজীবনে কলকাতার আড্ডার গল্প বলতেন, বলতেন তালতলায় তাঁর সেই ভাড়া বাড়িতে জমজমাট শোরগোলের কথা, দলবেঁধে স্কেচ করবার আনন্দ, কবরখানায় গিয়ে ফুলের ছবি আঁকা, আমি কল্পনায় ওই সব মুখগুলির ঠোঁটে কথা বসিয়ে বলতাম— 'তুমি এই বললে, আমি এই বললাম।'

আমার কৈশোরে তাঁকে দেখেছি, খড়দা থেকে কলকাতার দু-তিনটি আড্ডার ঠেকে চলে আসতে। একটি হল, সুকিয়া স্ট্রিটে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। তখন আমি বছর দশ-এগারোর খুকি, তাঁর বাড়ির পরের স্টপেজেই ব্রাহ্ম গার্লস হস্টেলে থাকি। মন কেমন করলেই আমাকে দেখতে আসতেন। ডাকসাইটে হস্টেল সুপারের অনুমতিও পেতেন, মেয়েকে একটু দেখে যাবার। আর ফেরবার পথে 'পবিত্রদার' বাড়ি আড্ডা মেরে সন্ধে কাটিয়ে, মন খারাপ কাটিয়ে খড়দায় ফেরা। মাঝে মাঝে রবিবার সকালে আমাকে নিয়ে বাড়ি ফেরবার পথেও চলে আসতেন আড্ডাস্থলে। আমিও পৌটলা-পুটলি সমেত চুপটি করে বসে থাকতাম এক কোণে, বাবার পিঠ ঘেঁষে। সারতেন 'জরুরি আলোচনা'— চা, সিগার হইহই এর মধ্যে। হস্টেল থেকে ছাড়া পেয়ে মশগুল হয়ে দেখতাম, সবে তারুণ্য পার হওয়া এক দঙ্গল তাত্ত্বিক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষকে। মাঝে মাঝে ঢুকতে বেরোতে দেখতাম তাঁর ছেলে পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি তখন বাটার জুতোর দোকান সাজাচ্ছেন, ইলাসট্রেশন করছেন। শান্তিনিকেতনী পর্দা টানা একতলার আড্ডাঘরটা শুরু হত একেবারে ফুটপাথ থেকে। একধাপ উঠলেই দরজা। আর পর্দা সরালেই, ইজিচেয়ার, মোড়া, তক্তপোষ, টুল। অন্যেরা বাবার মতো লম্বা পাঞ্জাবি ঢোলা পায়জামা পরা নয়। সাদা ধুতি, খদ্দরের বা আদ্দির পাঞ্জাবি। গোল পাইপিং গলা। সকলেরই কাঁধে বাদামি ঝোলা এবং চোখে কালো পুরু ফ্রেমের চশমা। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হয় 'দা' বা 'বাবু' বলছেন। এবং 'আপনি'। আমিও তাঁকে পবিত্রদাই বলতাম, মনে মনে। এখানে একজন জাঁদরেল মানুষকে সবাই প্রেমেনদা বলতেন। পরে ছবি দেখে বুঝেছি উনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। আমি আড্ডার বিষয় কিছুই বুঝতাম না। আমাকেও কেউ খুকি বলে বাড়তি আদর দেখাত না। গাল টিপে বলত না কী নাম? মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে টেবিলে রাখা চানাচুর-বিস্কুট নিয়ে আসতাম। মুঠো ভরার ইচ্ছেটা নির্ভর করত বেলা বাড়ার বহরের ওপর। দুটো নাগাদ আড্ডা ভাঙত। তিনটে বাজিয়ে যখন আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন, তখন বাসে এক ঘুম দিয়ে নিয়ে বিকেলের খেলায় মানা, দেবু, শীলাদের সঙ্গে মিলবার জন্যে আমার দেহ একেবারে টানটান চাঙ্গা।

বাবার আর এক আড্ডার ঠেক ছিল, হাজরার বিনয় দত্তের বাড়ি। তাঁকে আমরা বিনয়দাদু বলতাম। মায়ের প্রভাবে। মাকে তিনি খুব ভালবাসতেন। আমার চোখে সে আড্ডার ছবি নেই। বাবার বিয়ের আগে, এবং বিয়ের পর যে আট বছর আমি জন্মাইনি এটা সে সময়ের আড্ডা। বাবার মৃত্যুর পর একটি স্মরণিকায় বিনয়জেঠু সে সব কথা লিখেছিলেন। আমি হাজরায় তাঁর সেই ঘরে গেলাম, আমার তেরো বছর বয়সে। একটা মস্ত খাটে আধশোয়া হয়ে একজন ফর্সা ত্বক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ।

অবিবাহিত। আর চারদিকে বই আর বই। কী ঝকঝকে। কী গুছিয়ে রাখা। এখানেই বাবার বন্ধু হয়েছিলেন, কমলকুমার মজুমদার। গ্রন্থ জগতের অপর্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজ্ঞানের দেবকুমার বসু, ইয়োর হেলথের সুধাংশু প্রকাশ। এই আড্ডা— বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি দেবুকাকুর প্রকাশনায়, বাবার ইলাসট্রেশান ও অপর্ণপ্রসাদকাকুর লেখায় প্রথম অফসেটে ছাপা ছোটদের বই 'ফটকে'। এ বাড়িতেই দেখেছি সাদা শাড়ি পড়া দীর্ঘাঙ্গী দীপ্তিময়ী বিনয়জেঠুর বোনকেও। আমাদের দু'বোনকে দেখে চোখের জল মুছে মায়ের পাশে এসে বসতে। এঁরই নাম কল্যাণী দত্ত। কী কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি! কাদের ডেকেছি কাকা পিসি জেঠু বলে— এখন ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়।

আর বাবার আড্ডায় ছিলেন অহিভূষণ মালিক। কখনও সমরেশ বসু। মাঝে মাঝে যেতেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বাড়িতে। ভাস্করের কুস্তীগিরের চেহারা আর বাঁশি বাজানোর গল্পও আমাদের তাক লাগিয়ে দিত। তাঁর টুকটুকে 'বউ দিদা'ও আমাদের নাড়ু খাওয়াতেন। আসতেন প্রদোষ দাশগুপ্তের কাছে। অনেক অনুরোধে এবং মা বোঝানো সত্ত্বেও যোগ দেননি ক্যালকাটা গ্রুপে।' কেন দেননি ভাবতে বসি মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে বাবার আর এক কলকাতার আড্ডা— মোহিত মৈত্র, মোহিতজেঠুর বাগবাজারের বাড়িতে। এই মোহিতজেঠুর বাড়িও আমি বাবার সঙ্গে হাজির হতাম। একজন সিপিআই তাত্ত্বিক নেতার সঙ্গে কী এত আড্ডা জমত কে জানে। চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়দের সঙ্গে সময় কাটালেও তাঁর আড্ডার ঠেক ছিল 'পবিত্রদা' 'বিনয়দা' আর 'মোহিতদা'র বাড়িতেই। হয়তো মানুষগুলির ইন্টেলেকচুয়াল চর্চা ও বিশিষ্ট মূল্যবোধ তাঁকে টানত। টানত সরল অনাড়ম্বর ঋজু জীবনও। বাবার সঙ্গে এক অতিরিক্ত পোঁটলা হিসেবে আমি যে কেন এসব আড্ডায় ঘুরে বেড়াতাম কে জানে! এখন ভাবি, ভাগ্যিস— না হলে আর আড্ডার স্রোতের এই পরম্পরা ধরতে চেষ্টা করতাম কী করে!

বাবার মৃত্যুর পর, পাকাপাকি ভাবে খড়দা ছাড়লাম আমরা, সত্তর সালে। ভাড়া নেওয়া হল শান্তি ঘোষ স্ট্রিটে একটা দেড় কামরার ঘর বারান্দা বাথরুম। লাকি ড্র হিসেবে পেলাম পাঁচিলের ওপাশে মণীন্দ্র কলেজের করিডর আর একতলার বয়েজ ক্যান্টিন। তো, সেই টেবিল বাজিয়ে আড্ডার কথাও একটু গুছিয়ে লিখি। সকালে তো স্কুলে চলে যেতাম। কিন্তু সন্ধের আড্ডাটা মিস হত না। খড়দার বুড়িয়ার মাঠ, গঙ্গার পাড়, বাবার স্টুডিয়ো আর দুটো পুকুর জাগানো সবুজ মামার বাড়ির চত্বর থেকে সরে এসে বুকের মধ্যে হু হু থামত না। তখন, বিকেল মানেই চুপ করে বসে গল্পের বই পড়া আর মাস্টারমশাই মৃগেনবাবুর আসার অপেক্ষা। সেই বিরক্তিকর সময়টা ভরে উঠত সান্ধ্য কলেজের ছাত্রদের কলরবে। ছটা বাজতে না বাজতেই

ক্যান্টিন ভরে যেত ছেলেদের চিৎকারে। আমাদের রান্নাঘরের জাল আঁটা জানলা থেকে ক্যান্টিনের যেটুকু দৃশ্যমান হত তাতে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা হিলহিলে পা দেখা যেত, চোঙা প্যান্ট আর চটি দেখা যেত। দেখা যেত, টেবিলে তাদের অস্থির আঙুল। অ্যাশট্রে, সিগারেটের প্যাকেট এবং চায়ের কাপ। গলা ছেড়ে টেবিল বাজিয়ে গান গাইত, খবরের কাগজে পোস্টার লিখত। সত্তরের সেই উত্তাল দশকে স্কুল কলেজে ক্লাস খুবই অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। যখন তখন প্লেন ড্রেসে পুলিশ ঢুকে তল্লাসি চালিয়ে ধরপাকড় করত। ১৪৪ ধারা জারি করে চলত আর্মির সদম্ভ হাঁটাহাঁটি। পথচারীদের 'হ্যান্ডস আপ' অবস্থায় রাস্তা পেরোনো। তবু এই হ্যাংলা প্যাংলা ছেলেগুলো গাইত—

কমরেড লেনিনের আহ্বান
চলে মুক্তি সেনা দল...

তাদের আলোচনায় থাকত 'জিন্দাবাদ', 'যুগ যুগ জিও'। আওয়াজ বন্ধ হলে বুঝতাম আটটা বাজে। ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে ওই ঘরটা অন্ধকারে ডুব দেবে। এবার মন বসিয়ে পড়তেই হবে।

চাকরি জীবনে প্রথম নিয়োগ হল মণীন্দ্র কলেজেই, আংশিক শিক্ষক হিসেবে। পাঁচিলের এ পাশ থেকে দেখলাম আমাদের সেই ছেড়ে আসা কুটির, বারান্দা। প্রথমেই ক্যান্টিনটা দেখতে পেলাম। বিপ্লবের পোস্টার নেই। ছাত্র রাজনীতিতে ভোট যুদ্ধ আছে। ডিম টোস্ট চা আছে। সিগারেটের ধোঁওয়া আছে। কিন্তু নেই টেবিল বাজিয়ে গান। অথচ ও সময়েই এখানকার ছাত্র নচিকেতা। সে তার পাইকপাড়ার বাসস্থানে আড্ডা মারলেও, কলেজ ক্যান্টিনে গান গেয়ে আড্ডা জমায় না। তার তখন নিজের পায়ে গানের জোরে দাঁড়াবার সংগ্রাম।

তবে আড্ডা একটা বসত মণীন্দ্র কলেজের স্টাফরুমে। বিরাট স্টাফরুমের মাঝখানে মস্ত ছড়ানো টেবিল। দু'পাশে অধ্যাপকদের মুখোমুখি চেয়ার। এক কোণে ক্ষীরোদদার তত্ত্বাবধানে রেজিস্টারের র‍্যাক। আর দু'কোণে দুটো জানলার দিকে বিশেষ আয়োজনে পাতা টেবিল— ক্যারাম, তাস ও দাবা খেলবার জন্যে। কী সব রেওয়াজি মাস্টারমশাই। ধুতি পাঞ্জাবি মোটা চশমার ফ্রেম, বাজখাঁই গলা, আর বুদ্ধির ঝিলিক। ছাত্র রাজনীতির সংগঠিত কায়েমি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দাবার দান দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে প্রিয় ছাত্রটি এসে অনুরোধ করলে অবসরে ক্লাস নিচ্ছেন। পাশে ধোঁওয়া ওঠা লিকার চা, আঙুলের টিপে নস্যি এবং ওই আঙুলেরই ফাঁকে সিগারেট। এক সঙ্গে তিনটি নেশার আয়োজনে বুদ্ধি পাকছে। কথায় কথায় দলীয় রাজনীতির জিগির, অধ্যাপক সমিতির দল বিভাজন, তর্ক, মুখ ভ্যাঙানি এবং আড্ডার মুন্সিয়ানা।

এ আড্ডা নির্মল ছিল এমন নয়। বিদ্বেষ-বিষোদ্গারে ভরে উঠত পরিবেশ। অনেকটা সঠীক নকশার মতো।

এই আড্ডারই একটা প্রসারিত চেহারা বড় ক্যানভাসে দেখলাম, বিধানসভার অধিবেশনে গিয়ে। কলকাতার বোধহয় সবচেয়ে বড় আড্ডা বিধানসভার এই অধিবেশন ঘর। মা, তাঁর গান্ধীবাদী জেলখাটা সত্যকাকার উৎসাহে আমাদের অ্যাসেম্বলি হাউস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, জীবনের এক অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হিসেবে। দেখলাম, একদল মানুষ শোরগোল করে টেবিল চাপড়াচ্ছে। মাইকে ঝগড়া করছে, টমেটো ছুড়ছে, মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। আর একজন মন্ত্রী নামক মানুষ একটি তালিকা হাতে নিয়ে কিছু একটা বলবার অনুমতি চাইছে— চেয়েই চলেছে। সেই ষাট সালে যা, এখনও তাই। প্রতি বছর ছাত্রীদের নিয়ে যখন অ্যাসেম্বলি যাই দেখি সেই একই সপ্রাণ বেপরোয়া ছবি। এবং দর্শকাসনে বাইরের লোক আছে জেনেও। এই আড্ডা এবং তারই মধ্যে মানুষের ভালমন্দ হিসেব করে জরুরি নীতি নির্ধারণ— এ আমি আর দুটি দেখিনি।

আমার খুব পছন্দের আড্ডার জায়গা দক্ষিণাপণের ডলি'স টি শপ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়। চায়ের পেটির টুকরো দিয়ে সাজানো দেওয়াল। নানা রকম বসবার ব্যবস্থা। আর নানা রকম চায়ের আয়োজন। সঙ্গে স্যান্ডুইচ চিপস। আহা। এই সফিসটিকেটেড এথনিক আড্ডায় প্রথম নিয়ে যায় মল্লিকা। মল্লিকা সেনগুপ্ত। প্রায় জোর করে। হিড় হিড় করে টেনে। তার এথনিক সাজপোশাকের সঙ্গে এ দোকানটা বেশ যায়। সেই স্মৃতি আমি সুখে পুষে রাখি। মাঝে মাঝেই আমরা ভাবি চলো, ডলি'স এ যাই। কিন্তু সে আর হয় না। আমি এখন যাই আড্ডা দেখতে। একটু দক্ষিণী অর্থবান এথনিক আঁতেলরা এখানে সময় কাটাতে আসে। আমিও কেনাকাটা ভুলে বসে থাকি ফ্লেবারড চা নিয়ে আর ভাবি পাশের চেয়ারটায় এ বা ও নিশ্চয়ই আছে। ডলির এই আয়োজন কলকাতার আড্ডায় এক দারুণ গার্নিশিং। আরও ভাল লাগে কারণ তা এক অতি সুদক্ষ চা বিলাসী মহিলার উদ্যোগে বলে।

ডলির কথায় বলতে ইচ্ছে করছে আড্ডাপ্রিয় কিছু মানুষদের কথা। যেমন সতীদি-অশোকদা। এই পালিত দম্পতির ছেলে মেয়ে— বুল্লদা টুনাই আমারই বয়সি। কিন্তু তাদের ছেড়ে আড্ডা জমে তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে। অশোকদা তাঁর কবিতা বলা গলাটাকে যথেচ্ছ প্যাম্পার করেও দম ছুটিয়ে গলা ফাটিয়ে হেসে বুঝিয়ে দেন আড্ডা জমে গেছে। সতীদির রসিকতা টীকা টিপ্পনি, অসামান্য চা আর ঝুলি ঝেড়ে যা আছে তাই দিয়েই বানানো ভাজাভুজি আমাদের আড্ডাবাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রায় পঁচিশ বছর বয়সের ব্যবধান কোথায় ফুৎকারে উড়ে যায়। রেষারেষি, সমালোচনা,

বিরক্তি, চাপা অসন্তোষ ঠেস দেওয়া কথা সবই জোয়ারের মুখে আসা পোড়া কাঠ, ছেঁড়া মালার মতো ভেসে গিয়ে টলমল করে স্বচ্ছ ঢেউ। আর কলকল তোড়ে শোনা যায় আমাদের উচ্ছ্বাস। ঘন্টা চার-পাঁচ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া তো কোনও ব্যাপারই নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা— সেখান থেকে দোরগোড়া— সিঁড়ি— সদর এবং গলির মোড় অবধি হাতনাড়া— কী দুঃখ! কেন এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল সব। এখন তো দেখা প্রায় হয়ই না। তবু সেই সরব উপস্থিতি নিয়ে সতীদি অশোকদা— আলুর ঝালুর আড্ডা আর আশ কথা পাশ কথা।

আর এক আড্ডা জমত সন্দীপনকাকুর বরানগরের বাড়িতে। আমরা দুই বোন গুটি গুটি রবিবারের সকালে তাঁর বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হতাম। রীনা কাকিমা দারুণ মাংস রেঁধে খাওয়াতেন। সে সব মুহূর্তের স্বাদ। আসল আকর্ষণ সন্দীপনকাকুর সঙ্গে গপ্পো-আড্ডা। কাকিমা মুন্নি দুপুরের বিশ্রাম সেরে বিকেলে চা করতে উঠে আমাদের বকা দিত— ছাদে যা—- ফুচকা খেয়ে আয়, না সারা দুপুর জুড়ে বকবক আর বকবক! সন্ধেবেলা সন্দীপনকাকু আমাদের পৌঁছে দিতে আসতেন পাইকপাড়ার বাড়িতে। এসেই জমে যেতেন মায়ের সঙ্গে আড্ডায়। কোথাও একটা বাবার সঙ্গে অবিশ্রাম আড্ডার স্মৃতি তাঁকে জুড়ে দিত আমাদের বাড়ির মানুষগুলির সঙ্গে। এই আড্ডা থেকেই জীবনানন্দ, বোদলেয়ার, তুষার রায়, যোগব্রত, শক্তি, সুনীল, শরৎ, উৎপল। মার্কেজ-নেরুদা-কামু। ছবির জগৎ থেকে সাহিত্যের জগতে একটু একটু করে সরে আসা। গাছে টাঙানো দেওয়াল পত্রিকার প্রকাশ। সন্দীপনের না-মদ্যপানের এই যে আড্ডা এর একমাত্র সাক্ষী বোধহয় আমরাই। মনে পড়ে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র হঠাৎ মারা যেতে সন্দীপনকাকু এসে আমাদের বাড়ি বসে রইলেন। আনাড়ি হাতে আমাদের রান্না খিচুড়ি আর ডিমভাজা খেয়ে কত গল্প বললেন— নরেন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের নিয়ে। প্রিয়জনের মৃত্যুও আমরা অতিক্রম করতে পেরেছিলাম আড্ডায়।

মায়ের আড্ডার ধরনটা ছিল একেবারে অন্য রকম। ঘরোয়া অথচ পোশাকি। ঘরোয়া এই কারণে, তাঁর বাড়িতে বসবার ঘরটি ছিল অবারিত দ্বার। আর পোশাকি কারণ, আলোচনার বিষয়, তাঁর ইস্কুলে মেয়েদের ভর্তি করা বা, ভাল রেজাল্ট করবার উপদেশ বা পাশ ফেল ট্রান্সফার নেওয়া ইত্যাদি। বাংলা মিডিয়ম ইস্কুলের হেড মিসট্রেস হলেও মায়ের ধরনধারণ ছিল খুব আকর্ষণীয়। মোটেই দিদিমণি গোছের নয়। সে সময় উত্তর কলকাতায় বয়কাট চুলে গহনাবিহীন সাদা শাড়ি পরা মেমসাহেব কমই ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও হিন্দি ওড়িয়া ভাষায় গান গাইতে পারতেন। রসিকতা বোধ ছিল প্রখর। শিল্প সাহিত্যের গভীর অনুরাগী এমন মানুষকে সবাই পছন্দ করবে।

ফলে, যেমন বাবার সূত্রে বাবার বন্ধুদের পাওয়া তেমনি, মায়ের সূত্রে পেয়েছিলাম বাড়িতে বহু বিশিষ্টজনের আনাগোনা। ক্রমে দেখতাম, ইস্কুলের চৌহদ্দি পেরিয়ে নানা আলাপ আলোচনায় সরব হয়ে উঠছে বসবার ঘর। তবে সত্যি সত্যিই আড্ডার জন্যে আড্ডা দিতে আসত চন্দনদা। চন্দন দাশগুপ্ত। এখন আমেরিকাবাসী। সকলে তাকে ওষুধ বিজ্ঞানী 'Sandy' বলে চেনে। তার ভাল নাম যে পূর্ণেন্দু সেটা তখন জানতামই না, ছিপছিপে চেহারার এক তরুণ আমার মাকে জোর গলায় 'বড়দি' বা মিসেস মুখার্জি না বলে অণিমাদি বলে ডাকত। একমাথা ঘন না-আঁচড়ানো চুল নিয়ে পায়ের ওপর পা রেখে সোফায় হেলে বসে নানা রকম আলোচনা শুরু করত। তার সদ্য লেখা কবিতাও শোনাত৷ 'সুনীল দাসের ঘোড়ার ছবি প্যারীর পথে আমায় ডাকে'— শোনাত (একটু বেসুরো গলায়) 'ইচ্ছে করলে হাঙরের দাঁত দেখতে পাবে'— তিন পয়সার পালার গান ডিং ডিডি ডিং মিউজিক সমেত। আড্ডায় সে একাই একশো। তারই মধ্যে আমাদের মো-ওন দিয়ে পড়া তৈরি করতে হত। স্কুল ইউনিফর্মে মাড় দিয়ে, কেডস্ জুতো সাদা করতে হত। এই আড্ডার রেশটাই মাকে কখনও আটপৌরে গিন্নি হতে দিত না। রবিবার মানে তাই আমার মায়ের আড্ডা। মানুষজনের আসা যাওয়া। কবিতা গল্প গান এবং তা অন্তত বেলা দুটো অবধি। এ বাড়িটা তাই রবিবারের ঝুলঝাড়া, সাবানকাচা, মাংস রান্না থেকে কিছুটা মুক্ত ছিল। এই আড্ডার কারণেই স্কুল থেকে ব্লক বুকিং করে রঙ্গনায় নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা', 'আন্তিগোনে', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'রাজরক্ত', 'চাকভাঙা মধু'। অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ, কেয়া, শেলী পাল। সকালের আসরে মায়া সেন-সুবিনয় রায়। রাধাতে মর্নিং শোয়ে কুরোসাওয়া। হুড়মুড় আলোচনায় সিমন দ্য বভুয়া থেকে এই সেদিনও অরুন্ধতী রায়— এই এত পথ— এত দিক থেকে দেখিয়ে নিয়ে এসে কত অনায়াসে আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আড্ডার মধ্যে দিয়েই।

মায়ের অনাবিল প্রশ্রয়ে আর একটাও আড্ডা বসত। সবার চোখ বাঁচিয়ে স্কুলের ছুটির পর তাঁরই ঘরে। স্কুলের তালাবন্ধ গেট-পাঁচিল টপকে ঢুকত সদ্য গোঁফ বেরোনো কয়েকজন তরুণ। যাদের 'নকশাল' বলে আনাচে কানাচে লুকিয়ে বেড়াতে হত। কীভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন জানি না। কেনই বা রাখতেন। মাঝে মাঝে তারা আবার দুদ্দাড় পালিয়েও যেত। তখন মেন গেট দিয়ে ঢুকতেন শ্যামপুকুর থানার ও.সি.। মা মাথা নিচু করে কাজ করে যেতেন ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে। তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে বসিয়ে রাখতেন সামনে। নিরাপদে পালিয়ে যেত দেওয়ালে দেওয়ালে

নাম দাগা 'কাবুল পুরু বিদ্যুৎ'। কী অসীম সাহসেই না মোকাবিলা করতেন পুলিশ মিলিটারি ও এই আদর্শবাদী ছেলেগুলির অবস্থান।

আবার এই সময়েই স্কুলের সহকর্মী উমাদি-সুধাদির সঙ্গে বেরিয়ে স্কুলের কাছের কোনও শিবমন্দিরে বাতি দিয়ে জল ঢেলে নীলের পুজো দিতেন। সে আড্ডাও দেখার মতো ছিল। ওই সময়ে বাগবাজার স্কুলেও ছিল নানা মানুষের আনাগোনা— আনন্দ উৎসব হইহই— আড্ডারই ছলে কাজ করে যাওয়া। ছাত্রী-শিক্ষিকা-অশিক্ষক কর্মীদের সকলকেই অতি জরুবি মনে করে। আদরে। আপ্যায়নে।

আমার মায়ের এই আড্ডার একেবারে বিপ্রতীপে ছিল ছোটপিসি, মীরা দেবীর 'ঘরোয়া বৈঠক' এবং 'খেয়ালী' পত্রিকার আড্ডা। বিধান সরণির সেই প্রায় প্রাসাদোপম বাড়ির অ্যাটর্নির বউ ছিলেন ছোটপিসি। সংসারের আঁচ বাঁচিয়ে সকলকে স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ায় আগলে রেখে বাদবাকিটুকু দিয়ে জমাতে হত আড্ডা। কর্তাদের কর্মক্ষেত্রের রমরমা আর বড় বড় বাড়ির ছাদের আশ্রয়ে তাঁরা ঝলমলে মাসিমার দল। আমার মায়ের একক নারী জীবন ও চাকরি জীবনের প্রতিষ্ঠার সূত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চেহারার সঙ্গে এঁদের মেলানো যেত না। মায়ের সঙ্গে যাঁরা সাগ্রহে আড্ডা দিতে আসতেন, তাঁর সরকারি আবাসনের টুকরো বসবার ঘরে, তাঁরাই ছোটপিসির ঘরোয়া বৈঠকে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আপ্যায়িত হতেন। ছোটপিসির সেই আড্ডা, নাটক, 'খেয়ালী' পত্রিকা তাঁকে খুবই সমাদর দিয়েছিল। বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর গৃহবধূর সীমাবদ্ধ গণ্ডিটিও।

উত্তর কলকাতার সূত্রে মনে পড়ছে আমার জীবনে আড্ডার নানা পর্ব। 'বসন্ত কেবিন'-এ একটা সময়ে যেতেন, সেখানে মানিকদা ধীমানদার সঙ্গে আড্ডা, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সুবাদে কফি হাউসের আড্ডা, মনে পড়ছে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার আড্ডা। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমেছিল শেষ বছরের উঁচু ক্লাসে। শ্রাবন্তী, জয়শ্রী, চৈতালী, সুস্মিতা, শকুন্তলা, প্রতিমা, লছমী— ফুচকাওয়ালার ঝুড়ির পাশে, বাসে তুলে দেবার অছিলায় রিহার্সালের নামে— কী আড্ডা কী আড্ডা! তবে ক্রনিক রোমান্টিসিজমে ভুগতাম বলে সব অবস্থাতেই মনে হত জীবন কাব্যময়। একটু দুঃখের বিলাস, একটু ব্যারাম বিরাম নিয়েই আমরা। আমাদের দলে কোনও ছেলেবন্ধু ছিল না। কিন্তু ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলা এবং চুটিয়ে আড্ডা দিত আমাদের বন্ধু সুস্মিতা। তাদের সুপারওয়ে এস্টেটের কোঅপারেটিভ ফ্ল্যাটে সকলের অবাধ যাতায়াত। এখন সে 'কয়লা বিদেশের' বড় কর্ত্রী— তা, তার অফিসে গেলে মনেই হয় না। সেই আড্ডার চালেই গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলে চলেছে সবলে।

আমারই দু-বছরের ছোট বোন রঞ্জাদের দলের আড্ডা ছিল ডাকাবুকো গোছের। কৃষ্ণা (রাখাল দাস), মধুমিতা, কল্যাণী, পূরবী আর স্কাউট গাইডের ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পের সূত্রে পাওয়া আব্রাহাম, বিশু, বর্ধন— কি হল্লা কি আড্ডা।

তাদের সেই প্রাণবন্ত আড্ডার চেহারাটা আবার দেখলাম আমার মেয়ে মধুজার বড় হয়ে ওঠার মুখে। স্কুলের বন্ধু, কোচিং-এর বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু, এর বন্ধু ওর বন্ধু— পোর্টিকো ক্যাফে, বইমেলা, প্রিমিয়ার, কোথায় না তারা। এখন তাদের বর বউরাও এই দলে ভিড়েছে। প্রেমে পড়া এদের কাছে এক মস্ত ন্যাকামি। উড়নচণ্ডী আড্ডার মেজাজটাই তাদের আসল প্রাণ। এদের কোনও নস্টালজিয়া নেই, 'মুক্তির দশকের' হাহাকার নেই, 'খড়দা' ছেড়ে আসবার কষ্ট নেই। এরাই কলকাতার খাস কণ্ঠ জানা লোক। এদের ভিক্টোরিয়া, এদের সিটি সেন্টার, এদের মিলেনিয়ম পার্ক, এদের ক্রশওয়ার্ড, এদের ফ্লেম অ্যান্ড গ্রিল— সময় বদলকে মুঠোয় ভরে এরা কলকাতাতেই বুক ভরে অর্থ ও প্রতিষ্ঠার শ্বাস নেয়। আড্ডা দেয়। মেতে ওঠে।

মেয়ের প্রসঙ্গে মনে পড়ল জামাই অনিন্দ্য এবং আমার বেয়াই অশোকদার কথা। আড্ডায় যায় নাম 'নাকু'। গোয়াবাগান অঞ্চলের কাছ ঘেঁষে ওই চণ্ডীবাড়িতেই তাঁদের পুরুষানুক্রমে বাস। আর আড্ডায় পরিচিত সকলে। সকলের সঙ্গে তো আড্ডা হয় না। তাই বিশেষ আড্ডায় আসে তাঁর আমৃত্যু বন্ধু শ্রীমন্তবাবুর কথা। প্রতিদিন দেখা করা, আড্ডা দেওয়া, বাড়ি ফেরা। তাঁদের দুই ছেলেও এরকমই বন্ধু তবে প্রতিদিনেব আড্ডা তাদের দরকার হয় না।

জামাই অনিন্দ্য তো জাঁহাবাজ আড্ডাধারী। তার সব গুরুত্বপূর্ণ কাজই সে করে আড্ডার ঢঙে। ওর আড্ডার ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেশ একটা সময় বদলের চিহ্নও পাওয়া যায়। স্কুলের বন্ধু কৌস্তুভ, অনুব্রত, বিপ্লব, সৌম্য, স্কাউটের বন্ধু রাজেন, বীরেন, বাবুয়া, রাজশেখর, লালু— এই ক্রমে কোনও মেয়ে বন্ধু নেই। এই বন্ধুদের আড্ডাটা এখনও বেশ জাঁকিয়ে জীবন জুড়েই আছে। প্রথমে মাধ্যমিকে কোচিং ও পরে কলেজের আড্ডা থেকে মেয়েদের নাম আসছে। মুনমুন, মধুশ্রী, অনিন্দিতা তো তাকে আড্ডা দিতে দিতে আইবুড়ো ভাত খাওয়াল, বিয়ের তত্ত্ব সাজাল, বরপক্ষের হয়ে কন্যাপক্ষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করাল। চমৎকার লেগেছে আড্ডার এই স্বাদ বদল। অনিন্দ্য তো এখন জমিয়ে আড্ডা মারে, তার বউয়ের বন্ধু তিস্তা, দোলন, সুমিত, শ্রমণ, ছোকু, বিষ্ণুদেরও সঙ্গে। আড্ডা মারে ব্যান্ডের বন্ধু গার্গী-উপল, সঞ্চারী-চন্দ্রিলের সঙ্গে। আবার প্রতিদিনের দপ্তরে তার আড্ডার সঙ্গী, বিপুলদা, জয়, ভাস্কর, বর্ণিনী, রিঙ্কা, শম্পালী। আড্ডার এই বিপুল বিজয় চালিয়ে

যেতে পারে কারণ আমাদের ২৪ ঘণ্টার কাজ সে বারো ঘণ্টায় সেরে ফেলে। আড্ডা এবং কাজকে এ রকম মেলাতে— আর কজনই বা পারে।

অনিন্দ্যর কথাতেই মনে এল টিভির কথা। এখন আড্ডা বদলের এক বড় ছবি বোকা বাক্সের পর্দার সেলিব্রিটিদের সঙ্গে আড্ডা। নিস্তরঙ্গ করে সুইচ অন করে বসে বসে আড্ডা দেখা এবং শোনা। আর আছে আনুষ্ঠানিক আড্ডা। রিইউনিয়নের আড্ডা। ক্লাবের আড্ডা। নাইট পার্টির স্পনসরড আড্ডা— এগুলোও কলকাতার আড্ডাই। নন্দন চত্বরে জমায়েত, ২৫শে বৈশাখের সকালের আড্ডা— তাও বা বাদ যায় কী করে।

এখন বিশিষ্ট সব আড্ডায় যেতেই হয়। গেলে সামাজিক সাক্ষী হিসেবে মান বাড়ে। 'আড্ডাবাজি' কোরো না— এমন শাসন বোধহয় অচল হয়ে গেল। সৌরীনদার (ভট্টাচার্যের) মতো মানুষ আর ক'জন যে রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান খুঁজে, দল জুটিয়ে বিশ্ব বাজারের মন্দা নিয়ে আলোচনায় বসবেন বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যাবেন কোনও দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা অবলীলায়— চায়ের সঙ্গীদের সঙ্গে। ফলে আড্ডা মানেই সেই নিখরচায় আয়েশ ও আনন্দ এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা— স্থান-কাল-পাত্র ভুলে।

তবে আড্ডায় থাকবেই, স্তাবকতা— মান ও মাপ বুঝে। থাকবে তা নিয়ে সমাজতত্ত্বের লেখালেখি, সময়ের দলিল যাপনের আনাচকানাচ জানার আকাঙ্ক্ষা, থাকবে কিছু নেই আঁকড়া আড্ডা বিলাসীদের সক্রিয় প্ররোচনা। প্রোমোটার দেবুদাকে টালিগঞ্জের আড্ডায় দেখা যাবেই। সি. আই. টি মার্কেটের বেঞ্চে বসে থাকতে প্রতি সকালে পাকা চুলের দত্তদাকেও। আমাকে ও অনিরুদ্ধকে চায়ের দোকানে বসে নতুন কাজের পরিকল্পনা ভাঁজতে, শর্মিলাকেও দেখা যাবে লাফিয়ে এসে তাতে যোগ দিতে।

নতুন স্বপ্নের ইচ্ছে যত দিন কলকাতাকে আঁকড়ে থাকবে তত দিন সময় বদলালেও আড্ডা যাপন বদলাবে না। এই unplanned জলজমা, ডেঙ্গু ভোগা শহরটার এখনও কয়েকশো রক, কয়েক হাজার চায়ের দোকান তো আছেই— আড্ডার হালচাল বজায় রাখবে তারাই। জয় আড্ডার জয়। জয় কলকাতার আলস্যের জয়। জিৎ এবং জিতেই যাওয়া। আড্ডা— 'Beyond Reach' কখনওই হবে না।

খেলার মাঠের আড্ডা

জয়ন্ত চক্রবর্তী

খেলার মাঠের আড্ডা সংক্রান্ত এই লেখাটি শুরু করা যাক মাঠের বাইরের এক খেলার আড্ডার কথা দিয়ে। ঘটনাস্থল বসুশ্রী সিনেমা সংলগ্ন কফি হাউস। বসুশ্রীর অংশীদার মন্টু বসুর তখন দারুণ রমরমা ময়দানে ফুটবল কর্তা হিসেবে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তাই বসুশ্রীর দোতলায় কফি হাউসে প্রতিদিন বসে জমজমাট খেলার আড্ডা। খেলোয়াড়, কর্মকর্তা কিংবা রেফারি— এই আড্ডায় সবার প্রবেশাধিকার। কাপের পর কাপ চা কিংবা কফি ধ্বংস হয় আর চলে রাজা-উজির মারা। বলাই বাহুল্য যে, রাজা-উজিররা সবাই ময়দানের লোক। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের হাল হকিকৎ, কেচ্ছাকিস্‌সা, খেলোয়াড়দের ফর্ম নিয়ে গরমাগরম তর্কের ভিয়েন আড্ডাকে আরও রংদার করে তোলে। মহামেডান স্পোর্টিংই বা বাদ থাকে কেন? মহামেডান হায়দরাবাদ না মহীশূর (তখনও কর্ণাটক নাম হয়নি) কোন জায়গা থেকে প্লেয়ার তুলছে, তাই নিয়েও মাতোয়ারা হয়ে যেত বসুশ্রী কফি হাউস। এই কফি হাউসেই অসংখ্য 'ডিল' ফাইনাল হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। এসেছেন অসংখ্য ফুটবলার। আমেদ খান ছিলেন এক সময় এই কফি হাউসের আড্ডার মধ্যমণি। সকাল থেকে কোণের দিকে একটি টেবিল আলো করে বসতেন আমেদ খান। তাঁকে ঘিরে থাকত ফ্যানেদের ঝাঁক। বর্ষীয়ান এক সাংবাদিকের মুখে শুনেছি যে সুদর্শন আমেদ খানের জনপ্রিয়তা সেই আমলেও তরুণীদের মধ্যে এমন ছিল যে অনেকেই বসুশ্রী কফি হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন আমেদ খানকে এক ঝলক দেখার জন্য। রবিবার সকালে বসুশ্রীর খেলার আড্ডা দারুণ জমে যেত। আসতেন চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত খেলা-অনুরাগী কিছু মানুষজন। আড্ডা ভাঙতে ভাঙতে বেলা দুটো বেজে যাচ্ছে— এমন ঘটনাও বিরল ছিল না। মন্টু বসু ইস্টবেঙ্গল এবং খেলার মাঠ থেকে যখন দূরে সরতে আরম্ভ করলেন— তখন থেকেই বসুশ্রীর আড্ডায়

একটা ছেদ পড়ে। আজ আর কফি হাউসে সেই খেলার আড্ডা বসে না। তবে, যদি কখনও কলকাতার ফুটবলের ইতিহাস লেখা হয় তাহলে নিশ্চয়ই বসুশ্রীর এই আড্ডা সেই ইতিহাসে স্থান পাবেই।

কলকাতার ময়দানকে একদা ইংরেজরা এই শহরের ফুসফুস বলে বর্ণনা করেছিল। একদিকে প্রায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে শুরু করে শহিদ মিনার ছুঁয়ে একটি বাঁক নিয়ে ইডেন গার্ডেন স্পর্শ করে ফোর্ট উইলিয়ামের পরিধি আর প্রাচীর পর্যন্ত ময়দানের বিস্তৃতি। এই ময়দানের সীমানাতেই তিনটি সেরা মাঠ— মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান। আছে অসংখ্য খেলার মাঠ। আছে ইডেনের ক্লাব হাউস। ফুটবলের স্নায়ু টান টান উত্তেজনা, ক্রিকেটের রোমাঞ্চকর সংগ্রাম, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, কাবাডি ইত্যাদি নানা খেলা নিয়ে ময়দানের সংসার। আর আছে খেলার মাঠের চিরাচরিত আড্ডা। খেলাকে কেন্দ্র করে বহতা জীবনের প্রাণের স্পন্দন।

ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারিতে এই রকম একটি আড্ডার সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে আড্ডাধারীদের মেম্বারশিপ কার্ড নম্বর এক, দুই, তিন, চার কিংবা ছয়। বয়স এঁদের শরীরে অমোঘ কামড় বসিয়েছে। চুলে ধরেছে পাক। দেহ অনেকের অশক্ত। তবু বিকেল হলে কী এক অদৃশ্য টানে এঁরা হাজির ক্লাবের গ্যালারিতে। ক্লাবের একদা প্রেসিডেন্ট ভূপেন ঘোষ ছিলেন এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য। ভূপেনবাবু একবার বলেছিলেন— "ছেলেদের কাছে লন্ডন কিংবা জার্মানিতে যখন যাই তখনও বিকেল হলে মন কেমন করে গ্যালারির এই আড্ডার জন্য।" এই "মন কেমন" করা ব্যাপারটাই বোধ হয় মোহনবাগান প্রেসিডেন্ট প্রায় শতকের ঘরে ছুঁই ছুঁই উমাপতি কুমারকে বিকেলে টেনে আনত ক্লাবের আড্ডায়। তাঁবুর বারান্দায় বিছানো সবুজ বেঞ্চের কোণের জায়গাটি উমাপতিবাবুর জন্য নির্দিষ্ট। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির মতো পঞ্চমুণ্ডির আসন নয়— মোহনবাগানের এই আড্ডায় অতীত যেন বড় বেশি মুখর। নিঃশব্দে অতীতের স্মৃতিচারণা করেন নানান মানুষজন।

ক্লাব তাঁবুর বেঞ্চের অন্য কোণে বসে আর একটি বিরাট আড্ডা। বুয়া মিত্র, সজল বসু, কেশব ডালমিয়া, সত্যেশ মুখার্জি, সুশোভন বসুদের এই আড্ডায় ফুটবল নিয়েই আসর গরম থাকে। কচিৎ-কদাচিৎ চলে আসেন আলোচনায় গাভাসকার-ইমরানরা। এখন ক্লাব ইলেকশানে মেম্বার্স ফোরামের হয়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের আড্ডাটি দীর্ঘদিন চলছে কংক্রিটের গ্যালারির ওপর দিকে। দুই আড্ডাতেই নিয়মিত বিকোয় দিলীপ ধরের ঘুগনি। দু-ডেকচি ঘুগনি আর আলুর দম নিয়ে বিকেল চারটে না বাজতে বাজতে দিলীপবাবু বসে যান গ্যালারির তলায়। সন্ধ্যা ছ'টায় তলানিও পড়ে থাকে না। মোহনবাগানের আড্ডায় ঘুগনির ভূমিকা

নিয়ে রচনাও লিখতে পারেন উৎসাহী গবেষকরা। ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর ভিতরে প্রায় বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসার মতো উচ্চ পর্যায়ের একটি আড্ডা বসে প্রতিদিন সন্ধ্যায়। দীপক দাস, প্রশান্ত ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রকাশ গড়গড়িরা যেমন থাকেন, তেমনই থাকেন কখনও কখনও অচিন্ত্য সরকার কিংবা দেবপ্রসাদ বসুর মতো ক্লাব-পরিচালকরাও। আড্ডাকে আড্ডা আবার স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিংও চলে এখানে।

মহামেডানের আড্ডাটি নিয়মিত নয়। তবে, এক ঝাঁক ক্লাব-সমর্থক গরম পিঁয়াজি এবং চা সংযোগে আড্ডা দেন ক্লাব চত্বরের বাইরে কংক্রিট আর সিমেন্টের প্রাচীরের ওপর বসে। আড্ডাটি মরশুমি— অর্থাৎ ফুটবল মরশুমেই বেশি বসে। সিএবি ক্লাব হাউসে মাঝে মাঝে আড্ডা জমে জগমোহন ডালমিয়ার ঘরে। চা এবং সিঙ্গারা এই আড্ডার অনুপান।

তবে, এই আড্ডাগুলির কোনওটাই ধ্রুপদী আড্ডা নয়, যেমন ছিল বসুশ্রী কফি হাউসের আড্ডা। বরং সেই তুলনায় ইডেনের কোণে বটতলার আড্ডা অনেক বেশি ধ্রুপদী। বড় খেলার সময় টিকিটের ব্ল্যাক এবং আড্ডা সমানতালে চলে এখানে। এখানে বসেই "ঘোড়ার মুখের খবর" পাওয়া যায় খেলোয়াড়দের সম্পর্কে— যার বেশির ভাগটাই, বলাই বাহুল্য যে মেলে না। আর একটি বটতলার আড্ডা আছে স্ট্র্যান্ড রোড স্টেট ব্যাঙ্ক সংলগ্ন অঞ্চলে। এই বটতলার আড্ডায় দেখা যায় ছোট, বড়, মেজো, সেজো ফুটবলারদের। একটা সময়ে দুপুর দুটোর পর সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ভাস্কর গাঙ্গুলি, সুব্রত ভট্টাচার্যের ঠিকানাই হয়ে গিয়েছিল এই বটতলা। এখন অনেক মুখ বদলে গেছে। আড্ডাটি অবশ্য আছে। ঠিক এই রকমই একটি আড্ডা তৈরি হয়েছিল সত্তরের দশকে লিন্ডসে স্ট্রিটে ঝুলন সেনগুপ্তের দোকানে।

ঝুলন নামটি শুনে কোনও আধুনিকা মহিলার কথা ভেবে নেবার কারণ নেই। এই ঝুলনের চমৎকার একটি বাটারফ্লাই গোঁফ ছিল। এই আড্ডায় মধ্যমণি ছিলেন গৌতম সরকার। আর নিয়মিত আসতেন প্রসুন ব্যানার্জি। এছাড়াও কলকাতা শহর যেমন বিরাট তার সঙ্গে খেলার আড্ডার বহরের শেষ নেই। কলকাতার বিভিন্ন বড় মাঠের পাশাপাশি ছোট পাড়ার মধ্যেও বসে নানান ধরনের আড্ডা।

রায়বাড়ির আড্ডা

স্বাগত দাশগুপ্ত

অন্য প্রদেশের লোকেরা এবং কিছু উন্নাসিক বাঙালি আমাদের বাঙালিদের একান্ত আপন আড্ডা সম্পর্কে যতই ব্যঙ্গ বা বক্রোক্তি করুন, কলকাতার অনেক বিখ্যাত ও বিদগ্ধ বাঙালি কিন্তু এঁদের পাত্তা না দিয়েই আড্ডা দিয়েছেন জমিয়ে বহু দিন ধরে। রীতিমতো উপভোগ করেছেন সেই আড্ডা। শত ব্যস্ততার মাঝে এই আড্ডা ছিল তাঁদের জীবনে খোলা বাতাস, যাকে বলা যায় আনওয়াইন্ডিং। কফি হাউস, বিভিন্ন কাফে, রেস্তোরাঁ, অফিস ক্যান্টিন, পাড়াব রক বা ক্লাব-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে আড্ডা জমত কলকাতার অনেক বনেদি বাড়ি বা বিখ্যাত ব্যক্তির বাড়ির বৈঠকখানায়। ওই রকমই একটি জমাটি আড্ডা ছিল লেক অ্যাভিনিউ, ৩ নম্বর লেক টেম্পল রোড এবং ১/১, বিশপ লেফ্রয় রোডে তিন তলার পূর্ব দিকের ফ্ল্যাটে। এই আড্ডাকে অবশ্য বলা যায় শতাব্দী প্রাচীন এবং তিন প্রজন্ম জুড়ে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গড়পারের বাড়িতে সুকুমার রায় ও তাঁর বন্ধুদের "মণ্ডা" ক্লাব তো আজ কিংবদন্তি। নিছক মজা বা ননসেন্স রাইম নয়, এই আড্ডায় অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়েও আলোচনা চলত। আর সেই মণ্ডা ক্লাবের সভ্যরাই তো এক-একজন মহীরুহ ব্যক্তিত্ব। সুকুমার রায়ের অকালমৃত্যুতে এই আড্ডায় ছেদ পড়ে।

চারের দশকের শেষার্ধে এবং পাঁচের দশকের গোড়ায় সুকুমার পুত্র সত্যজিৎ যখন বিজ্ঞাপন জগতে কর্মরত তখন সত্যজিৎ নিয়মিত ঢুঁ মারতেন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর কফি হাউসে। আড্ডাধারীরা ছিলেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত সহ তাঁর অনেক সহকর্মী, বিজ্ঞাপন ও সংবাদ মাধ্যমের অনেক ব্যক্তি। কফি হাউসের সেই আড্ডা শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত, ছবি, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকত তা নয়। বস্তুত এই কফি হাউসের আড্ডা থেকেই শুরু হয় চলচ্চিত্র নিয়ে নানান ভাবনা চিন্তা, সমমনস্কদের একত্র হওয়া ও

অবশেষে জন্ম নেয় কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ফিল্ম ক্লাব বা ফিল্ম সোসাইটির যার নাম 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। এর কিছু বছর পর সত্যজিৎ রায়ের ছোঁয়ায়, তাঁর হাত ধরে বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুরের 'অপু' যখন পৌঁছে গেল বিশ্বের দরবারে, তার পরই তো বিভিন্ন দেশে সমাদৃত ও বন্দিত হলেন সত্যজিৎ। বিজ্ঞাপন জগৎকে বিদায় জানিয়ে চলে এলেন পাকাপাকি ভাবে চলচ্চিত্র জগতে। এর পর থেকেই শুরু রবিবারের আড্ডা তাঁর বৈঠকখানায়। প্রথমে লেক অ্যাভিনিউতে পরে ৩ নম্বর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে জমেছে এই আড্ডা। ১৯৭০ সালে তিনি যখন চলে এলেন ১/১, বিশপ লেফ্রয় রোডে, সেই আড্ডাও স্থানান্তরিত হল। এ কথা সবাই জানেন যে গৃহস্বামী স্বয়ং দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানাতেন অতিথিদের। আজও অবশ্য সেই ধারা অব্যাহত। আজও অনেক গভীর রাত অবধি উন্মুক্ত থাকে সেই ফ্ল্যাটের দরজা এবং প্রবেশ করে প্রথম ডান দিকের ঘরে তাকালেই দেখা যাবে নিজের টেবিলে নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন অথবা অতিথিদের সঙ্গে গল্প করছেন সত্যজিৎ পুত্র বর্তমান গৃহকর্তা সন্দীপ রায়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে সন্দীপের বৈঠকখানায় আড্ডা জমার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা সময় নেই বললেই চলে।

রবিবার সকালে রায়বাড়ির আড্ডায় উপস্থিত হতেন বিভিন্ন পেশার মানুষজন। তাঁর প্রাক্তন কর্মস্থল ডি জে কিমারের বেশ কিছু সহকর্মী আসতেন যাঁর মধ্যে নিয়মিত ছিলেন শ্রীঅমল ঘোষ এবং শ্রীআই বি দাশগুপ্ত। অমল ঘোষ আজও আসেন এ বাড়িতে। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার, অমল সোম, কালীকিঙ্কর রাহা সহ অনেকেই হাজির হতেন রবিবারের এই সকালের আড্ডায়। তাঁর ইউনিট সদস্যদের মধ্যে সহকারী পুনু সেন, রমেন চট্টোপাধ্যায় (যিনি পুরসভার উচ্চপদস্থ আধিকারিকও ছিলেন), শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও পরবর্তী কালে অশোক বসু, চিত্রগ্রাহক সৌম্যেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু বসু, সম্পাদক দুলাল দত্ত, ব্যবস্থাপক অনিল চৌধুরী, ভানু ঘোষ, স্থিরচিত্রগ্রাহক নিমাই ঘোষ প্রমুখ হাজির থাকতেন। আজকের বিখ্যাত পরিচালক ও অভিনেতা তিনু আনন্দ যত দিন সত্যজিৎ রায়ের সহকারী ছিলেন, হাজির হতেন এই রবিবাসরে। স্কুলজীবন শেষে পুত্র সন্দীপও সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন এই রবিবার সকালের, প্রতি সপ্তাহে না হলেও মাসে একটি দুটি রবিবারে অবশ্যই আসতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রায় নিয়মিত হাজির থাকতেন গুপী-বাঘা। অভিযান পরবর্তী সময়ে এবং সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরও রবি ঘোষ আজীবন এসেছেন এ বাড়িতে। তপেন চট্টোপাধ্যায়ও নিয়মিত আসতেন সত্যজিতের রবিবাসরে, আসতেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে এ আড্ডার নিয়মিত সদস্য এবং প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কামু মুখোপাধ্যায়। কর্মসূত্রে কলকাতার বাইরে যাওয়ার আগে এবং তার পরে কলকাতায়

এলে চলে আসতেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া। লেক অ্যাভিনিউ ও লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে আসতেন ও. সি. গাঙ্গুলি ও হরিসাধন দাশগুপ্ত, এ ছাড়াও অবধারিত ভাবে উপস্থিত থাকতেন যখন যে ছবির শুটিং চলছে তার শিল্পীরা। বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকেছেন বরুণ চন্দ, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, দীপংকর দে প্রমুখ। সকাল ৯টা সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে আড্ডা চলত একটা-দেড়টা অবধি।

সিনেমা সংক্রান্ত আলোচনা অবশ্যই হত বিশেষ করে সমসাময়িক বিখ্যাত ছবি নিয়ে আলোচনা বিশ্লেষণ হত। কিন্তু শুধু সিনেমা নয়, এ আড্ডায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা, মত বিনিময় চলত। নিজে বিজ্ঞাপন জগতে ছিলেন বলে এবং বিজ্ঞাপন জগতের লোকজন থাকতেন বলে নতুন কোনও বিজ্ঞাপনের ছবি বা খবরের কাগজে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিয়ে বিশ্লেষণ, আলোচনা হত। বিজ্ঞাপন জগতের নতুন খবরাখবরও সাগ্রহে শুনতেন তিনি। তাঁর ছবিতে সেভাবে রাজনীতি প্রকট ভাবে কখনও না এলেও তাঁর আড্ডায় কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনা ব্রাত্য ছিল না। দিব্যি জমত রাজনীতি নিয়ে আড্ডা। চলত টীকা-টিপ্পনী, তর্ক-বিতর্ক এবং সমসাময়িক বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা, কেউ ভাল উপন্যাস পড়ে থাকলে বা সত্যজিৎ নিজেও যে কোন ভাল লেখা পড়লে তার উল্লেখ করতেন। সেই লেখার কী বৈশিষ্ট্য তাও বলতেন। সত্যজিতের গমগমে গলার স্বর বা ব্যক্তিত্ব দেখে কেউ যদি ভাবেন তাঁর বসার ঘরে শুধুমাত্র গুরুগম্ভীর আলোচনা হত তাহলে ভুল করবেন, নিজে লঘু রসিকতা না করলেও কামু মুখোপাধ্যায় বা রবি ঘোষের রসিকতা দিব্যি উপভোগ করতেন। তাঁর রসিক মন্তব্যে থাকত বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্মতা। আড্ডায় মাঝেমধ্যেই গিয়ে বসতেন বিজয়া রায়ও। তবে বিজয়া রায় ব্যস্ত থাকতেন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রায়বাড়ির বিখ্যাত সুস্বাদু সুরভিত দার্জিলিং-এর চা পাঠানোয়, ডালমুট ও বিস্কিট জোগানোয়। উপরন্তু কখনও শিঙারা, কখনও চপ বা অন্যান্য খাদ্যবস্তু পরিবেশিত হত।

সত্যজিৎ রায়ের সর্ব বিষয়ে আগ্রহ ছিল এবং নতুন কিছু জানতে তিনি সদাসর্বদা আগ্রহী ছিলেন। সেই সম্পর্কে যা পেতেন পড়তেন, অন্য কেউ বললে শুনতেন। কোনও বিষয়ে তিনি ভাসাভাসা জানতেন না। যতটুকু জানতেন তাতে কোনও ফাঁক নেই। ফলে তিনি যখন কোনও বিষয়ে বলতেন তাঁর ওই জলদগম্ভীর স্বরে উপস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেন। সেই সঙ্গে অসম্ভব ধৈর্যশীল শ্রোতা ছিলেন। অন্যদের কথাও গুরুত্ব সহকারে মন দিয়ে শুনতেন আগ্রহ ভরে। কিছু কৌতূহল থাকলে বা জিজ্ঞাস্য থাকলে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করতেন। অভিযান ছবির দেশি মদের ঠেকের দৃশ্য চিত্রায়ণের আগে উনি খুঁটিয়ে জেনেছিলেন ঠেকের পরিবেশ, মানুষজন,

দেশি মদের বোতল খোলার ধরন, সঙ্গের চাট, এই সব নানান বিষয়ে। হয়তো দুর্দান্ত হিট করেছে কোনও ছবি, বিতর্ক চলছে নতুন কোনও বই নিয়ে— তিনি উপস্থিত সকলের থেকে জানতে চাইতেন তাঁরা কেউ কী দেখেছেন বা পড়েছেন কি না এবং তাঁদের কী মতামত জানতে চাইতেন।

সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে রবিবারের আড্ডায় মাঝেমাঝেই হাজির হতেন তাঁর বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের সহপাঠীরা। তাঁরা কেউই হয়তো বিখ্যাত বা কেউকেটা নন অথচ একই আড্ডায় রয়েছেন হয়তো কমলকুমার মজুমদার, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনও ফারাক হত না আতিথেয়তায়। এটাই রায়বাড়ির অন্যতম বিশেষত্ব। আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। সন্দীপ রায় ও তাঁর স্ত্রী ললিতা রায়ের উষ্ণ অমায়িক ব্যবহার, আন্তরিকতা, অতিথিদের খুঁটিনাটি খেয়াল রাখার জন্যেই বোধহয় এ বাড়ির অমোঘ আকর্ষণ। সঙ্গে অবশ্যই নানান বিষয়ে জমিয়ে খোলামেলা আড্ডা।

সত্যজিৎ রায়ের ঘরে আড্ডার পাশাপাশি সন্দীপের ঘরে বা বিশপ লেফ্রয় রোডের বসার ঘরে বসত একটা সাবঠেক। পুনু সেন, কামু মুখোপাধ্যায়, ভানু ঘোষ হাজির হতেন সন্দীপের ঘরে সিগারেট খেতে। শুধু তাই নয়, এমন কিছু লঘু হাস্য পরিহাস যা মানিকদার সামনে করা যায় না, সেই 'আনসেন্সরড' আড্ডা জমত সেখানে।

তাঁর নানাবিধ ব্যস্ততা, চিত্রনাট্য লেখা, সঙ্গীতে সুর করা, সন্দেশের সম্পাদনা, নিয়মিত বিভিন্ন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করা— এই সব কিছুর মাঝেও তিনি রবিবার সকালের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন। ওই সময় তিনি কোনও লেখালেখি করতেন না। একান্তই যদি সন্দেশের প্রকাশের সময়সীমার চোখ রাঙানি থাকত তবে সত্যজিৎ রায় কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে ছবি বা স্কেচ আঁকতেন।

সত্যজিৎ রায় নতুন ছবির পরিকল্পনা কালে তাঁর ঘরে কোনও এক সকালে আমন্ত্রণ জানাতেন কলাকুশলী, নির্বাচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। তারপর তাঁদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি স্বকণ্ঠে পড়তেন সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। একদম আড্ডার ঢং-এ চলত এই চিত্রনাট্য পড়া। চিত্রনাট্য পড়া শেষ হলে চলত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, আলোচনা, অভিনেতাদের সঙ্গে চরিত্র এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, হাবভাব, পোশাক নিয়ে হত আলোচনা।

আবার আউটডোরে শুটিং প্যাকআপের পরে জমত আড্ডা। সেসব আড্ডার দারুণ সব গল্প শোনা গিয়েছে অভিনেতাদের স্মৃতিচারণে। সব ছবিতে না থাকলেও কামু মুখোপাধ্যায় যেতেন আউটডোরে এবং বিস্তর মজাদার ঘটনা ঘটাতেন। শুটিং পরবর্তী পর্যায়ে যখন সম্পাদনার কাজ চলত নিউ থিয়েটার্সের ইন্ডিয়া ল্যাবে এবং

পরে লাভলক প্লেসে শান্তি রায়ের ইমেজ ইন্ডিয়ায় তখন সেখানেও জমত আড্ডা। বিশেষ কেউ এ সংবাদ জানেন না। এই আড্ডা ছিল মূলত ইউনিট মেম্বারদের নিয়ে। আজকের মতো বোতাম টিপে ডিজিট্যাল সম্পাদনা তো ছিল না তখন, ঢাউস ঢাউস ফিল্মের রিল গুটিয়ে (ওয়াইন্ডিং) তাতে লিডার যোগ করা, চাঁছা, শট বেছে শুটিং করা, তাকে ঠিক জায়গায় ছাঁটা, পরের শটের সঙ্গে মসৃণ ভাবে জোড়া, নানান কাজ থাকত। এই কাজগুলির বেশির ভাগটাই একান্ত ভাবে সম্পাদক ও সহ সম্পাদকের কাজ এবং সময়সাপেক্ষ। এই সময়টাতেই আড্ডা জমত সত্যজিৎ ও তাঁর সহকারীদের। সদ্য দেখা হয়েছে শুটিং করা দৃশ্যগুলি, সেই সব দৃশ্যাবলি নিয়ে কখনও উচ্ছ্বাস, কখনও আপশোস একেবারে অবধারিত। ছবির 'রাশ' দেখতে গিয়ে অনেক সময়ই দেখা যেত অনেক অভিনেতাই ঠিক প্রত্যাশা অনুযায়ী করেননি। তাঁদের এই খামতি বা বাড়তি (অতি নাটকীয়তা, ন্যাকামি, 'অভিনয় অভিনয়' অভিনয়) কীভাবে সামলানো যায় তা নিয়ে হত ভাবনা চিন্তা আলোচনা। সন্দীপ রায়, পুনু সেনদের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল কীভাবে ভাবনা চিন্তা আলোচনার পর কেমন ভাবে কেটে ছেঁটে, সংলাপ ওভারল্যাপ করিয়ে 'ম্যানেজ' করা হত। অনেক নামী অভিনেতাও এমনি ভাবে 'ম্যানেজ্ড' হয়েছেন। আবার অনেক সময় এভাবে 'ম্যানেজ' করতে গিয়ে সে দৃশ্যটি এমন উৎকর্ষতায় পৌঁছেছে যে তা দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। তবে শুধু এটা নয়, দৃশ্য দেখতে দেখতে সত্যজিৎ রায়ের মাথায় খেলতে আরম্ভ করত রাগরাগিণীব আবহ। কাগজ কলম হাতে লিখে ফেলতেন সেই সব সুর বা সঙ্গীতের স্বরলিপি। একটা ছবি শুটিং তো শেষ, তো পরবর্তী ছবি কী হবে এ নিয়েও থাকত জল্পনা-কল্পনা। কখনও সত্যজিৎ রায় বলতেন কোনও বিশেষ গল্প বা ভাবনার কথা, কখনও জানতে চাইতেন কেউ কোনও সে রকম কিছু পড়েছেন কি না। এ রকম পাঁচমিশেলি আড্ডা জমত সম্পাদনার সময়। ছবি সংক্রান্ত নানান কারিগরি দিক, তার অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হত।

আর তাঁর একান্ত পারিবারিক আড্ডা ছিল নৈশভোজের সময় খাওয়ার টেবিলে। এটি প্রাত্যহিক ব্যাপার। তবে সত্যজিৎ নিজে যেহেতু খুব দ্রুত খেতেন এবং পরিমিত আহার করতেন তাই এ আড্ডার স্থায়িত্ব হত কম, যদি না এমন কিছু প্রসঙ্গ উঠত যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বা জরুরি। সে ক্ষেত্রে আড্ডা স্থানান্তরিত হত আবার তাঁর নিজের স্টাডি বা শোওয়ার ঘরে। এখানেও শুধু কাজের কথা নয়, তাঁদের সদ্য দেখা কোনও ছবি, তাঁর বা বিজয়া রায়ের পড়া সদ্যসমাপ্ত কোনও গল্প নিয়েও হত আলোচনা আবার আত্মীয়স্বজন পারিবারিক প্রসঙ্গও আসত।

এ পর্যন্ত পড়ে অনেকেই ভাবতে পারেন কেন উল্লেখ হয়নি নির্মাল্য আচার্যর নাম! নির্মাল্য আচার্য মূলত আসতেন সন্ধেবেলা এবং সেখানে অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন ওঁরা দুজনে। সেখানে অন্য কেউ তেমন থাকতেন না।

বিজ্ঞাপন জগতের প্রবাদপুরুষ শ্রীসুভাষ ঘোষাল যিনি সম্পর্কে তাঁর আত্মীয়, তিনি বোম্বে থেকে এলে রাতের দিকে পারিবারিক আড্ডায় মশগুল হয়ে পড়তেন।

সত্যজিৎ রায়-এর এই গুণগুলির উত্তরাধিকারী তো সন্দীপ রায় বটেই, তাঁর স্ত্রী ললিতা রায়ের উদ্যোগে রায়বাড়ির এই ধারা আজও বজায় আছে।

সন্দীপ রায়ের বৈঠকখানায় দুপুর বা সন্ধেয় পুনু সেন, স্থিরচিত্রগ্রাহক হীরক সেন, হিসাবরক্ষক কালী সেনগুপ্ত, চিত্রগ্রাহক বরুণ রাহা এবং শব্দযন্ত্রী সুজিত সরকারও তাঁদের জীবদ্দশায় নিয়মিত হাজির থাকতেন। এখনও আসেন অমল ঘোষ, রমেন চট্টোপাধ্যায়, চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ার আগে কামু মুখোপাধ্যায় এবং আকস্মিক প্রয়াণের আগে অবধি রবি ঘোষ মাসে দু-তিনবার হাজির হতেন, জমিয়ে আড্ডা দিতেন। বর্তমান অভিনেতাদের মধ্যে সব্যসাচী চক্রবর্তী, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়রা মাঝে মধ্যেই চলে আসেন। এছাড়াও কিছু সাংবাদিক, ডাক্তার এবং একেবারে ভিন্ন পেশার কিছু মানুষও আসেন নিছকই আড্ডা দিতে। এঁদের মধ্যে অনেকেই সস্ত্রীকও আসেন। স্বভাবগুণে ললিতা রায় বয়স ও অন্যান্য বিষয় নির্বিশেষে এঁদের আপন করে নিয়েছেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে সন্দীপ রায়ের হলিউডি ছবির ওপর জ্ঞান অপরিসীম, তবে শুধু হলিউডের ছবি নয়, সত্যজিৎ রায় ও সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন ছবির শুটিং-এর নানান জমাটি মজাদার ঘটনা দারুণ লাগে শুনতে সন্দীপ রায়ের মুখে, এছাড়াও নানান বিষয়ে জমে আড্ডা। বুদ্ধিদীপ্ত মজা সন্দীপেরও খুব পছন্দের। একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কেউ যদি বিমর্ষ হয়ে বা দুশ্চিন্তা নিয়ে এ বাড়িতে আসেন এবং ঘণ্টাখানেক সময় কাটান সন্দীপ রায়, ললিতা রায়ের সঙ্গে তাহলে তিনি বেরোনোর সময় একটা ফুরফুরে সতেজ ভাল লাগার আবেশ নিয়ে যাবেন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'রিফ্রেজিং'।

পরিশেষে একটা কথা বলি, আজকাল উষ্ণ পানীয়র 'উল্লাস' ছাড়া যখন কোনও আড্ডা ঠিক জমে না বলে বিবেচিত, রায়বাড়িতে গত অর্ধ শতাব্দীর এই আড্ডাতে পানীয় বলতে সুরভিত চা বা কড়া কফি নয়তো কোকাকোলা ছাড়া কখনও কিছু পরিবেশিত হয়নি।

নির্দেশিকা